কলকাতা রাজভবনের অন্দর মহল

অমিয় রায়

STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
47363

টিচার্স কনসার্ন

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

KOLKATAR RAJBHAVANER ANDERMAHAL

BY—AMIYA ROY

PRICE, Rs. 35 /-

প্রথম প্রকাশ—১৪ই এপ্রিল ১৯৫৫

দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ—শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পূজা (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮)

গ্রন্থসত্ব—গ্রন্থকার

প্রকাশক—স্বপনকুমার ভট্টাচার্য ও শম্ভু রায় ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—বঙ্কিম মজুমদার, বি. কে. প্রিন্টার্স, ৬০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ—অমিয় ভট্টাচার্য

মূল্য—পঁয়ত্রিশ টাকা

ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রকাশকদ্বয়ের বিনা অনুমতিতে এই গ্রন্থের কোন অংশের ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয়।

অবিস্মরণীয়া ইন্দিরা গান্ধী—

রাজভবনের তোরণে উনিশ শ' তিরাশি সালের এক শীতের রাত্রে যে দীপশিখাকে শেষবারের মত দেখেছিলাম, তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে :—

—লেখক—

"হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ী আমাকে খাত—মামা, ঐ দেখ, লাট সাহেবের বাড়ী, বড় বড় থাম। মা দেখিয়ে লেন, কতকগুলি মাটির ইঁট উঁচু করে সাজান।"

—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

We should be ashamed of resting, or having a square meal, so ng as there is one able bodied man or woman without wo k or food.

—Gandhiji

প্রস্তাবনা

আমার কলকাতার রাজভবনে নানা কাজে দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তার প্রতিটি পথ, প্রতিটি গৃহ, প্রতিটি পাথরের সঙ্গে পদে পদে মুখোমুখী হতে হত।

এর মধ্যে অনেক প্রিয় রাজ্যপালের আমি খুব কাছের লোক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই রাজ্যপাল ও তাঁর পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজভবনের রাজ্যপালের খাস কামরায় নানা রকম আলাপ আলোচনায়, গল্প-গুজবে, গানে কবিতায় কেটেছে। তখন তাঁর সঙ্গে এই রাজভবন নিয়েও অনেক কথা উঠেছে।

এ ছাড়া এই রাজভবনে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এক সময় মিঃ পি. ডি, ইভোরান ছিলেন কলকাতা রাজভবনের অন্যতম পুলিস ইনস্‌পেকটার-ইন-চার্জ।

সজ্জন ও ভদ্র এই ইংরেজ প্রতিবেশীর বড় মেয়ে মিস্‌ট রোজ মেরীর সঙ্গে আমার তখন অনেক গল্প হতো এই রাজভবন নিয়ে।—সে হঠাৎ একদিন আমাকে অনুরোধ করল কলকাতা রাজভবনের এই সব চিত্র বিচিত্র কাহিনী লিখতে—যা এখানকার লোক ভিন্ন অপর কারও পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। তারই সেদিনকার পীড়াপীড়িতে এই রচনার সূত্রপাত।

জানি না রোজ মেরী এখন সুদূরে লণ্ডনের কোথায় আছে। চিঠিপত্রের সম্পর্ক বহুদিনই শেষ হয়ে গেছে তার সঙ্গে।

রাজভবনের কাহিনী শেষ করার সময়ে বার বার তারই কথা মনে পড়ল।

এই কাহিনী রচনার ব্যাপারে যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন ঃ বৌ-রানী (রাজভবন)। হেড কুক শ্রীহিমাংশু বরুয়া, টিচার্স কনসার্নের স্বপন ভট্টাচার্য, ও পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য সাহিত্যিক বন্ধু দেব-সেনাপতি, আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা।

সূচী

কিছু মতামত

আনন্দবাজার পত্রিকা—অমিয় রায়ের বইখানাকে কলকাতা রাজভবনের 'চিচিং ফাঁক'ও বলা যেতে পারে। রাজভবন সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত পূর্ব তথ্যের সমাবেশ করেছেন তিনি এই বইখানিতে। রাজভবনের বহুদিনের কর্মী হিসাবে এখানে তিনি ঘটতে দেখেছেন বহু বিচিত্র ঘটনা। কর্মসূত্রে এখানে তিনি আসতে দেখেছেন বহু বিশিষ্ট অতিথিকে, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের, সাংবাদিকদের ও বাস করতে দেখেছেন রাজভবনের অধিপতি বহু সপত্নীক, বিপত্নীক ও অবিবাহিত রাজ্যপালদের ও তাঁদের মালি, আর্দালি, খানসামা, মজদুর, সচিব ও এ-ডি-সি-দের। সকলেরই সজীব চিত্র তিনি এঁকেছেন বইখানিতে। তাঁর লেখার ভঙ্গি সরল, স্বচ্ছ ও সাবলীল।

অমিয় রায় পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর অতি নিকট সংস্পর্শে এসেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—(কলকাতার কড়চা)—এই শহরের পশ্চিমে একশো বিঘে জমির উপর উননব্বইটি ঘর নিয়ে দেড়শো বছর ধরে যে প্রাসাদ পথচারীর কৌতূহল আর বিস্ময় সংগ্রহ করেছে, একদা সেই রাজভবনে নেমে এল বিষাদের ছায়া···চতুর্দোলায় চড়িয়ে, মার্কো পোলোকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছায়াছন্ন দীঘির ধারে সমাধিস্থ করা হল। মার্কো পোলো কোনো ভ্রমণবীর নন, একটি অ্যাল-সেশিয়ান কুকুরের নাম, তার মালিকান ছিলেন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। মারকোর তিরোধানে সেদিন, ৪ ডিসেম্বর ১৯৬২, রাজভবনে হাফ-হলিডে হল। ···ইত্যাদিকার বহু বিচিত্র ঘটনা নিয়ে সদ্য বেরিয়েছে, কলকাতা রাজভবনের অন্দর মহল···সেই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু উপাদেয়, মজাদার সংবাদ।

আনন্দবাজার পত্রিকা—(টুকরো খবর)—'কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল' নিয়ে একটি কৌতূহলপ্রদ গ্রন্থ লিখেছেন অমিয় রায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্ম-জীবনের মজাদার কিছু ঘটনার সঙ্গে লেখক যোগ করেছেন দুর্লভ সব তথ্য।

যুগান্তর—কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল—এই নামে একটা আকর্ষণীয় বই লিখেছেন অমিয় রায়। যেন পুরনো ছবির অ্যালবাম খুলে দেখা। বহু ঘটনার শব্দ চিত্র সাজানো এই বইতে।

দৈনিক বসুমতী—আমরা জানতে পারি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সারমেয় প্রীতির কথা, জানতে পারি পণ্ডিত নেহেরুকে খুশী করতে রাজভবনের সংলগ্ন জলাশয়ে বোটের ব্যবস্থা করার কথা, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরল কর্তব্যবোধের কথা, কিংবা রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরল মানুষ প্রীতি এবং সেই সঙ্গে অনাড়ম্বর জীবন

যাত্রার কথা। লেখক বেশ রমণীয় ভঙ্গিতে তাঁর মন্তব্য পেশ করায় পাঠক একটানা বইটি পড়ে ফেলতে পারবেন। আর সেই সঙ্গে রাজভবন সম্পর্কে কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করার সুযোগ পাবেন।

সত্যযুগ—লেখক অমিয় রায়কে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর বইয়ের মধ্য দিয়ে কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহলের বিবরণ দিতে গিয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রও তুলেছেন—যা ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজে লাগতে পারে।

ভারতকথা পত্রিকা—রোজদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে না রাখলে এসব তথ্য বাইরের মানুষজন কোনদিনও জানতে পারবে না। আর এসব তথ্য একমাত্র এর সঙ্গে যে জড়িত সেই পারবে জানাতে। অমিয়বাবু সেই কাজটি অতি সুনিপুন ভাবে করেছেন।

অজস্র পাঠক পাঠিকার চিঠির কয়েকটি—

(১) —"কোনোদিন রাজভবনের অন্দরমহলে যাবার সুযোগ হয় নি। হয়ত কোনোদিন হবেও না। কিন্তু এ সুযোগ না পেলেও আর দুঃখ নেই। আপনার লেখা 'কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল' বার বার পড়েছি। খুবই মুগ্ধ হয়েছি…

(২) 'I have just had a first reading of your book কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল। The book is informative, interesting and illuminating. The book may be classed as on· of the finest writing in Bengali literature.

(৩) আপনাকে প্রণাম জানাই সামান্য পাঠিকা হিসেবে। শংকর-এর 'কতো অজানারে' বা 'চৌরঙ্গীর' পর এমন আকর্ষণীয় মন কেড়ে নেওয়া বই আমার চোখে পড়েনি।

লেখকের অন্যান্য বই

ঠুমরী কী বন্দিশ

ঘরওয়ানা কী ঠুমরী

রাজভবনের মন্ত্রীনিবাস (যন্ত্রস্থ)

এক পাতার গল্প

ট্যাগ অফ্ ওয়ার (নাটক)

ইন্দিরা গান্ধী ও কলকাতার রাজভবন

আমার কলকাতার রাজভবনে দীর্ঘ তিরিশ বছর বিজড়িত জীবনে অন্তত পক্ষে ষাট-সত্তর বার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই সেদিনও ২৭শে ডিসেম্বর উনিশশো তিরাশি বেলা দুটোয় ইন্দিরা গান্ধী এলেন কলকাতা রাজভবনে। থাকলেন তিনদিন—কংগ্রেস আই-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে।

ইন্দিরা কখনও এসেছেন রাজভবনে তাঁর পিতা প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে দুই ছোট্ট শিশু পুত্রদের নিয়ে আবার কখনও নিজে প্রধানমন্ত্রী হবার পর সেক্রেটারি, ডাক্তার ও সিকিউরিটি স্টাফদের সঙ্গে।

কিন্তু যতবারই কবিগুরুর এই প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখেছি, ততবারই লক্ষ্য করেছি তিনি চলাফেরায়, কথাবার্তায়, চালচলনে খাঁটি ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি।

শ্রীমতী গান্ধীকে কখনও দেখিনি রাজভবনে কোন চাকর-বাকর, খানসামা, অফদার, বাবুর্চি, খিদমদ্‌গার ইত্যাদির সঙ্গে জোরে কথা বলতে বা কোনো রূক্ষ আচরণ করতে। সব সময় দেখেছি ইন্দিরার মাথায় হিন্দু বিবাহিতা নারীর অঙ্গসৌষ্ঠব ঘোমটা পরা অবস্থায়। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কখনও দেখিনি পাশ্চাত্য দেশীয় কায়দায় স্লীভলেস অঙ্গসৌষ্ঠব-এর চেষ্টা করতে। যা তাঁর নিজের অতি ঘনিষ্ঠ জনৈকা পরমা আত্মীয়াকে দেখেছি মস্কোয় স্বল্পকালীন এ্যামবাসাডার হিসেবে—যদিও সংবাদপত্রের মারফতে।

হাতের কনুই পর্যন্ত হাত ঢাকা ব্লাউজ সব সময় তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব করতো। কলকাতা রাজভবনে তিনি এলে সমস্ত রাজভবনে যেন একটা আনন্দের উচ্ছলতা বয়ে যেতো।

মুখে সদা স্মিতহাসি নিয়ে জওহরলালের পাশে পাশে দুই শিশু পুত্র সঞ্জয় ও রাজীবকে নিয়ে তিনি কলকাতার রাজভবনের বাগানে, রাজভবনের পুষ্করিণীতে ছোট্ট বোটে-চড়া অবস্থায়, খানা টেবিলে, শোবার ঘর, প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ স্যুইটে এই ইন্দিরা ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছেন। আর্দালি পিওন, খানসামা, মজদুর, সেক্রেটারি সকলের সঙ্গে তিনি স্মিতহাস্যে তাদের খবরাখবর নিয়েছেন সতত।

এও দেখেছি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে, তখন ইন্দিরা এসেছেন রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেই জীপ চালিয়ে নিয়ে এসেছেন বিমানবন্দর থেকে রাজভবন পর্যন্ত নিজেই সিদ্ধার্থশঙ্কর। জীপে হাত জোড় করে, দাঁড়িয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। মুখে তাঁর কোমলতার পরিবর্তে

কখনও দাম্ভিকতার প্রকাশ পায়নি। যেন তিনি জনগণের একজন হয়েই এখানে এসেছেন—সদা হাস্যময়। দেশের নির্ভীক নারী কর্মী।

এখন কলকাতার রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধী অবস্থান করবার সময় কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক মজার ঘটনার বর্ণনা করছি।

জওহরলাল যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি যেখানেই চলাফেরা করতেন তখন তাঁর সঙ্গে দু'জন লোককে সদা সর্বদা দেখা যেতো। একজন জওহরলালের পিতার আমলের অর্থাৎ মতিলাল নেহেরুর আমলের পরিচারক বৃদ্ধ হরিকে এবং অন্যজন জওহরলালের কন্যা প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী ইন্দিরাকে।

হরি জওহরলালের ব্যক্তিগত ফাইফরমাস যথা সকালে জওহরলাল কবে কি খাবেন, ব্রেকফাস্টই বা কী দিতে হবে, ডিনারেই বা তাঁর খাবার কী কী হবে, কোন কুর্তা শেরওয়ানী লংকোট বা জহর কোট ইত্যাদি পরবেন তার তদারক করতেন।

আর ইন্দিরা গান্ধী বাবাকে সাহায্য করতেন কোন কোন লোক আজ তাঁর সঙ্গে দর্শনপ্রার্থী, আজকের এনগেজমেন্ট লিস্টে কাকে কী কী সময় দেওয়া আছে, শরীর কেমন আছে তাঁর বাবার, কী কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে ভাবছেন ইত্যাদির সঠিক খবরাখবর রাখা নিয়ে।

এমনও দেখা গেছে পুত্রী ইন্দিরার কাছে পিতা জওহরলাল তাঁর বৈদেশিক চিন্তা ভাবনার অনেক কিছু সঠিক মতামত-এর মূল্যায়ন করেছেন নিভৃতে প্রিন্স অব ওয়েলস সুইটে বসে আধশোয়া অবস্থায়।

একবার দেখা গেল জওহরলাল কলকাতার রাজভবনে এসেছেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর জন্য। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। পরের দিন সকালেই দিল্লী রওনা হয়ে যাবেন দমদমের সকালের ফ্লাইটে। হঠাৎ ইন্দিরা রাজভবনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

শ্রীমতী পদ্মজা তখন বাংলার রাজ্যপাল। তিনি চান, জওহরলাল নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সকালের ফ্লাইটে দিল্লী চলে যান, আর স্নেহের কন্যাসমা ইন্দিরা শ্রীমতী পদ্মজার কাছে দিন কয়েক থেকে সুস্থ হয়ে দিল্লী চলে যাক্।

কথাটা ইন্দিরার কাছে পাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা বেঁকে বসলো—বাবাকে কারও হাতে একা ছাড়তে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। পরে বিকেলের দিকে ইন্দিরা কিছুটা সুস্থ বোধ করলে জওহরলাল কন্যাকে নিয়ে দিল্লী রওনা হলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা এই রকমই জেদী সেই ছোটবেলা থেকে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে একবার কোনো এক বিদেশী চতুর সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি যেটাতে একবার মনঃস্থির করেন সেটা না করে ছাড়েন না। এই রকম জেদ আপনি কেমন করে 'এ্যাকোয়ার' করলেন।

ইন্দিরা হেসে তার উত্তর দিয়েছিলেন—সেই ছোটবেলা থেকে যখন আমি মা বাবার সঙ্গে হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন আমার কাজ ছিল পাহাড়ের যে খাড়াই রাস্তা ধরে কেউ ওপরে ওঠে না আমি সেই রাস্তা ধরেই পাহাড়ের

ওপরে ওঠবার অভ্যাস করতাম। জানিনা হয়তো বা আমার চরিত্রে এ জন্যই একটা অনমনীয় ভাব গড়ে উঠেছে। তবে এটাকে আপনি আমার জেদ বললে দুঃখিত হবো। বিদেশী সাংবাদিকটি ইন্দিরার এ কথা শুনে মাথার হ্যাট খুলে তাঁকে সম্মান জানালেন —হ্যাটস অফ মিসেস গান্ধী!

সেবার সদ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ১৯৭২ সাল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিবর রহমান সদলবলে কলকাতার রাজভবনে উঠেছেন। এখানে বিরাট মিটিং হবে। সেখানে মুজিবর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুগ্মভাবে বক্তৃতা দেবেন।

কলকাতার রাজভবন গম গম করছে। মুজিবরের পার্টিতে অন্ততঃ পক্ষে জনা পঞ্চাশেক অতিথি এসেছেন। রাজভবনের ... স্ত স্যুইট প্যাকড আপ।

রাজভবনে দেশী বাংলা ভাষার হুল্লোড় চলেছে। মুজিব পার্টির কাউকে ইংরাজিতে বা হিন্দিতে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে খাঁটি বাংলা ভাষায়। তার মধ্যে মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গীয় টানও ধরা পড়ে। তাঁরা চলতে বলতে জানাতে ব্যস্ত যে আমরা বাংলাদেশের মানুষ। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা খাঁটি বাঙালী। মাতৃভাষার জন্য জান কবুল করেছি। প্রাণ বলি দিয়েছি। স্বাধীন হয়েছে সুতরাং বাংলা ভাষায় কথা বলুন ইত্যাদি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাও সদলবলে রাজভবনে এসেছেন দিল্লী থেকে। মুজিবের সম্মানে যে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঐতিহাসিক মিটিং-এর জমায়েত হবে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিবরের সম্মানে কিছু বক্তব্য রাখতে!

হঠাৎ ইন্দিরার ইচ্ছা হল এই বিশাল জমায়েতে, যা নাকি কলকাতার ইতিহাসে কখনও হয়নি এমন কি প্রথমবার আগত পঞ্চাশের দশকে রাশিয়ার ক্রুশ্চেফ, বুলগানিন আমলেও না, তাতে পশ্চিমবঙ্গীয় কুলবধূর ন্যায় শাড়ি পরার স্টাইলে নিজেকে উপস্থাপিত করা।

সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনের জনৈক বাঙালী অফিসারের বউ মিসেস বসুকে ডেকে আনানো হলো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে বাঙালীর কুলবধূর প্যাটার্নে শাড়ী পরানোর জন্য। ইন্দিরাকে সে রকম ভাবে শাড়ী পরানো হ'ল। ইন্দিরা যখন বিশাল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ভাষণ দিলেন প্রথমে কিছুটা বাংলাতে এবং পরে ঈষৎ হেসে হিন্দিতে, তখন সমস্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ধ্বনিত হচ্ছে বন্দেমাতরম, ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও, বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ, সোনার বাংলা জিন্দাবাদ।

আর এক বারের ঘটনা। ইন্দিরা এসেছেন রাজভবনে, সঙ্গে আছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় ও অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জনা কতক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সকলে মিলে রাজভবনে ভি-আই-পি লিফটে ঠাসাঠাসি করে ওপরে উঠেছেন।

হঠাৎ লিফ্‌টা ভারসাম্য না রাখতে পেরে কিছুটা উঠে আবার নিচে নেমে এলো। সিদ্ধার্থ রায় তো লিফটম্যানকে এই মারেন তো সেই মারেন। সঙ্গে সঙ্গে

শ্রীমতী ইন্দিরা হেসে বললেন, ওর তো কোনো দোষ নেই। লিফট ভার্ম হলে
গেছে আমাদেরই দোষে। চলুন সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই।

প্রায় দ্রুত পায়ে দৌড়তে দৌড়তে দোতলার প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে কার্পেট মোড়া সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন। তখন প্রায় বৃদ্ধ শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং প্রৌঢ় সিদ্ধার্থ রায় ইন্দিরার চলার তালে তালে পা ফেলতে প্রায় হাঁপাচ্ছেন।

বলতে লজ্জা হয় এবং নিজেকেও অপরাধী মনে করি আমরা ভারতবাসী স্বভাবতই অপরের নিন্দা কুৎসা রটনা করতে পৃথিবীর এক নম্বরের সেরা জাত। নিজের শত দোষ থাক, নিজের পুত্র কন্যার হাজার রকম অশালীন বায়নাক্কা থাক, তাতে আমরা বেশী দোষ দিই না, দোষ বলে মনেও করি না, কিন্তু যখনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা কিছু একটা অপ্রচলিত বা বিধিবহির্ভূত কাজ করেন তখনি আমরা শতমুখে সেগুলির নিন্দা করে নিজেরা কিছুটা আত্মসুখ অনুভব করি বা যে সব শ্রোতাকে আমরা তা শুনাই তারাও বেশ কিছুটা রসোপলব্ধি করেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁর পিতা বিপত্নীক জওহরলালজীকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতেন না বলে এই দেশেও কতো লোক কতো না মন্দ কুৎসা করতো, কিন্তু তাঁরা তো একবারও মুখে আনেনি যে বৃদ্ধ পিতা জওহরলালের প্রতি স্নেহশীলা কন্যা ইন্দিরার সেবার এ নিদর্শন পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় নি। এক দেখা গেছে এই ভারতবর্ষেরই চির অবিবাহিত কন্যা জাহানারার নিঃস্বার্থ সেবা তাঁর বৃদ্ধ পিতা বাদশা শাজাহানের প্রতি।

ফিরোজ গান্ধী জওহরলালের কাছে এসেছেন, থেকেছেন, ছেলে বউকে নিয়ে আনন্দ করেছেন, কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী বাবাকে একা কখনও লোকের হাতে সঁপে দিয়ে নিজের শ্বশুর ঘর করতে ছুটে যান নি. তাতেই অনাত্মীয় আমাদের তাঁর প্রতি কতো রাগ, কতো অনাদর, কতো ঘৃণা কতো নিন্দাচার;

কিন্তু কেউ কী খবর রেখেছেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা বার বার স্বামী ফিরোজ গান্ধীর কাছে লক্ষ্ণৌ-এ দিনের পর দিন ছোট্ট পুত্রদের নিয়ে একান্ত মনে শ্বশুর ঘর করেছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতা জওহরলালের জরুরী তার পেলেই ছুটে গেছেন দিল্লীতে—Guests are coming. Come immediately. বৃদ্ধ পিতা জওহরলালের এ রকম টেলিগ্রাম প্রায়ই কন্যা ইন্দিরাকে শশব্যস্ত করে রেখেছিল।

এমনও হয়েছে ইন্দিরা সকালের ফ্লাইটে লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী পৌঁছে অতিথিদের দেখাশোনা করে আবার রাত্রে স্বামী ফিরোজের কাছে লক্ষ্ণৌ ফিরে এসেছেন। তবু আমরা নিন্দুক। তবু আমাদের অহেতুক ভর্ৎসনা তাঁর প্রতি।

কিন্তু কেউ কী একবারও ভেবেছেন যে যেদিন জওহরলাল ২৭শে মে উনিশশো চৌষট্টি বেলা দেড়টায় চিরনিদ্রায় চোখ বুজলেন সেদিন ইন্দিরা বাবার শয্যাপার্শ্বে থেকে মৃতের সৎকার পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও একবারও ওঠেননি।

আত্মীয়-স্বজনের শত অনুরোধেও মুখে করে একটা খাদ্যদানাও দাঁতে কাটেন

নি। কিন্তু নিজের শোকার্ত পরিজনবর্গ যাতে পিতার অন্তিম দেহ সংকারের পূর্বে কিছু খেয়ে নেন তার জন্য বার বার তাদের অনুরোধ উপরোধ জানিয়েছেন। এই আমাদের ইন্দিরা। এই আমাদের প্রধানমন্ত্রী। এই হলেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রিয়দর্শিনী।

কেন জানি না আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, কবিগুরুর জীবনাদর্শের সঙ্গে, তাঁর সার্থক শিক্ষার সঙ্গে তাঁর আত্মস্থ দীক্ষার সঙ্গে যদি তাঁর কোনো শিষ্য বা শিষ্যার কোনো রকম জীবনের অভিব্যক্তি সার্থক হয়ে থাকে তবে এই সেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা। যিনি কবিগুরুর মতো আনন্দে অচঞ্চল, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন এবং কষ্টে অবিচল।

ইন্দিরার শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত ঝড়, কত আলোড়ন, কত নিন্দা, কত কুৎসা বহে গেছে কিন্তু কবির কখনও মুহূর্তের মধ্যেও নিজের হৃদয়ের প্রশান্তি, স্থিতাবস্থা হারান নি। বিবাহিতা সোমত্ত মেয়ে, ছোট আদরের কোলের পুত্র, আত্মীয় পরিজন কবিগুরুর চোখের সামনে নিত্য নিত্য মারা গেছে; কিন্তু একদিনের জন্যও কবিগুরু কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ-প্রার্থীর সামনে ঠিক ঠিক সময়ে দেখা দিতে সংকোচ বোধ করেন নি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জীবনও তাঁর শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অবিচল ভাবে অনুসরণ করে চলেছিল।

তাঁর ছোটবেলায় মা কমলা নেহেরু মারা গেছেন, পিতা জওহরলাল নিরন্তর জেলে জেলে বন্দী থেকেছেন, পিসীরা তাঁর সঙ্গে নিরন্তর খারাপ ব্যবহার করেছেন, এবং সব শেষে অপরিণত বয়সে কনিষ্ঠ সন্তান সঞ্জয়ও হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তবু ইন্দিরা ক্ষণিকের জন্য ভেঙে পড়েন নি। চোখে কালো চশমার অন্তরালে নিজের উদ্বেল হৃদয়ের অশ্রু চাপা দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব হাসিমুখে সমাধান করে চলছেন।

সত্যি কবিগুরুর জীবনাদর্শ যদি তার কারও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সম্পূর্ণ মূর্ত হয়ে থাকে তবে এই সেই আমাদের প্রণম্যা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

এখন দেখা যাক, শ্রীমতী ইন্দিরা কলকাতার রাজভবনে এলে কী কী সাধারণতঃ খাওয়া-দাওয়া করতেন।

অনেকের হয়তো জানা নেই যে ইন্দিরা যখনই একা চলাফেরা করেন তখনই তাঁর পার্টিতে একজন মহিলা সদস্য থাকবেনই যিনি প্রধানমন্ত্রীর সহচরী বা সব কার্যের সহযাত্রিণী।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কলকাতার রাজভবনে শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী, পূরবী মুখোপাধ্যায়, রামদুলারী সিনহা, শ্রীমতী রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী প্রমুখের পদার্পণের কথা, এখানেও সেই সনাতন ভারতবর্ষীয় ধ্যান-ধারণার কথা। শালীনতার সূক্ষ্মতম অপব্যবহার যেন ইন্দিরার চরিত্রের একান্ত পরিপন্থী।

কলকাতার বিশাল ঐতিহাসিক রাজভবনের প্যান্ট্রিতে কতো রকমেরই না

খানাদানা তৈরী—কতো রকমের কেক, প্যাসট্রি, কতো রকমের মাংসের প্রিপারেশন, কতো রকমের মাছের পোলাও-এর ভ্যারাইটি।

আগেই বলেছি এখনও বলছি যে সেই বৃটিশ আমল থেকে এখনও তাদের বংশ পারম্পরায় এই রাজভবনে কতো জাতের যে রাঁধুনী ঠাকুর আছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। 'কেউ গোয়ানীজ, কেউ চাটগাঁয়ের বড়ুয়া, কেউ বাঙালী ব্রাহ্মণ, কেউ মুসলমান বাবুর্চি, কেউ বা খাস ইংরেজী বুলির এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তবে স্বাধীন ভারতে এখন অনেক সেই সব বাটলার, বাবুর্চি, খিদমদগার, প্যানট্রিম্যান, হেড কুকের দল বেশ লোপ পেয়েছে।

সত্যি অবাক লাগে যখন দেখি রাজভবনে এত অপ্রতুল খাদ্যভাণ্ডারের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা যেন নিজে পাখীর আহার করেন। এটা কী সত্যিই তাঁর শক্তি দিগুয়ের উৎস, না কোন অলিখিত গুরুর দীক্ষার অঙ্গ তা আজও বুঝতে পারিনি।

পিতা জওহরলাল যেখানে তাঁর খাবার টেবিলে মহামূল্যবান 'চিকেন রয়েল' না হলে নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যেত সেখানে ইন্দিরা খান অনসূাপ বলে মাছ মাংস বিভিন্ন ভেজিটেবল দেওয়া এক বাটি সূপ বা ঝোল, দু' একটা কিছু ভাজাভুজি, আর ডাল তরকারি সব শুদ্ধ একসঙ্গে মেখে একদলা সামান্য আহার। ব্যস, এতেই তাঁর সারাদিন চলে যায়। আর খুব পছন্দ করেন তিনি বাবার মতো হট্ কফি, লেবুর সরবৎ বা সর্বাপেক্ষা চিকেন-সূপ। দু' একটা ফুলকো লুচি বা ঘিয়ে ভাজা দু, একটা নিমকী। ব্যস। ইন্দিরা শুধু মাত্র চল খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে উনিশশো উনআশি সালের শ্রীমতী ইন্দিরার দাক্ষিণাত্যের ইলেকশন অভিযানের কথা।

কোনো এক সংবাদ সাময়িকীতে পড়েছিলাম যে একজন কাগজের রিপোর্টার ইন্দিরার সঙ্গে একই জীপে সেই ইলেকশন অভিযানের কভারেজ করছিলেন। তিনি লিখেছেন মাদ্রাজের গ্রামে-গঞ্জে ছোট্ট শহরে ঝটিকা বাহিনীর মতো বৃষ্টির মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা থেমে থেমে দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষমান জনতার সামনে বক্তৃতা করে উঠেই রাস্তায় ফ্লাস্ক থেকে নিজে ঢেলে একটু গরম কফি বা দু' একটা ইডলী খাচ্ছেন, আবার পূর্ণ তেজে ছুটে চলেছেন অন্য এক গঞ্জে ইলেকশন ক্যামপেনের জন্য।

এও দেখেছি রাজভবনে সেদিন ২৭শে ডিসেম্বর উনিশশো তিরাশি বেলা একটার সময় নেতাজী স্টেডিয়ামে রাজভবন থেকে ইন্দিরার জন্য দুপুরের লাঞ্চ গেলো দুটো স্যাণ্ডউইচ, একটা কাটলেট এবং এক ফ্লাস্ক কফি। ব্যস।

এখন শ্রীমতী গান্ধীর একটা কলকাতার কর্মসূচীর ও রাজভবনে অবস্থানের ইতিহাস বর্ণনা করছি।

আগেই বলেছি আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কলকাতার রাজভবনে যাট

সত্তর বার আসতে দেখেছি। রাজভবনের চাকরীর দৌলতে তাঁকে অতি কাছ থেকে দেখবার বার বার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁকে দেখে বার বারই আমার মনে হয়েছে Indian womanhood বলতে আমরা যে শালীনতার মাপকাঠি মনে মনে কল্পনা করি শ্রীমতী ইন্দিরা তারই সজীব অভিব্যক্তি।

জলন্ত সিগারেট মুখে যখন তাঁর অতি নিকট আত্মীয়া বিদেশে অ্যামব্যাসাডারী করছে তখন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা ভারতীয় ঘোমটা পরা শাশ্বত নারী। এই যা তফাৎ। এই যা অসামান্যা।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ৩রা জানুয়ারী উনিশশো একাশি সাল শনিবার কলকাতার রাজভবনে এলেন।

তার পূর্বে অপরাহ্ন বেলায় তিনি দমদম এরোড্রাম থেকে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে 'বিবেকানন্দ যুবনিধি সেমিনারে' উপস্থিত থেকে দেশের ভবিষ্যৎ ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁকে রবীন্দ্রসদনের ফটকে মাল্যভূষিত করেন এই সেমিনারের আহ্বায়ক স্বামী যুক্তানন্দ।

এর পর তিনি রবীন্দ্রসদন থেকে সোজা রাজভবনে এলেন। রাজভবনের ইয়েলো ড্রইং রুমে প্রেস কনফারেন্সের জন্য পঞ্চাশ ষাট জন সাংবাদিক বেশ ভব্য সভ্য হয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেছিলেন। তার মধ্যে আবার দেখা গেলো একজন মহিলা সাংবাদিক।

ইন্দিরা এসে নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে করজোড়ে বসলেন। পাশে বাংলার লাট ত্রিভুবন নারায়ণ সিং ও ডান পাশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণি খান চৌধুরী। ইন্দিরার পরনে শাদা বুটিদার শাড়ী, মাথায় ঘোমটা ও গায়ে শাল।

তিনি স্মিতহাস্যে প্রত্যেক সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

দেখলাম কতো কতো ঝানু সাংবাদিক কতো রকমের কঠিন এলোমেলো প্রশ্ন করছেন কিন্তু ইন্দিরা নির্ভয়ে সহাস্যে সব কিছুর উত্তর দিয়ে চলেছেন। একটুও ক্লান্তি বা রাগত ভাব নেই। কতো সাংবাদিক তো দেখলাম প্রশ্ন করার চেয়ে ইন্দিরার বিভিন্ন মুডের ছবি নেওয়ার জন্যই ব্যস্ত। কখন কী কাজে লেগে যায় এই সব বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি।

দেখলাম প্রখ্যাত এক সাংবাদিক কী যেন একটা প্রশ্ন করলেন ইন্দিরাকে। পর মুহূর্তেই তার সদুত্তর পেয়ে তিনি হাসি মুখে পর পর প্রায় আট দশটা ইন্দিরার ছবি তুলে নিলেন। জানি না মনে মনে সেই সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো বই লেখবার তাল কারছেন কিনা? কারণ এর আগে 'ইন্দিরা একাদশী', 'এ লাইফ ইন দি ডে অফ ইন্দিরা গান্ধী' প্রভৃতি বহু বই বাজারে বেরিয়েছে।

এরপর ইন্দিরা রাজভবনে অন্য একটি ঘরে ১৬ই অগস্ট উনিশশো আশি সালে ইডেনে মোহনবাগান-ইন্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলায় যে ষোল জন দর্শক প্রাণ হারিয়েছিলেন তাদের একজন মৃতের বিধবা পত্নীর হাতে তিন হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেন।

তখন দূরে থেকে দেখেছি সেই ক্রন্দনমানা বিধবা যুবতীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীরও চোখে জল চিক্ চিক্ করছে।

এই এক দিনকার ঠাস বুনানীর শত কাজের মধ্যে থেকেও শ্রীমতী ইন্দিরা খোঁজ নিয়েছেন প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়ের সাম্প্রতিক অসুস্থতা সম্বন্ধে এবং পরের দিনই তাঁর বাড়ীতে তাঁর সত্বর নিরাময় ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ফুলের স্তবক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এর পরের দিন হল রবিবার ৪ঠা জানুয়ারী উনিশশো একাশি। এদিন সকাল থেকে ইন্দিরার ব্যস্ততার মধ্যে দিন সুরু হয়। সকাল সাতটা নাগাদ রেস কোর্সের হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টরে করে তিনি প্রথমে যান বেলুড় মঠে। সেখানে ৫০ মিনিট কাটিয়ে নিমপীঠে। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আদিবাসী হাই স্কুলের হোস্টেল বাড়ীর উদ্বোধন করেন সাড়ে আটটার সময়।

ওখান থেকে বেহালার ঠাকুরপুকুরে এলেন ক্যান্সার কেন্দ্রের উদ্বোধনে। এরপর বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রবীন্দ্রসদনে। সেখান থেকে ইডেনের খেলার আসরে। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে দমদম বিমান বন্দর। দিল্লী রওনা হয়ে গেলেন একটা নাগাদ।

এতো যে প্রধানমন্ত্রীর ঠাসা কর্মসূচী তাতে কেন জানি না ইন্দিরার মুখে একটুও ক্লান্তি বা কালিমার ছায়া দেখিনি।

এটা কী রাজধানী দিল্লীর বহুজন কথিত শ্রীমতী গান্ধীর অতি প্রত্যুষে নিরালায় যোগ অভ্যাসের কোনো অলৌকিক শক্তি বা তাঁর সুদৃঢ় মনের গঠনের কার্যকারিতা, আজও আমার জানা হয়ে ওঠে নি। দিল্লীর অনেক গণ্যমান্য অধিবাসীর কাছে শুনেছি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গভীর রাতে একাকী নির্জন বারান্দায় বসে কী যেন ভাবেন।

এবার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার এই সফরের 'রবিবার বেলুড় মঠে ৫০ মিনিট' এই প্রসঙ্গ দিয়ে আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করবো।

"রবিবার তাঁর দ্বিতীয় দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কাটান বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসীদের মাঝে।" গঙ্গাতীরে এই মঠে যখন ইন্দিরা পৌঁছলেন তখন বেলুড়ের আকাশ জুড়ে মিষ্টি রোদের ছড়াছড়ি। ঘড়িতে সকাল আটটা বেজে পাঁচ। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ।

হেলিকপ্টর থেকে নেমে গাড়ি করে উনি সোজা চলে গেলেন ঠাকুরের নাট মন্দিরের দিকে। আশ্রমের নীরবতার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হলেন সন্ন্যাসীদের মাঝে।

করজোড়ে তাঁদের জানালেন নমস্কার। পরনে সাদা কাপড়, গায়ে উলের চাদর। মন্দিরের সিঁড়ির শেষ ধাপে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন মঠের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন এ আই সি সির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী।

সিঁড়ির পাশে জুতো রেখে মোজা পায়ে সকলের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকলেন প্রধানমন্ত্রী। কমণ্ডলু থেকে জল নিলেন দু' হাতে। একজন সন্ন্যাসী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন সদ্য ফোটা গাঁদা ফুল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির সামনে বসলেন একটি আসনে। মুদিত আঁখি। হাত দুখানি রাখলেন কোলের ওপর।

দশ মিনিট পরে আসন ছেড়ে উঠলেন। করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে করলেন প্রণাম। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হেঁটে উঠলেন মিশন অফিসের দোতলায়।

সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং স্বামী হিরন্ময়ানন্দ। দোতলার একটা ঘরে সারলেন প্রাতঃরাশ—এক গ্লাস কমলা লেবুর রস, একখানি নির্মাক এবং পরে এক কাপ কফি। সহাস্যে সবাইকে বললেন, "ভরত মহারাজ ইজ অ্যাংকসাস্ টু ফিড্ মী।"

ওখান থেকে বেরিয়ে গেলেন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দের কাছে। কুশল বিনিময়ের পর শ্রীমতী গান্ধী প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নেন।

প্রেসিডেণ্ট মহারাজের কাছ থেকে শ্রীমতী গান্ধী ভরত মহারাজের আবাসে চলে আসেন। সেখানে সন্ন্যাসীরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। স্বামী আত্মস্থানন্দ একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বললেন, ইনি হলেন স্বামী অপূর্বানন্দ। আপনি যখন আপনার মা শ্রীমতী কমলা নেহেরুর সঙ্গে ফ্রক পরে আসতেন তখন থেকেই অপূর্বানন্দজী আপনাকে দেখেছেন। এখন কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে আছেন। আপনাকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছেন। শ্রীমতী গান্ধী করজোড়ে স্বামী অপূর্বানন্দজীকে নমস্কার জানালেন।

এবার বেলুড় মঠের সেই একতলার ঘর, যে ঘরে বসেন ভরত মহারাজ। আর এই ভবনের দোতলায় গঙ্গামুখী ঘরটিতে আজ থেকে ৭৮ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ রাখেন। শ্রীমতী গান্ধী ঘরে ঢোকার দু'তিন মিনিটের মধ্যে সকলে বেরিয়ে এলেন। এমন কি সন্ন্যাসীরাও। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিট থেকে আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত ভরত মহারাজের সঙ্গে একান্তে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। সে কথা কি নিয়ে বা তার গূঢ় রহস্যই বা কি তা বেলুড় মঠের কোনো সন্ন্যাসী বা ভ্রমণরত সাংবাদিকরা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলো না।

এরপর ঘরের দরজা আবার খুলে গেল।

ভরত মহারাজ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন সদ্য সমাপ্ত এ বছরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন মহাসম্মেলনের একখানি স্মারক পুস্তিকা। ঘরে ঢোকার আগে ইন্দিরা দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে একবার তাকিয়ে নেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে স্বামী শিবানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের ছবি টাঙানো।

স্বামী শিবানন্দের কাছেই কমলা নেহর‍ু দীক্ষা নেন।

ইন্দিরা একবার গঙ্গার ওপর বয়ে যাওয়া স্রোতের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন। তার কি তখন মাতৃহৃদয়ে সদ্য পত্রহারা সঞ্জয়ের কথা মনে পড়ছিল না দেশের কালো ভবিষ্যতের ছায়া গঙ্গার বক্ষে দেখছিলেন।

গঙ্গাবক্ষে সে সময় দ‍ু একখানি জেলে নৌকো, একখানি লঞ্চ ও স‍ুদ‍ূরে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দিরও তাঁর চোখে পড়ে থাকবে। আর চোখে পড়েছে বিরাট মণ্ডপ যেখানে কদিন আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন মহাসম্মেলন হয়ে গেল। সেই মণ্ডপের পাশ দিয়েই তিনি ভরত মহারাজের আবাসে গিয়েছিলেন। তারপর যে মোটরে চড়ে এসেছিলেন সেই মোটরে চড়েই হেলিপ্যাডের দিকে রওনা হলেন। গাড়িতে তাঁর বাঁ পাশে বসে ভরত মহারাজ।

ইন্দিরা করজোড়ে সন্ন্যাসীদের স্মিতহাস্যে নমস্কার জানালেন। সন্ন্যাসীরা সমবেত ভাবে হাত তুলে প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ জানালো···৮-৫৫ মিনিটে হেলিকপটর আকাশে উড়ল কলকাতার রাজভবনের অভিম‍ুখে।

বেল‍ুড় মঠের মন্দিরের চ‍ূড়ায় তখন রোদ ঝলমল করছে। আর অদ‍ূরে যেন ধ্ব‍নিত হচ্ছে—খণ্ডন ভব বন্ধন · বেল‍ুড়ের শ্বাশত স‍ুন্দর প্রাত্যহিক ভজন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কলকাতার রাজভবন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কলকাতার রাজভবন—একথা শুনলে অনেকেই হয়তো চমকিয়ে উঠবেন। সে কী? সবাই বলবে—আমরা তো চিরকাল জেনে আসছি যে ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিজের বাড়ীতে আমৃত্যু ডাঃ রায় কাটিয়ে গেছেন। তবে কলকাতার রাজভবনের কথা আসে কেন?

হ্যাঁ, তার সবিশেষ কারণ আছে। ডাঃ রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং ১লা জুলাই উনিশো বাষট্টি মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত প্রায় মাঝে মাঝে রাজভবনে আসতেন নানাবিধ কাজে। মুখ্যতঃ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা শলাপরামর্শ করবার জন্য। যেটা নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যপালের সঙ্গে করা উচিত।

এর মধ্যে রাজ্যপাল হরেন মুখার্জির মৃত্যুর পর যখন উনিশো ছাপান্ন সালের তেসরা নভেম্বর শ্রীমতী পদ্মজা বাংলার স্থায়ী রাজ্যপাল হয়ে এলেন তখন ডাঃ রায় মাঝে মাঝেই সময়ে অসময়ে কলকাতা রাজভবনে শ্রীমতী পদ্মজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন। অনেক সময় দুপুরের লাঞ্চও রাজভবনে সারতেন।

এর একটা মুখ্য কারণ হয়তো বা ছিল কারণ শ্রীমতী পদ্মজা ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কন্যা। সুতরাং ডাঃ রায়ের কাছে শ্রীমতী পদ্মজা তাঁর কন্যাসমা।

এখানে বলা প্রয়োজন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সামগ্রিক জীবনী নিয়ে অনেক অনেক বই বেরিয়েছে। সুতরাং তাঁর জন্ম তারিখ বা সাল তামামি আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি না। করবো কেবলমাত্র গুটিকয় উজ্জ্বল রাজভবনের ঘটনা যা পড়ে মানুষ বুঝতে পারবে যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বকীয় প্রতিভা কী উঁচু ধরনের ছিল।

সাধারণ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করে—তাদের আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু কিছু অসাধারণ লোক জন্মায় তাদের থাকে ভগবানের উপরি পাওনা আরও একটা সেন্স্। যাকে সাধারণ কথায় বলে সিক্সথ্ সেন্স্ বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এটাই ছিল ডাঃ রায়ের জীবনের মূলধন বা তাঁর সর্ববিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি—যা ঈশ্বরের অশেষ দান। ডাঃ রায় খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু সমাধান করতে পারতেন বা কোন একটা ফলদায়ী সূত্র বলে দিতে পারতেন এবং সেটাও দীর্ঘ কালক্ষেপ না করে।

এখন বলি ডাঃ রায়ের আমলের কলকাতা রাজভবনের কয়েকটি ঘটনার কথা যার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন।

সালটা হবে উনিশশো ষাট। রাজভবনের বৃদ্ধ হেড মালী গুণধর মণ্ডল

এই রাজভবনেই ফুলের পরিচর্যা ও বাগানের তদারকি করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাকে এখন এমন এক অসুখে ধরেছে যে সে মাঝে মাঝেই তল পেটের তীব্র ব্যথায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

তার বাড়ী মেদিনীপুর। সে সেখানকার সব বড় ডাক্তার দেখিয়েছে কিন্তু সবই বৃথা।—যখন ব্যথা ওঠে তখন সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। কলকাতারও অনেক বড় বড় ডাক্তার ভিজিট দিয়ে দেখিয়েছে। তাও কিছু হয় নি।

গুণধর মাঝে মাঝেই আমাদের কাছে এর প্রতিকারের জন্য শলা পরামর্শ করতো। আর বলতো পারি না বাবু—মাঝে মাঝে মনে হয় এই পেটের যন্ত্রণায় যে ঘরের ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে আত্মহত্যা করে বসি।

অফিসের সহকর্মী নরেনবাবু যার বাবা আমতার বিখ্যাত এলোপ্যাথিক ডাক্তার তিনি গুণধরকে একদিন পরামর্শ দিলেন বিধান রায় তো এখন বিনা ভিজিটে রোজ সকালে তাঁর ওয়েলিংটন স্কেয়ারের বাড়িতে দশজন করে রোগী দেখেন। সুতরাং গুণধর, যেন একটা পোস্টকার্ডে তার অসুখ জানিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে চিঠি ছাড়ে।

গুণধর নরেনবাবুর বাবার কথা মতো ডাঃ রায়ের নামে একটা চিঠি দিল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। প্রায় মাস দুই পার হতে চললো, কোন খোঁজ খবর নেই। গরীবের কথা কে শোনে—গুণধর মালী রাজভবনের বাগানে বসে বসে ভাবে।

সেদিন ছিল রবিবার। শীতের দুপুর। রাজভবন প্রায় নিশ্চুপ। রাজভবনের বাগানের কোনো কোনো গাছে দু' একটা টিয়ার ঝাঁক কলকাকলি করছে। শীতের উত্তরের বাতাসে হয়তো বা রাজভবনের গাছ-গাছালি থেকে টুপটাপ করে নিঃশব্দে দু'একটা শুকনো পাতা ঘাসে এসে পড়ছে। আর মালী গুণধর রাজভবনের বাগানের মধ্যে মালির কোয়ার্টারে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ লম্বাটানে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে যেন স্বপ্ন দেখছে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, রাজভবনের এই ফুলশয্যার সুখ নিদ্রা কাটিয়ে, রাজভবনের প্রচুর সম্মানিত তার এই হেড মালির পোস্টের দায় দায়িত্ব কাটিয়ে তাকে তাড়াতাড়িই মরণ পারে যমের দুয়ারে হাজির হতে হবেই।—তার যে কঠিন অসুখ।

এই যখন তার স্বপ্নের অবস্থা। তখন হঠাৎ গুণধরের পেটে কে যেন কিসের খোঁচা লাগালো যেন ছোট-খাটো বেতের লাঠির অগ্রভাগের—এ ডি সির ব্যাটন স্টিক।

গুণধর হকচকিয়ে বিছানা থেকে উঠে দেখে স্বয়ং এডিসি ক্যাপ্টেন পন্থ তার দড়ির খাটিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে।—বলছে গুণধর এক্ষুণি চলো লাটসাহেব তোমাকে সেলাম দিয়েছে।

এডিসির মুখে বেশ বিরক্তির ভাব মনে হলো। সদ্য তিনি দিবানিদ্রা থেকে উঠে এসেছেন।

গুণধর কোনো রকমে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে পড়ি কী মরি হয়ে রাজভবনের তিন তলায় গভর্ণর পদ্মজার স্যুইটে এডিসি পন্থের সঙ্গে গিয়ে হাজির।

এডিসি পন্থ গুণধরকে রাজ্যপালের কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ত রাঙ্গা চোখে একতলার ঘরে ফিরে গেলেন। এসে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম তখন তার অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় ভেঙেছে। যতো সব আদিখ্যেতা।

এদিকে গুণধর রাজ্যপালের কামরায় ঢুকে দেখে শ্রীমতী পদ্মজা গুণধরকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। ডাঃ রায়ও সে হাসিতে যোগ দিয়ে নিজের বুক পকেট থেকে একটা দলা-মচা করা পোস্টকার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা তুমি লিখেছো? তোমার কি অসুখ হয়েছে। বাঁচবার ইচ্ছে নেই কেন?

গুণধর মালী মাথা নীচু করে জবাব দিল—হ্যাঁ, হুজুর। আমার আর এ পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছে নেই। তল পেটে মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয় যে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

প্রথমেই ডাঃ রায় শ্রীমতী পদ্মজার কাছে তাঁর সব চেয়ে পুরাতন ও প্রিয় হেড মালী এই গুণধর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিয়েছিলেন।

ডাঃ রায় বললেন, তুমি রাজভবনের বাগানের মধ্যেই মালি কোয়ার্টারে থাক শুনলাম। তোমাকে আর মরতে হবে না। তোমার পরিবেশেই এ অসুখ সেরে যাবে। তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় রোজ কিছু খাবার পর একটি করে এই প্রেসকিপশনের বড়ি পরপর সাতদিন খাবে আর রোজ ভোর বেলায় খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর রাজভবনের বাগানে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবে। ব্যাস। তোমাকে আর ইলেকট্রিকের তার ছুঁয়ে সুইসাইড করতে হবে না।

তারপরও গুণধরের চাকরী থেকে রিটায়ার হতে বেশ কয়েক বছর বাকী ছিল। আর তার মুখে ঐ অসুখের কথা আর কখনও শুনি নি। বরং দেখেছি তাকে সব সময়ই ডঃ রায়ের নামে হাত জোড় করে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে। তার অসুখ একেবারে সেরে গেছে। মুখে বলতে শুনেছি—ডাঃ রায় ভগবান।

আর এক বারের কথা। ডাঃ রায় রাজভবনে এসেছেন শ্রীমতী পদ্মজার সঙ্গে দেখা করতে। কী যেন জরুরী কাজের জন্য। সময় তখন বেলা বারোটা আন্দাজ হবে। হঠাৎ রাজভবনের মধ্যে ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেণ্টের কিছু কর্মচারী ছুটে এসে রাজভবনের ঐতিহাসিক মারবেল হলে ডাক্তার রায়কে ঘিরে ধরলো—স্যার আমাদের অফিসের একজন ছেলে অফিসে এসেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। একটু দয়া করে চলুন, আপনি যখন রাজভবনে এসেই পড়েছেন।

ডাঃ রায় রাজভবনের একতলায় মারবেল হলে থামলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, সরকারী চাকুরে তো তাই বাসের ভিড়ের দোহাই দিয়ে বারোটার সময় অফিসে এসেছে। যাও কোনো পাশের দোকান থেকে একটা 'ভিমটো' লেমনেড এনে ওকে খাইয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্চর্য ব্যাপার। কী জানি ভিমটোর মধ্যে কী পদার্থ ছিল তা ডাঃ রায়ই

জানেন কিন্তু আশ্চর্য ডিমটো খাওয়ানোর পর সে ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উ বসল। তাজ্জব ব্যাপার।

আর একবারের ঘটনা। উনিশশো ছাপান্ন সালের নভেম্বরে সদ্য প্রয়াত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের জায়গায় স্থায়ী রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন শ্রীমত পদ্মজা নাইডু।

তিনি কলকাতার রাজভবনে এসেই সব গন্ধা, গন্ধা বলতে শুরু করলেন অর্থাৎ রাজভবনের চারদিকে ময়লা আর ময়লা। কিছুতেই তার রাজভবনের কিছু পছন্দ হয় না। তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মতে এখানে বিশ্বের ভি-আই-পিরা কে করে থাকবে।

এর মধ্যে হয়েছে কি হঠাৎ একদিন ডাঃ রায় রাজভবনে এসেছেন। শ্রীম পদ্মজা তক্কে তক্কেই ছিলেন। তিনি ডাঃ রায়কে টেনে এনে রাজভবনের পূর্ব ও পশ্চিমে যে মিনিস্টার কোয়ার্টারগুলি আছে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন বিশ্বের ভি-আই-পিরা যদি কলকাতার এই নামকরা রাজভবনে এসে চোখের সাম মেয়েদের কাচা কাপড়, কাঁথা, লেপ, কম্বল, রাজভবনের মধ্যে মিনিস্টার কোয়ার্টা শুকোতে দেখে তবে তো ভারতবর্ষের সমস্ত মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া এই অপরূপ কলকাতার রাজভবনের ভেতর কেমন করে যে আপনি রাজ্য সরকার এর ডেভেলাপমেন্ট অফিস করতে দিলেন টিনের সেড কনস্ট্রাকসন করে তাও আমি বুঝ পারি না। আমি মনে করেছি বাইশ ফুট উঁচু ইঁটের দেওয়াল করে খোদ রাজভ থেকে মিনিস্টার কোয়ার্টার পৃথক করে দেবো।

ডাঃ রায় শ্রীমতী পদ্মজার কথাগুলি শুনে বললেন,—দেখছি, কী করা যায় ভেবে দেখি। একটু সময় দাও।

এদিকে তখনকার দিনের বাঘা বাঘা কংগ্রেস মিনিস্টাররা তখন রাজভবে মিনিস্টার কোয়ার্টারে সোরগোল উঠিয়ে বহাল তবিয়তে সুখে বাস করছেন। কেউ বা দীর্ঘ দশ বছর কেউ বা বছর পনেরো। এঁদের মধ্যে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, আবদুস সাত্তার, খগেন দাশগুপ্ত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন মিশ্র, সবাই তো এক একজন রথী মহারথী।

এর মধ্যে আবার প্রধান হচ্ছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন—যাকে শোনা যায় ডাঃ রায় বেশ ভয় মিশ্রিত সমীহ করে এসেছেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সব সময়ে।

মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্ত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন মিশ্র, আবদুস সাত্তার—এঁদের বৌ-রা রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার ইঁটের দেওয়াল তোলার সাজেশানের ক কানে যাওয়াতে একসঙ্গে গিয়ে প্রফুল্ল সেনকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আকার ইঙ্গিতে বলে ফেলেন যে তাদের স্বামীরা জনপ্রতিনিধি। আর পদ্মজা উনি তো পুজোর থালার নৈবিদ্যের উপর ঠুঁটো জগন্নাথ চিনির মণ্ডা।

নৈবিদ্য সাজাতে দিলেও চলে আবার না দিলেও কোন দোষ হয় না। উনি তো তদবির করে ধরে করে দিল্লী থেকে পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন।

মিনিস্টার কোয়ার্টারের সামনে বাইশ ফুট ইঁটের দেওয়াল তুলে দিয়ে আমরা যে দম বন্ধ হয়ে ঘরে মারা যাবো। আর আমাদের স্বামীদের স্বাস্থ্য তো রসাতলে যাবে। তখন দেখবেন কী ঐ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা, না আপনি ?

কথাগুলি শুনে শ্রীপ্রফুল্ল সেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, আচ্ছা দেখি কী করা যায়।

পরের দিন বিধান রায় রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুকে নিয়ে সরেজমিনে রাজভবনে এসে সব খুঁটিয়ে দেখলেন।

সব কিছু মনে মনে হিসেব করে ফেললেন। পরে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান রাজভবনের তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বোসকে বললেন—ওহে বোস, আমি তো ডাক্তার। তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে এমন কিছু ফরমুলা বের করতে পারলে না।

তবে শোন। কাল তুমি রাজ্যপাল পদ্মজার কথা মতো বাইশ ফুট দেয়াল তুলে দেবার বন্দোবস্ত করো। তবে নিচের চার ফুট থাকবে ইঁটের গাঁথনি আর বাকী আঠারো ফুট হবে তারের নেটের। ওতে লতানো গুল্ম লাগানো থাকবে। যাতে আমার মিনিস্টাররাও কোয়ার্টারে বসে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে পারেন আর রাজভবনের ভি-আই-পি-দেরও আর যাতে মন্ত্রী নিবাসের বারান্দায় শাড়ী শুকানো না দেখতে হয়।

ডাঃ রায়ের এই অভিনব যুক্তি শুনে ও তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্ফুরণে একদিকে যেমন রাজ্যপাল পদ্মজা সন্তুষ্ট হলেন অন্যদিকে মন্ত্রী পত্নীরাও ততোধিক উল্লসিত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আর একবার ডাঃ রায়ের কানে গেলো যে রাজভবনের রাস্তার নুড়ি পাথর পালটাতে প্রায় প্রতি বছরই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কারণ রাজভবনে যে সব বড় বড় মোটর, জীপ, পুলিশের ভ্যান ইত্যাদি ঢোকে তাতে গ্রাভেল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। ধুলো ওড়ে। সব সময় ধুলোর জন্য জল দিতে হয়।

তিনি রাজভবনে এসে হুকুম দিলেন ইঞ্জিনিয়ারকে যে নুড়ি পাথর হটিয়ে সমস্ত রাজভবনের রাস্তা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দাও ও ফরেনের মতো নানা রকম রঙ লাগাও, দেখবে রাস্তাগুলি সুন্দর লাগবে রামধনুর মতো। তাতে টাকার সুরাহা হবে, প্রতিবারে নুড়ি পাথর কিনতে হবে না।

রাজভবনের তদানীন্তন বড় ইঞ্জিনিয়ার মিঃ চ্যাটার্জি ডাঃ রায়ের এই কথার ওপর কিছু সাহস করে বলতে পারলেন না ; কিন্তু তখনকার রাজভবনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, যিনি সব সময়ে লোককে গর্ব করে বলে বেড়াতেন আমি স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রের ভাগ্নে, সেই মিঃ লাহিড়ী ফস্ করে ডাঃ রায়ের মুখের ওপর বলে বসলেন, স্যার আমার ওপরওয়ালা চ্যাটার্জি সাহেব সবিশেষ জানেন এই রাজভবনের গ্রেভেলের তলা দিয়ে অনেক জলের, টেলিফোনের ও গ্যাসের কানেকশন মেন বিল্ডিং-এ অর্থাৎ খোদ রাজভবনে গেছে। সুতরাং গ্রাভেলের রা-

রঙিন সিমেণ্ট দিয়ে ঢেকে দিলে প্রয়োজনে খোঁড়াখুঁড়ি করা বেশ অসুবিধে হবে কারণ রোজই তো ভি-আই-পিরা আসেন রাজভবনে।

মিঃ লাহিড়ী আরও বললেন, তাছাড়া আমার মামা স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার মৈ একবার আমাকে বলেছিলেন যে বড়লোকের বাড়িতে রাস্তায় গ্রাভেল দেওয়া থাকে কেন জানিস,—গৃহস্বামী ঘরে বসে বসেও জানতে পারেন গ্রাভেলের মচ মচ শব্দে যে কোনো কেউ আসছে কি না। এছাড়াও চোর-ডাকাতও গ্রাভেলের ওপর দিয়ে খুব ছুটে পালাতে পারবে না। ইংরেজরা চতুর, তাই রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর বিছিয়ে দিয়েছিল। তারা কাজের লোক, কাজ বুঝতো।

একথা শুনে ডাঃ রায়ের কান লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তোমার কথায় যুক্তি আছে তাই আমি এখুনিই কিছু বলতে চাই না। ওটা তবে এখন রাখ। পরে দেখা যাবে।···

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যতদিন বেঁচেছিলেন অর্থাৎ ১লা জুলাই উনিশশো বাষট্টি সালের আগে পর্যন্ত তিনি মাঝে মাঝেই রাজভবনে আসতেন রাজ্যপালের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সৌজন্যমূলক দেখা-সাক্ষাৎ করতে।

তিনি তখন ছিলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুতরাং প্রদেশের রাজ্যপালের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করাটা সৌজন্যমূলক রীতি।

সেটা ছিল উনিশশো ষাট সালের ডিসেম্বর মাস। বিধানচন্দ্র রায়ের চোখ অপারেশন হয়েছে দার্জিলিং-এ বিলাতী ডাক্তার দ্বারা। ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তা· লিনডারের আসা সম্ভব হয় নি, তারই উপযুক্ত সহকর্মী ডাঃ বোয়েক অপারেশ·· করেছেন। ডাঃ রায় দৃষ্টি সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছেন।

কলকাতায় ফিরে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার আমন্ত্রণে ব্যারাকপুর লাটকুঠীতে ডাঃ রায় মাস খানেকের জন্য বিশ্রাম উপভোগ করছেন তাঁর ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ী ছেড়ে।

রোজ সকালে নিত্যনৈমিত্তিক আধখানা কাঁচা বেল নিজের হাতে চামচ দিয়ে কুরে কুরে বেশ আনন্দ সহকারে খেয়ে তিনি ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাগস্টাফের ময়দানে কাঁচা সবুজ ঘাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন বিলাতী ডাক্তারের পরামর্শে!

বিজলীভূষণ চ্যাটার্জি যিনি লাট বাগানের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী তাঁর ওপর ভার পড়েছে সমস্ত দিন ডাঃ রায়ের দেখা-শুনা করবার। তাই বিজলীবাবু ডাঃ রায়ের কথা মতো কাকডাকা ভোরে গিয়ে হাজির হন ফ্ল্যাগস্টাফ কুঠীতে।

ডাঃ রায়ের বেল খাওয়া হলে তিনি একখণ্ড সাদা কাগজ নিয়ে কখনো কাছে, কখনো দূরে ফ্ল্যাগস্টাফের ময়দানের ঘাসে ছোটাছুটি করেন ডাঃ রায়ের কথা মতো—[illegible] কতদূর থেকে তা দেখতে পান তার হদিস করবার জন্য।

এটা নাকি ডাঃ রায়ের চোখের ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ। তারপর কিছু বেলা বাড়লে বিজলীবাবু তাঁর ব্যারাকপুরের কোয়ার্টারে স্নানাহার করতে চলে আসেন [illegible]।

একদিন হলো কী বেলা দশটা নাগাদ বিজলীবাবু ডাঃ রায়ের কাছে ছুটি নিয়ে ঘর-মুখো হচ্ছেন. ডাঃ রায় বললেন,—দিনের বেলা তো একটুও ঘুম বা বিশ্রাম নিতে পাচ্ছি না ওই মাথার ওপর দিয়ে ব্যারাকপুরের মিলিটারী প্লেনগুলো যাবার জন্য। কী করা যায় বলতো।

বিজলীবাবু কী করবেন, মাথা চুলকাতে লাগলেন। মুখে তার কোন উত্তর নেই। ডাঃ রায় বললেন,—তুমি একবার চেষ্টা করো এ ব্যাপারে মিলিটারী ফ্লাইং ক্যাপ্টেন-এর সঙ্গে দেখা করে। তারপর আমি দেখবো।

বিজলীবাবু আরও দুজনকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিটারী ক্যাপ্টেন-এর দপ্তরে গিয়ে হাজির হলেন। সব কথা খুলে বুঝিয়ে বললেন।···

মিলিটারী ফ্লাইং অফিসার বোধ হয় ব্যারাকপুরে নতুন বদলী হয়ে এসেছিলেন। তিনি তো বিজলীবাবুর সব কথা শুনলেই না, বরং শ্লেষ করে বললেন,—এটা কী ছেলে খেলা, child's game. ওসব আবদার সহ্য করা হবে না। যান চলে যান, এক্ষুনি।

বিজলীবাবু ও তার অ্যাসিসট্যাণ্ট মানব সেন মুখ কাঁচুমাচু করে ডাঃ রায়ের কাছে ফিরে এলেন। রাস্তায় আসতে আসতে বরিশালের রোখা লোক মানব সেন গজরাতে গজরাতে বিজলীবাবুকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন,—আমাদের অপমানের কথা সব ডাঃ রায়কে বলবো।

কিন্তু দুজনে ডাঃ রায়ের সামনে বসে নিরুত্তর হয়ে তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। আমতা আমতা করতে লাগলেন।

ডাঃ রায় সব বুঝলেন। তাদেরকে বললেন, তোমরা বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করো। বিকেলে ফিরে এসে দেখবে আমি যতদিন এখানে আছি আমার মাথার ওপরের আকাশ দিয়ে কোন এরোপ্লেন যাতায়াত করছে না দুপুর বেলায়।

সত্যিই তারপর দুপুর বেলা ব্যারাকপুর লাট বাগানের ওপর দিয়ে এরোপ্লেন যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।

অনেক কষ্টে বিজলীবাবু পরে জেনেছিলেন যে ডাঃ রায় বিজলীবাবু ও মানব বাবুর কথার সব কিছু আঁচ করে নিয়ে তখনই চীফ সেক্রেটারীকে দিয়ে এরিয়া কমানডারকে কড়া হুকুম দিয়েছিলেন দুপুর বেলায় ব্যারাকপুরের ফ্লাগস্টাফ কুঠীর ওপর দিয়ে কোন প্লেন যাতায়াত করতে পারবে না।

ফ্যাইং কমানডারও জো হুকুম বলে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ডাঃ রায়ের পারসোনালিটির সামনে কখনও কিছু না বলার উপায় ছিল না। সম্মত হতেই হলো।

সালটা ছিল উনিশশো ছাপান্ন। ৮ই আগস্ট। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী তার আগের দিন সন্ধ্যেয় হঠাৎ তার স্টেনো অতুলবাবুকে ডিকটেশন দিতে দিতে রাজভবনের নিজের স্যুইটে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন।

সুতরাং স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তখনকার কলকাতা হাইকোর্টের

চীফ জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তীর ওপর রাজ্যপালের ভার অর্পিত হলো। আগে নাকি বৃটিশ আমলে নিয়ম ছিল যে প্রদেশের গভর্ণর হঠাৎ মারা গেলে রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী রাজ্যপাল হবেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী রাজ্যপাল হবেন না, হবেন রাজ্যের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস।

সুতরাং পরের দিন সকাল দশটায় ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে অস্থায়ী রাজ্যপালের শপথ পড়াবেন তখনকার অস্থায়ী চীফ জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জী এবং পরে আবার নব নিযুক্ত অস্থায়ী রাজ্যপাল মিঃ চক্রবর্তী শপথ বাক্য পাঠ করাবেন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রমাপ্রসাদকে। এটাই নাকি নিয়ম।

যথারীতি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রমাপ্রসাদ বেলা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজভবনের বিখ্যাত থ্রোন রুমে।

সেখানে যথারীতি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, খগেন দাসগুপ্ত, সৌরেন মিশ্র, কালিপদ মুখার্জী, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। এছাড়া ছিলেন পশ্চিমবাংলার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চানসেলার এবং কলকাতায় অবস্থিত নানা দেশের এমবাসীর কূটনৈতিক সদস্যবৃন্দ।

রাজ্যপালের শপথ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নব নিযুক্ত রাজ্যপাল ফণিভূষণ তাঁর এডিসি সমভিব্যাহারে রাজভবনের তিনতলায় তাঁর নির্দিষ্ট স্যুইটে চলে গেলেন সাময়িক বিশ্রাম নেবার জন্য।

এদিকে পরবর্তী অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রমাপ্রসাদের শপথের জন্য ডাঃ রায়, প্রফুল্ল সেন, খগেন দাসগুপ্ত প্রভৃতি মন্ত্রীরা বেশ কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করার পর ডাঃ রায় তদানীন্তন রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী এস এন রায়কে ডেকে বললেন—ওহে সত্যেন, দেখো না গভর্ণর সাহেবকে বলে,—একটু তাড়াতাড়ি অস্থায়ী চীফ জাস্টিসের শপথটা নেওয়া হলে আমরা তাড়াতাড়ি রাজভবন ছাড়তে পারি।

চীফ সেক্রেটারী প্রত্যুত্তরে বললেন—স্যার, ঐ বাঘের মুখে আমাকে পাঠাবেন না।

তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্ত নব নিযুক্ত রাজ্যপাল ফণিভূষণের কাছে কেবলমাত্র গিয়েই পরক্ষণে মুখ কাচুমাচু করে ফিরে এসে ডাঃ রায়কে বললেন—রাজ্যপাল বলেছেন যে ডাঃ রায়কে গিয়ে বলুন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে আমি থ্রোন রুমে অস্থায়ী বিচারপতির শপথ অনুষ্ঠানে হাজির হবো। বিচলিত হবার কোন কারণ নেই, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে আমার সময়ের দাম কিছু কম নয়।

পশ্চিমবাংলার প্রবাদ পুরুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফণিভূষণের এই জবাব শুনে যেন একটু মনঃক্ষুন্ন হলেন। মুখে কিছু বললেন না। একটু যেন হতাশ হলেন।

এর পরের ঘটনা হয়তো অনেকেরই মনে আছে যে অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ যে কয় মাস অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের আটই আগস্ট থেকে তেসরা নভেম্বর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল ছিলেন সেই কয়েক মাস রাইটার্স বিলডিংস থেকে মন্ত্রীদের যে সব সই করা ফাইলপত্র আসতো তাতে তিনি রেলিভেণ্ট ফাইলপত্র ও আইনানুগ নিয়ম খুঁটিয়ে না দেখে সাধারণতঃ কখনও অন্যান্য রাজ্যপালদের মতো সংবিধানের ধুয়ো তুলে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো সই-সাবুদ করতেন না।

ফণিভূষণের সময় বিভাগীয় সেক্রেটারীরা রাজভবনে ফাইল পাঠাবার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব দেখে-শুনে ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য নথীভুক্ত করে তবে তাঁর কাছে ফাইল সই করতে পাঠাতেন।
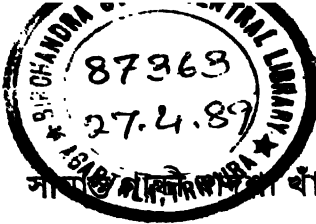
সীমান্ত গান্ধী বাদশা খাঁ ও কলকাতার রাজভবন

দশই ডিসেম্বর উনিশশো উনসত্তর সালের বেলা দু'টোর সময় সীমান্ত গান্ধী বাদশা খাঁ কলকাতা রাজভবনের উত্তর দিকের কারুকার্যময় প্রধান ফটকের মধ্য দিয়ে এসে রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে মন্ত্রীনিবাসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত ঘরে এসে ঢুকলেন। তারও বেশ কয়েকদিন আগে থেকে বাদশা খাঁ-এর ছ'দিনের কলকাতা পরিদর্শনের কর্মসূচী অনুসারে এই রাজভবনের মন্ত্রীনিবাস ঝকঝকে, তকতকে করে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল—যদিও রাজভবনের ছায়ায় ঘেরা কলকাতার এই সব মন্ত্রী নিবাসে হয়তো লাটের ক্বচিৎ পায়ের ধুলো পড়ে তবু জনগণের পয়লা নম্বরের প্রতিনিধি মন্ত্রীরা এখানে থাকেন।

গান্ধী শতবর্ষ স্মারক কমিটির কর্মকর্তারা সীমান্ত গান্ধীকে এখানে রাখবার আয়োজন করেছিলেন। তাই তাঁরা এই বাড়ীটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সচেষ্ট ছিলেন।

বাদশা খাঁ নিরাড়ম্বর জীবন পছন্দ করেন। সুতরাং রাজভবনের মন্ত্রীনিবাসে খুব একটা অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্যের আতিশয্য করা হয়নি। তবে বিদেশী একজন সম্মানিত অতিথি এলে যতটুকু ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন তাই-ই করা হলা।

মন্ত্রীনিবাসের নীচের তিনখানা ঘরে বাদশা খাঁ ও তাঁর সাথীদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হলো।

তবে মুস্কিল হলো বাদশা খাঁর শোবার বন্দোবস্ত নিয়ে।

কারণ সাধারণ পালঙ্কে বা খাটে বাদশা খাঁর শরীর আঁটছে না। এই অশীতিপর বৃদ্ধ পাঠানের উচ্চতা প্রায় ছ' ফিট ন' ইঞি। আর সাধারণতঃ সবচেয়ে যে লম্বা খাট হয় তা প্রায় ছ'ফুটের মতো। সুতরাং বালিশ বিছানা নিয়ে এই ছোট খাটে সীমান্ত গান্ধীর শোয়া তাঁর বসবারই নামান্তর হবে। অবস্থাটা পালঙ্কে স্বস্তিতে শোবার বদলে ডেকচেয়ারে অর্ধশায়িত হয়ে রাত কাটানোর মতো।

তাই সীমান্ত গান্ধীর জন্য রাজভবনে নূতন স্পেশাল বারো ফুটের লম্বা খাট করানো হলো ও তার ওপর রাখা হলো নিরাভরণ সাদা দু'টি মাত্র বালিশ ও সামান্য তোষক।

তাতেই সীমান্ত গান্ধী মহাখুশী। তিনি চান না কোনো বিষয়েই সংযমের কার্পণ্যতা। চান না অর্থের নিছক অপব্যবহার বা উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই তার নব নির্মিত খাটে রাজভবনের কায়দা মাফিক ডানলোপিলোর গদি দেবার কথা উঠলেও

কেউ দিতে সাহস করে নি। এমন কি মুখে বাদশা খাঁর সামনে তা উচ্চারণ করতেও আগ্রহী হননি।

এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকাবহ ঘটনা মনে পড়ে গেলো।

তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন দুর্দান্তপ্রতাপ জেনারেল দ্য'গল। তিনি তখন নিমন্ত্রণে এসেছেনে আমেরিকা সফরে। আমেরিকার হোয়াইট হাউসে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ দ্য'গল শুতে গিয়ে দেখেন তাঁর পা আঁটছে না শোবার খাটে। কারণ তিনি উচ্চতায় প্রায় সাত ফুট দু' ইঞ্চি। হৈ হৈ পড়ে গেলো সমস্ত হোয়াইট হাউসে। অতিথি বৎসল আমেরিকানরা হতভম্ব। লজ্জিত। এত রাতেই বা কী ব্যবস্থা করা যায়। শেষ পর্যন্ত পর পর তিনটি খাট আড়াআড়ি ভাবে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট দ্য'গলের রাত্রের বিছানা করে দেওয়া হোল।

কলকাতার রাজভবনকেও এই রকম বার দুয়েক হঠাৎ অপ্রস্তুতের সামনে পড়তে হয়েছিল।

রাজ্যপাল ধর্মবীরার আমলে ১৯৬৭ সালে যখন আমেরিকার মিঃ ম্যাকনামারা ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে কলকাতার রাজভবনে এসেছিলেন তখন ঠিক দ্য'গলের মতো শোবার পালঙ্ক ছোট হয়েছিল এবং তা ধরা পড়েছিল ঠিক মধ্যে রাত্রে মিঃ ম্যাকনামারা যখন রাজভবনের প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে শুতে এলেন।

আর একবার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আফ্রিকা মহাদেশের একজন প্রেসিডেন্ট এসেছিলেন রাজভবনে, তিনি এতো মোটা ছিলেন যে লোহার খাট অর্ডার দিয়ে বানানো হয়েছিল আগে থেকে এবং খাটে ভারী বারবেলের লোহার ওয়েট ঝুলিয়ে দেখে নেওয়া হয়েছিল খাট ঐ প্রেসিডেন্টের ওজন বইতে পারবে কি না, কারণ মাঝরাতে খাট ভেঙে পড়া আর রাজ্যপালের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া দুই সমান।

যাক যে কথা বলছিলাম তাতে আসা যাক।

কলকাতার রাজভবনের বাদশা খাঁকে কিন্তু সে অপ্রস্তুতিতে পড়তে হয় নি। কারণ পূর্বেই কর্মকর্তাদের খেয়াল হয়েছিল যে সীমান্ত গান্ধী যেমন মনের দিক দিয়ে মহান তেমনি দেহের দিক থেকেও উচ্চতায় প্রায় ছ' ফিট ন' ইঞ্চি। অর্থাৎ মনে ও দেহে প্রায় সমান সমান।

সে যাই হোক বাদশা খাঁ বুধবার দশই ডিসেম্বর, উনিশশো উনসত্তর সালের বেলা দু'টোর সময় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজভবনে এলেন।

দমদম বিমান বন্দরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান তখনকার পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, গান্ধী শতবর্ষ স্মারক কমিটির বাংলা শাখার চেয়ারম্যান শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

দমদম বিমানবন্দর থেকে রাজভবন পর্যন্ত এই প্রায় দশ কিলোমিটার পথের দু'ধারে অসংখ্য জনগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাদশা খাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বাদশা খাঁও খোলা মটর গাড়ীর ওপর থেকে করজোড়ে সকলকে প্রত্যাভিবাদন করেছেন।

বাদশা খাঁর পরনে ছিল হালকা ছাই রং-এর পাজামা ও কুর্তা এবং মাথায় গান্ধী টুপী।

এদিন বিকালবেলায় প্রায় পাঁচটার সময় যখন রাজভবনের ঐতিহাসিক সুন্দর মারবেল হলে গান্ধী শতবর্ষ স্মারক কমিটি আয়োজিত সভায় সীমান্ত গান্ধী ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন রাজভবনের পুরনো দিনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

এই সেই ইংরেজ আমলের ঐতিহাসিক 'মারবেল হল' যেখানে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ-রাজ-শাসনে ওয়েলসলী, বেণ্টিঙ্ক, কার্জন, ডালহাউসী থেকে কতো কতো লাট এখানে এই মারবেল্ হলে গোপন মিটিং-এর ভিত্তিতে শলা-পরামর্শ করেছেন। আবার এই সেই রাজভবন যেখানে আজ পুণ্য পবিত্র সীমান্ত গান্ধীর পদধূলি পড়লো। আর এখানে এর আগে বহুবর্ষ পূর্বে পদধূলি পড়েছে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের।

বাদশা খাঁ এই মিটিং-এ সামান্য কথায় বারবার সভাস্থ লোককে স্মরণ করিয়ে দিলেন গান্ধীজীর অহিংসার বাণী—তাঁর মতে যেটা স্বাধীন ভারত ভুলতে বসেছে। তিনি বললেন, ভারত আমাকে গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ করে এনেছে, কিন্তু আমি বলি যে, ভারতবাসীরা গান্ধীর কথাই কোন দিন মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন নি, তারা আমার কথা কী শুনবেন ?

থেমে থেমে তিনি বললেন—তাঁর মতে ভারতবর্ষের একশত ভাগের আশি ভাগ কষ্টের কারণ ভারতবাসী গান্ধীর বাণী ভুলে গেছে। গান্ধীকে তাঁরা মনে-প্রাণে স্মরণ করে না। এখানে এই বাইশ বৎসর স্বাধীনতার আমলে দেশের গরীবেরা আরও গরীব হতে চলেছে আর বড়লোকেরা উত্তরোত্তর হচ্ছে সমৃদ্ধশালী—কোথায় সেই গান্ধীজীর স্বপ্ন—সেই সব শুভ বুদ্ধি।

এই সভায় বাংলার তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সীমান্ত গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ অনুচর ও উত্তরসাধক বলে অভিহিত করেন।

বাদশা খাঁর এই ছ' দিনের কলকাতা সফরসূচীর মধ্যে তিনি কলকাতা ময়দানে ঈদের নামাজে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা করপোরেশন-এর সম্বর্ধনা সভায় নেতাজী ভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পুস্তু ভাষায় ভাষণও দিয়েছিলেন।

এছাড়া তিনি মাঝে চৌদ্দই ডিসেম্বর রাতের ট্রেনে শান্তিনিকেতন যান এবং

সেখানে থেকে পরের দিনই অর্থাৎ পনেরই ডিসেম্বর বিকেলে কলকাতার রাজভবনে ফিরে আসেন।

বাদশা খাঁ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম উপাধি গ্রহণ করেন নি এই বলে যে, যিনি নিজেই স্বয়ং খোদার খিদমদগার অর্থাৎ যিনি নিজেই ভগবানের দাস তার অন্য কোন বাড়তি ভূষণের দরকার নেই।

সত্যি বাদশা খাঁ-কে এই ছ'দিনে রাজভবন চত্বরে যেমন দেখেছি, এমন সরল জীবন যাপন ও ছোট ছেলেদের মতো সদা হাস্যময় ব্যক্তি কমই চোখে পড়েছে।

এই প্রসংগে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।

বাদশা খাঁ যেদিন কলকাতায় এলেন তাঁর হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলি ছিল। এই পুঁটলিতে থাকে বাদশা খাঁর একটি পায়জামা ও কুর্তা। এটা তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সব সময়ের সাথী। কারণ তিনি স্যুটকেশ বা ব্যাগ ব্যবহার করতেন না।

কিন্তু কলকাতায় তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ভাগিনেয় মহম্মদ ইউনিস। তিনি এই ভ্রমণের শুরুতে সুদূর কাবুল থেকেই মামা বাদশা খাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি বেশ ফিটফাট, সচকিত, স্মার্ট। কিন্তু কলকাতার রাজভবনে এসেই দেখা গেল তাঁর স্যুটকেশের চাবি হারিয়ে গেছে। হৈ-হৈ ব্যাপার। খোঁজ খোঁজ। কিন্তু চাবি তাদের প্লেনেই খোয়া গেছে না রাস্তায় পড়ে গেছে তার হদিশ মিলল না।

অনেক খোঁজ-তল্লাসী করে পরে ডালহৌসী স্কোয়ারের ব্যাংকশাল কোর্টের ফুটপাত থেকে চাবিওয়ালা ধরে নিয়ে আসা হল। নতুন চাবিতে মহম্মদ ইউনিসের বন্ধ স্যুটকেশ খুলে গেল। আর ওদিকে বাদশা খাঁ শিশুসুলভ হাসিতে বলে উঠলেন, এ জন্যেই আমি কাপড়ের পুঁটলি ব্যবহার করি, স্যুটকেশ নয়।

আর একটি ঘটনা। সোমবার, পনেরই ডিসেম্বর, উনিশশো উনসত্তরের বিকেল প্রায় পাঁচটা হবে, বাদশা খাঁ সবেমাত্র শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার রাজভবনে ফিরেছেন।

হঠাৎ ডালহৌসী অফিস পাড়ায় হাজার হাজার অফিস-ফেরৎ দর্শক দেখল যে প্রায় একশো দেড়শো কাবুলিওয়ালা, পরনে জমকালো পায়জামা এবং কিছু তার মধ্যে লুঙ্গীপরা এবং তাদের মাথায় বাহারে পাগড়ী আঁটা, ঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে রাজভবনের দিকে আসছে। সে নৃত্য পাঞ্জাবীদের ভাংড়া নৃত্য, না গরবা, না পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত কত্থক তা বোঝা গেলো না। তবে সুপুরুষ সাত ফিট দৈর্ঘ্যের কাবুলীদের নাচ দেখে মনে হতে লাগলো এবার বুঝি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে রাজভবনের উত্তর দিকের প্রধান ফটক ভেঙে পড়তে পারে।

সন্ধ্যের সময় রাজভবনের মারবেল হলে সীমান্ত গান্ধী বাদশা খাঁকে দেশওয়ালী প্রবাসী ভাই কাবুলীওয়ালারা সম্বর্ধনা জানান। বাদশা খাঁও ধীরে ধীরে তাদেরকে অনেক সৎ উপদেশ দিলেন এবং তিনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছেন তাও বললেন খটখটে পুস্তু ভাষায়।

এরপর সমস্ত কাবুলীওয়ালারা নিজেদের মধ্যে দেশীয় পুস্তু ভাষায় হাসাহাসি করে কি যে আলোচনা করছিল, আবার মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল তা আমার পক্ষে বোধগম্য হয়ে উঠছিল না—আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিলাম আর মনে মনে স্মরণ করছিলাম মাষ্টার মহাশয় ভাষাবিদ সুনীতি চাটুজ্যের কথা।

তিনি সেখানে থাকলে নিশ্চয়ই পুস্তু ভাষার অর্থ কিছুটা বোধগম্য হতো। বেঘোরে কাবুলীদের মধ্যে পড়ে প্রাণটা এমনিতরু ওষ্ঠাগত হতো না।

জওহরলাল ও কলকাতার রাজভবন

দেশ স্বাধীন হবার পর অর্থাৎ উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনরোই আগস্ট থেকে উনিশশো চৌষট্টি সালের সাতাশে মে বেলা ১-৫৫ মিনিটে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জওহরলাল কলকাতার এই সুন্দর ঐতিহ্যময় রাজভবনে অন্তত পক্ষে ৩০।৪০ বার সদলবলে এসেছেন, থেকেছেন।

কখনও এসেছেন বান্দুং কনফারেন্স সেরে পঞ্চাশের দশকে কর্ণেল নাসের, মার্শাল টিটো প্রভৃতির সঙ্গে আবার কখনো এসেছেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন, ক্রুশ্চেভদের সঙ্গে কলকাতার ময়দানের বিশাল-সভায় ভাষণ দিতে বা এসেছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই যখন পঞ্চাশের দশকে কলকাতা পরিদর্শনে এসেছিলেন তাঁর সাথে।

তবে যতবারই জওহরলাল কলকাতার রাজভবনে এসেছেন তখনই রাজভবনের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

রাজভবনের মেন গেটে ও দক্ষিণের দিকের ময়দানের গেটে কলকাতা পুলিশের পতাকাধারী দু'জন করে চারজন ঘোড়সওয়ার সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠায় খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব পতাকা প্রিন্সেস অব ওয়েলস্ স্যুইটের ওপর থেকে পত পত করে উড়ছে। সমস্ত রাজভবন তখন আলোয় আলোকময়। রাজভবনের সব কর্মচারীই শশব্যস্ত। বিয়ে বাড়ীর আনন্দ যেন রাজভবনে ঘিরে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকা উঠে গেছে ষাটের দশক থেকে।

তবে রাজভবনে জওহরলালজীর বৈশিষ্ট্যের যে ছবি সবচেয়ে বেশী আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে এই, ইংরেজী শিক্ষিত বলতে পাকা ইংরেজের মতো সময়ের হিসেবে, এক চুলও এদিক ওদিক নেই ; অথচ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা চাই তাঁর।

যতদিন রাজভবনে জওহরলালকে দেখেছি, কোনো দিন তাঁকে, সে যতো রাতেই তিনি শুতে যান না কেন, এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। ঠিক সকাল ৫টা থেকে ৫-৩০টার মধ্যে রাজভবনের প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল এসে রাজভবনে ওঠেন সেখানের ঘরে হঠাৎ বালবের আলো জ্বলে ওঠে।

পণ্ডিতজী সকাল ৫টা থেকে ৫-৩০টার মধ্যে রোজ ঘুম থেকে ওঠেন। পরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে তিনি আধ ঘণ্টা মতো শীর্ষাসন ইত্যাদি যৌগিক ব্যায়াম করেন।

পরে রেশমী পট্ট বস্ত্র পরে গীতা বা কোনো ধর্মপুস্তক বেশ কিছুক্ষণ পড়েন। পরে এক কাপ লেবু দেওয়া চা খান। তারপর সে দিনের কর্মসূচী আরম্ভ করেন।

কলকাতার রাজভবনে জওহরলাল যখন এসেছেন, আগেই বলেছি যে বৃটিশ জমানার বৃটিশ লাটের কথা ছেড়ে দিলে, জওহরলাল রাজভবনে এলে যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো তা অন্য কোনো ভি-আই-পি এলে হতো না।

এমন কি তখনকার দিনের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যিনি নাকি আচার-ব্যবহারে কথা-বার্তায় খাঁটি ভারতীয় ছিলেন, তিনি এলেও কলকাতার রাজভবনে ততটা আনন্দ হতো না।

এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে, দেশ তখন সদ্যই স্বাধীন হয়েছে, আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলালকে দেশ-বিদেশের লোক চেনে জানে। সুতরাং জওহরলাল যেখানেই যান, বিশেষত কলকাতায় এলে তাঁকে ছেঁকে ধরেন বিভিন্ন দেশের এমব্যাসীর হাই ডিগনেটারীরা, বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীর ডাইরেক্টরেরা, বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা এবং এই রকম আরও অনেক।

এই সব সময়ে জওহরলালের ব্যক্তিত্বের একটি অন্ধকার দিকও দেখেছিলাম। তার বর্ণনা দিচ্ছি।

এমনিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল অত্যন্ত হাসিখুশী আমুদে ধরনের লোক। কথার মাঝে মাঝে Intelligent wit করতে অত্যন্ত পারদর্শী। কিন্তু কোনো বিষয়ে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেই বা কোনো বিষয়ে একটু বাধা পেলেই তা তার সেদিনের হাবভাব কথাবার্তায় প্রকাশ পাবেই—সেটা নাকি পৃথিবীর অখ্যাত সামান্যতম ডিপ্লোম্যাটদের পক্ষেও ডিসকোয়ালিফিকেশন।

কলকাতার রাজভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এলেই সাধারণতঃ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়।

দেখা গেছে কেবলমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই সাংবাদিকের সমস্ত আঁকা-বাঁকা কুটিল প্রশ্নের উত্তর সহাস্যে দিয়ে চলেন কিন্তু জওহরলালজীকে বা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে রাজভবনে কাউন্সিল চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলনে একটু আধটু এধার ওধার ঘুরিয়ে বাঁকা প্রশ্ন করলেই চোখ মুখ তাদের লাল হয়ে উঠতো আর জওহরলাল তো এতো অধৈর্য হয়ে উঠতেন যে সে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে উঠতেন। এসব ঘোরপ্যাঁচ প্রশ্নের মধ্যে—যেটা নাকি পৃথিবীর এ ক্লাস রাজনীতিদের পক্ষে মোটেই গর্বের বিষয় নয়।

এ ছাড়াও জওহরলালজী, আমার কাছে অন্তত মনে হয়েছে যে তাঁর বয়সের পরিমাপের তুলনায় কিছুটা অস্থির ও সামান্য কারণে ধৈর্যহীন ছিলেন।

একবার হলো কি চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এসেছেন কলকাতার রাজভবনে আবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট শাস্ত্রমিৎ জোজোও আছেন এখানে। জওহরলাল তো ছিলেনই কলকাতার রাজভবনে! তাঁর ইচ্ছে ছিল দমদম এরোড্রামে চৌ-এন-

লাই ও শাস্ত্রীমিৎ জোজোকে নিয়ে এক গাড়ীতেই তিনি নিজে বিদায় জানাতে যাবেন। কিন্তু কেন জানিনা রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা জওহরলালের অলক্ষ্যে রাজভবনের পেছনের সাউথ গেট দিয়ে শাস্ত্রীমিৎ জোজোকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন দমদম এরোড্রামের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল যখন রাজভবন থেকে চৌ-এন-লাইকে নিয়ে গাড়ীর মিছিল করে দমদম এরোড্রামের উদ্দেশ্যে বেরুলেন তখন শ্রীমতী পদ্মজার এই প্রটোকল বহির্ভূত আচরণে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং দমদম এরোড্রামে পৌঁছে শ্রীমতী পদ্মজাকে যা নয় তাই বললেন। পরের দিনের দৈনিক কাগজে এ খবর ছাপতে কলকাতার সাংবাদিকরা এতটুকু কার্পণ্য করলেন না।

পণ্ডিত জওহরলাল কলকাতার রাজভবনে এলে কি কি খেতেন এখন তার ইতিবৃত্ত দিচ্ছি।

জওহরলাল যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন মাঝে মাঝেই দেশের নানা কাজে তাঁকে কলকাতায় আসতে হতো।

উঠতেন নিশ্চয়ই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কলকাতার এই সুন্দর বিশ্বখ্যাত সৌন্দর্যময় এই রাজভবনে। সঙ্গে সব সময় থাকতো, তাঁর বাবার আমলের অর্থাৎ মতিলাল নেহেরুর সময়ের তাঁদের পরিবারের প্রিয় পরিচারক হরি অথবা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা। কিন্তু হরিই জওহরলালের অলিখিত সর্বময় কর্তা বা খাওয়া-দাওয়ার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য ছিল।

কলকাতা রাজভবনের সাধারণ চলতি নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকেই অতিথিরা কি খাবেন বা না খাবেন তা প্রাতঃকালেই মেনু চার্ট-এ জানিয়ে দিতে হয়। এটাই সর্বকালের নিয়মবিধি। কিন্তু নেহেরুজীর বেলায় তা সাধারণতঃ করা হত না। হরিই রাজভবনের সুবিশাল প্যানট্রিখানায় এসে মিঃ এ মুখার্জী, যিনি রাজভবনের পাকশালার সর্বময় কর্তা, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী কি কি খাবেন তা বলে যেতেন।

এই বৃদ্ধ হরি চাকরকে রাজভবনের লোকেরা যত না সম্মান করতো তার চেয়ে বেশী করতো ভয়। কারণ এই বৃদ্ধ পরিচারক হরিই জওহরলালের সর্বময় কর্তা ছিলেন তাঁর দেখাশোনার, বাইরে যাবার ও ওঠাবসার। যাকে ইংরেজীতে বলে 'এ্যাফেক্সনেট অলটাইম গারজেন অ্যান্ড গাইড।'

হরির বদলে মাঝে মাঝে শ্রীমতী ইন্দিরাও বাবার সঙ্গে কলকাতার রাজভবনে আসতেন। কলকাতার রাজভবনে সবচেয়ে দামী ও সম্মানিত প্রিন্স অব ওয়েলস্ সুইটে জওহরলাল উঠতেন।

আগেই বলেছি তিনি প্রত্যহ ভোর ৫টা থেকে ৫-৩০ টায় ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে লেবু দিয়ে এক কাপ চা খেতেন।

এরপর শোবার ঘরে ১৫ মিনিট কৌপিন বা জাঙ্গিয়া পরে শ্রীনেহেরু মেঝেতে

যোগাসন করতেন। শীর্ষাসন তাঁর প্রাত্যহিক ব্যায়াম ছিল। পরে পাঁচ সাত মিনিট ঘরেই চলাফেরা। তারপর স্নান করতে এ্যাটাচ্ড বাথরুমে ঢুকতেন। স্নানের শেষে ধোয়া কাপড় পরে নির্জনে একটু গীতা পাঠ করতেন।

৭-৩০টা নাগাদ প্রাতঃরাশে বসতেন। একখানা মাখন মাখানো রুটি তার ওপর পাতলা মধু মাখিয়ে টেবিলে দেওয়া হতো।

তারপর দেওয়া হতো দুটো মাখন খণ্ড ও দুটি মুরগীর সেদ্ধ ডিম। তিনি চামচ দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতেন।

এরপর দেওয়া হতো এক গ্লাস "পাইপিং হট" বা অতি উগ্র গরম কফি। এমন গরম কফি যে অনবরত ধোঁয়া পেয়ালা থেকে বেরুতে থাকবে। এই কফির ভাপে একটু ইতর বিশেষ হলেই তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়তো। অনেক সময় তিনি কাপ ডিস ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিতেন। তখন নির্ভয়দাতারূপে দেখা দিত ভৃত্য হরি। আবার সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু এই যে একবার নেহেরুজীর মেজাজ বিগড়ালে তার দাপট সমস্ত দিন থাকতো, দাপটের একটু উত্তাপও হয়তো লাগতো বিকালে বা সন্ধ্যায় রাজভবনে আহূত প্রেস কনফারেন্সের গোল টেবিলে।

বেলা ১টা বা ১-৩০ মিনিটে নেহেরু মধ্যাহ্ন ভোজে বসতেন।

পছন্দ করতেন ইংরেজী খানা। প্রথমে তাঁকে দেওয়া হতো এক প্লেট স্যুপ। তারপর দু' চারখানা মাছের ফ্রাই। ভেট্‌কী মাছের টুকরো লেবুর রসে ডিমে ভিজিয়ে সামান্য নুন দিয়ে ভেজে দিতে হতো। ফ্রাই-এ পোড়া দাগ তিনি পছন্দ করতেন না।

তারপর যে প্রধান ডিসটি তাঁকে খেতে দেওয়া হতো সেটা হচ্ছে 'চিকেন রয়াল'।

এই একটি খানা বানাতেই তখনকার দিনে রোজ খরচ পড়তো ত্রিশ চল্লিশ টাকা। দুটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী জবাই করা হতো। মেসিনে একটি মুরগীকে কেটে কিমা করে মাখন ও যাবতীয় নুন মশলা দিয়ে ফ্রাই প্যানে ভাজা হতো। তারপর ভাজা কিমাটা সামান্য গরম জলে ডুবিয়ে দেখে নেওয়া হতো ঠিক ভাজা হয়েছে কিনা। ভাজা কিমাটা জলে ভাসছে কিনা। ভাসলে ঐ ভাজা কিমাটা অন্য আরেকটি ছাড়ানো মুরগীর পেছন দিয়ে পেটের ভেতরে পুরে দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হতো, পরে মাখন দিয়ে মুরগীটিকে ফ্রাই প্যানে ভাজতে হতো। যখন অস্ত মুরগীটির লোমকূপ দিয়ে মাখন গড়িয়ে পড়তো তখন আস্ত মুরগীটিকে গরম গরম নেহেরুজী প্লেটে পরিবেশন করা হতো। নেহেরুজী কাঁটা চামচ দিয়ে বেশ তৃপ্তি করে সেই 'চিকেন রয়াল' খেতেন।

রাত্রের ডিনারে প্রায় একই রকম ইংলিশ খানা থাকতো। আর বিকেলে 'টী'তে থাকতো কফি, সন্দেশ, কলা, আপেল, আঙ্গুর, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবার রাজভবনে জওহরলালের অবস্থিতির সময়ে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছোট্ট মজার ঘটনার বর্ণনা করছি।

সালটা হবে বোধ হয় উনিশশো একান্ন বা বাহান্ন সাল। তখন রাজভবনের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বিলাত ফেরত মিঃ পি সি রায়।

অতি শৌখিন চৌখশ লোক। লোকের ঠিক পছন্দ অপছন্দ মেজাজ মর্জি বুঝবার তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন জওহরলাল তো ইংলণ্ডের কেমব্রিজ হ্যারোর ছাত্র। সুতরাং সেখানে নিশ্চয়ই তিনি মাঝে মধ্যে বয়সকালে রোয়িং করেছেন। সুতরাং রাজভবনের মধ্যেকার পুকুরে একটা ছোট্ট বোট রেখে দিলে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর ভাল লাগবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা সাদা ছোট্ট বোট চারটে দাঁড় লাগিয়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

প্রায় মাস খানেক পরে জওহরলাল রাজভবনে এসে রাজভবনের তিনতলার ওপর থেকে ছায়া সুনিবিড় টলটলে জলে ঘেরা পুষ্করিণীটির মধ্যে শ্বেত শুভ্র ছোট্ট বোটটি দেখে কী আনন্দিত, উল্লসিত। প্রায় ছুটতে ছুটতে তিনি বোটে গিয়ে চড়ে বসলেন সিকিউরিটির সমস্ত অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং বেশ কিছুক্ষণ রোয়িং করলেন এধার ওধার। পরে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি সি রায়কে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন।

আর একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা।

উনিশশো বাষট্টি সাল। মাসটা যতদূর মনে পড়ে নভেম্বর। জওহরলাল কলকাতায় এসেছেন। রাজভবনের সবাই ব্যস্ত। তিনি বিকেলের একটা অনুষ্ঠানে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স না কোথায় যেন গিয়েছেন, তাঁর ফিরতে ফিরতে রাজভবনে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাজভবনের গ্র্যান্ড স্টেয়ার, মারবেল হল, নর্থ বল রুম, মেন গেট, অলিন্দে অলিন্দে বড় বড় ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর সম্মানে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল গাড়ীর মিছিল করে রাজভবনে ফিরে এলেন। তিনি গাড়ী থেকে নেমে মারবেল হলে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—সব বাতি বুতা দেও। এতনা রোশনি কিউ জ্বালায়া। সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনের কিছু কিছু বাড়তি ইলেকট্রিক বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো। তখনও জওহরলালের লাল মুখ রাগে থমথমে।

সকলেই জানেন পণ্ডিতজী যখন ঘোরাফেরা করতেন তখন তাঁর হাতে ছোট্ট ম্যাজিক ওয়াণ্ড-এর মতো একটা পালিশ করা কাঠের ব্যাটম থাকতো। সেই 'ম্যাজিক ওয়াণ্ড' সম্বন্ধে দেশে কতো রকম কতো গল্প প্রচলিত ছিল।

কেউ বলতেন প্রধানমন্ত্রীর ওটাই শক্তির উৎস, কেউ বা বলতেন ওটা সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূতঃ জিনিস ইত্যাদি, ইত্যাদি। জওহরলাল কোনো মিটিঙে বা বাইরে গেলে ওটা তাঁর হাতে দেখা যেতোই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল এতো ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে রাজভবনে এলে হন্তদন্ত হয়ে ওটার খোঁজে প্রিয় ভৃত্য হরিকে প্রিন্স অব ওয়েলসের বিছানা-পত্তর উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে হতো। ওটা কোথায় উনি লুকিয়ে রেখেছেন বা ভুলে রেখে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দার্জিলিং-এর রাজভবনে উঠলে তিনি যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন।

দেবাত্মা হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তিনি সুদূরের যেন কোন ভাব রাজ্যে চলে যেতেন। পাহাড় যেন তার নিজের বংশের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। তাঁদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীরের লোক। সুতরাং শ্রীমতী ইন্দিরা, জওহরলাল, মতিলাল নেহেরু এঁদের কাছে পাহাড়ের টান অতি আপনজনের মতো।

শ্রীমতী ইন্দিরাও পিতার মতো বার বার পাহাড়ের হাতছানিতে হিমালয়ের কোলে এসে বিশ্রাম করতেন। তিনি অনেকবার দার্জিলিং-এর রাজভবনে এসেছেন, বাপের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে ও পরলোকগত নেহেরুজীর মৃত্যুর পরেও নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে কেবলমাত্র অন্যান্য কাজ ছাড়াও এই হিমালয়ের অসীম গাম্ভীর্যের নিঃশব্দ স্তব্ধতার সৌন্দর্যে।

জওহরলাল দার্জিলিং রাজভবনে এলে কলকাতা রাজভবনের মতো দার্জিলিং রাজভবনও উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠতো।

কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ইউরোপীয় 'প্ল্যানটার্স' ক্লাবের সাহেবেরা, কখনও দার্জিলিং-এর গুর্খা লীগের কর্মীবৃন্দ, কখনও বা কংগ্রেসের হোমরা-চোমরারা।

জওহরলাল কিন্তু সমতলের সদা ব্যস্ত জওহরলালের রূপ বদলিয়ে পাহাড়ের শান্তশীল মাধুর্যময় জওহরলাল রূপে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। কখনও দার্জিলিং রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে কলকাতা রাজভবনের মতো অল্পেই অসন্তুষ্ট বা অধৈর্য হতে দেখি নি।

তিনি প্রায়ই দার্জিলিং রাজভবনে সযত্নে রক্ষিত বৃটিশ আমলের সুদীর্ঘ টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে সুদূর হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। জওহরলালজী মানুষ হিসেবে ভাবুক ও সাহিত্যিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন রচনা ও পুস্তকের মধ্যে ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জওহরলালজীর যে শেষ উইল তিনি লিখে গেছেন তার ভাষা ও ভাব অতি উঁচুদরের কাব্যিক সাহিত্য— আমার চিতাভস্ম হিমালয়ের সুদূর গুহা গহ্বর, হিমশীতল তার কন্দরে কন্দরে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হয় ইত্যাদি। সত্যিই জওহরলালজী দেবাত্মা হিমালয়কে নিজের আত্মজ-এর মতো ভালবাসতেন। এখনও দার্জিলিং রাজভবনের অনেক বৃদ্ধ বেয়ারা, বাবুর্চি, খানসামা, ফুলের মালি এই পর্বত প্রেমিক ভারত পথিকের কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্মরণ করে।

কলকাতার রাজভবনে পণ্ডিতজীর কথা লিখতে বসলেই আর একজন বাংলার সজীব পুরুষ নয়া বাংলার রূপকারের কথা স্বতঃই মনে ভেসে ওঠে। তিনি হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। জওহরলালের সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সৌহার্দ্য প্রবাদ পর্যায়ের।

যখনই পণ্ডিতজী কলকাতার রাজভবনে আসতেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেও নানা কাজে দেখা-সাক্ষতের সৌহার্দ্যে রাজভবনে এসে জওহরের সঙ্গে মিলিত হতেন। এমনও হয়েছে ডাঃ রায় সামান্য অসুস্থ হওয়ায় স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল ডাঃ রায়ের ১নং ওয়েলিংন স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে ডাঃ রায়কে দেখে এসেছেন।

পশ্চিমবাংলার অনেকের এমন ধারণাও মনে মনে গেঁথে গেছে যে স্বয়ং জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী থাকার জন্যই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিমবাংলার জন্য এতটা কাজ করতে পেরেছিলেন। ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে পশ্চিমবাংলার জন্য যে কোনো উদ্যোগের কথা বললেই তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি দিতেন এবং কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দ করবার ব্যবস্থা করতেন।

এমনও শোনা যায় ও তা বেশ বিশ্বস্তসূত্রে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটলে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দিল্লীতে এতটা মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়েন যে তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় বিধানচন্দ্রের মরদেহের পাশে হাজির হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিধান রায়ের মৃত্যুর সংবাদে তাঁর বাড়ীর সম্মুখে ও অতঃপর মরদেহ বিধানসভা ভবনে স্থানান্তরিত হবার পর জনসমুদ্রের চাপে ও প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার প্রশ্নে শেষ-মেশ জওহরলালের কলকাতা আসা স্থগিত থাকে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সুদূরপ্রসারী ছিল এবং তাঁকে বিশ্বের সকল বড় বড় নেতাই শ্রদ্ধা বা সম্মান করতো, কিন্তু এর মধ্যে কতোটা যে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা কতোটা যে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তা নিয়ে বিশ্বের অন্য দেশের কথা না জানা থাকলেও স্বয়ং নিজের দেশ ভারতবর্ষে মতভেদ আছে।

তাই দেখা যায় পাঁচের দশকে ঐতিহাসিক বান্দুং কনফারেন্স সেরে যখন জওহরলাল, মিশরের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল নাসের, প্রেসিডেন্ট টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট শাস্ত্রমিৎ জো জো ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতার রাজভবনে অতিথি হয়ে উঠলেন এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই এই বান্দুং কনফারেন্সের অন্যতম হোতা চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই রাজভবনে ভারতের সম্মানীয় অতিথি হয়ে এলেন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে একই বৈঠকে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নাচ এই রাজভবনে দেখতে দেখতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্টেজে উঠে নৃত্য করবার ফাঁকেও তালে তালে লাদাক ও হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শীর্ষে তিব্বতের বর্ডারে নয়া সড়ক বানিয়ে চলেছেন, কিন্তু ভাববাদী জওহরলাল এতটুকুও তার টের বা আঁচ করতে পারেন নি। এখানেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হিসেবে জওহরলালের চরিত্রের অসম্পূর্ণতা।

শেষ করবার পূর্বে পণ্ডিতজীর শুভ্র কোমল হৃদয়ের দু' একটা ছবি যা রাজভবনে দেখেছি তার বর্ণনা করে এই রচনা শেষ করছি।

একবার শ্রীমতী পদ্মজার আমলে রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের কাছ থেকে একটা সুন্দর অথচ বেশ বড় লাইফ সাইজের ফটো এলো। সেটা স্বয়ং জওহরলালের ফটো। ফটোতে জওহরলাল নিজে কালো কালি দিয়ে লিখেছেন—
—"Presented to Baby"—Jawaharlal Nehru.

সেদিনই আমরা রাজভবনের কর্মচারীরা প্রথমে জানতে পারি বেবী শ্রীমতী পদ্মজার আর একটি সুন্দর নাম।

সব শেষে বলে ফেলি পণ্ডিতজী যে ছোট্ট শিশুদের কী রকম ভালবাসতেন—তাদের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করতেন—নাতি রাজীব, সঞ্জয়কে পিঠে চড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতেন তার হদিশ বহুবার এই কলকাতার রাজভবনে মিলেছে।

সত্যি "চাচা নেহেরু" কলকাতার রাজভবনের কর্মচারীদের ছোট্ট ছেলে মেয়েদের কাছে প্রিয় "চাচা নেহেরু"ই ছিল। তারা সদলবলে বিকালে রাজভবনের মাঠে হৈ চৈ-করে খেলা করছে আর সদা ব্যস্ত নেহেরুজী সতৃষ্ণ নয়নে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে দেখছেন। কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে তখন তিনি সবিশেষ বিরক্ত বোধ করতেন।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমন ও কলকাতার রাজভবন

আঠারই জানুয়ারী, উনিশশো বাহাত্তর। কলকাতার সব কাগজে খবর বেরুল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছয়ই ফেব্রুয়ারী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে কলকাতায় অভ্যর্থনা জানাবেন। এদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা থেকে কলকাতায় আসছেন। উঠবেন কলকাতার রাজভবনে।

রাজভবনে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের পশ্চিমবঙ্গে আসবার প্রায় দিন কুড়ি পঁচিশ পূর্বে থেকেই। বঙ্গবন্ধু কলকাতায় এলেন ছয়ই ফেব্রুয়ারী উনিশশো বাহাত্তর সালের রবিবার সকাল ১০-১৫ মিনিটে।

তিনি ঢাকা থেকে ভারতীয় বিমান বহরের বিশেষ বিমানে এলেন কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে। সেখান থেকে হেলিকপটারে চলে এলেন সোজা ময়দানের বেষ্টনী ঘেরা হেলিপ্যাডে। সঙ্গে দমদম বিমান বন্দর থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথী হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বহু পূর্বেই দিল্লী থেকে সোজা দমদমে এসে নেমেছিলেন।

কলকাতার রাজভবনে চিরদিনের অতিথি অভ্যর্থনার দরজা মেন নর্থ গেট এবার উপেক্ষিত হলো। এবার রাজভবনের দক্ষিণ দিকের সাউথ গেট ভি. আই. পির সম্মান পেলো। এবার রাজভবনের দিককার সাউথ গেট অভ্যর্থনা জানালো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সদ্য স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে।

তাঁরা হেলিকপটারে কলকাতার ময়দানে মোহনবাগান মাঠে নেমে উভয় দেশের জাতীয় পতাকা শোভিত আশমানি নীল রং-এর গাড়ীতে করে একত্র ভাবে এসে নামলেন রাজভবনের দক্ষিণ গেটের সম্মুখে অবস্থিত নেতাজী সুভাষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্তির পাদদেশে। তখন এগারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকী ছিল। আকাশে ঢাকা কালো মেঘ সরে সরে গিয়ে হঠাৎ রোদের হাসি ময়দানের সবুজ বুকে ছড়িয়ে পড়লো। নত মস্তকে শ্রীমতী ইন্দিরা ও মুজিবর রহমান উভয়েই পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন ভারতের এই দুই মহান নেতার পাদদেশে।

মুজিব যখন নেতাজী সুভাষের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য দিচ্ছিলেন তখন তাঁকে কিছুটা উন্মনা ও ভাবাপন্ন বলে মনে হলো। গুরুর সঙ্গে ছাত্রের বহুদিনের পর মিলনে মুখে যেমন মধুর ভাব জেগে ওঠে অনেকটা সেরূপ। চোখে জল নেই, অন্তরে ক্রন্দন, কিন্তু মুখে আবার মিলনের স্বর্গীয় হাসি।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ও মুজিবর কড়া পুলিশী পাহারায় রাজভবনের দক্ষিণ গেট

দিয়ে রাস্তায় হাজার হাজার অপেক্ষমান জনতাকে প্রত্যাভিবাদন করতে করতে এসে ঢুকলেন রাজভবনের ঐতিহাসিক মারবেল হলে। তখনো রাজভবনের বাইরে হাজার হাজার লোকের আকাশবিদারী দুই দেশের জয়ধ্বনি সমানে চলেছে।…"ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। শেখ মুজিব জিন্দাবাদ"। উভয়েই অভিভূত এই দৃশ্যে। রাজভবনের প্রায় দ্বিশতবর্ষের বহু বিচিত্র ইতিহাস আবার নয়া সুরে আরম্ভ হলো।

রাজভবনে এসেই দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দুই দেশ সম্বন্ধে ঘন ঘন আলোচনা বা বৈঠক আরম্ভ হলো। সে আলোচনা কখনও নিভৃতে, কখনও রুদ্ধদ্বারে বা কখনও সপারিষদ সমাহারে। কলকাতার রাজভবন তখন রথী-মহারথীদের সমাগমে গম গম করছে। প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইট, ডাফরিন স্যুইট, অ্যানডারসন স্যুইট, ওয়েলেসলী স্যুইট তখন রাজকীয় অতিথিবৃন্দের কলগুঞ্জনে মুখরিত।

রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণের দোতলায় প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর।

গত পনেরো দিন ধরে এই স্যুইটকে ঝেড়ে-মুছে সাজানো হয়েছে। হয়েছে দামী প্লাস্টিক পেন্ট করা, নূতন বাতি লাগানো হয়েছে, নতুন নতুন দামী পর্দা দেওয়া হয়েছে। নতুন রং-এর উগ্র গন্ধ মুছে ফেলবার জন্য দামী সেন্টের স্প্রে করা হয়েছে।

এর ঠিক ওপর তলার স্যুইটে আছেন বঙ্গবন্ধু মুজিব। সেখানেও একই ব্যবস্থা। রাজভবনের অন্যান্য কামরায় ভি. আই. পি. ঠাসা।

রাজভবনের উত্তর ও দক্ষিণের প্রধান ফটকে জমকালো আকর্ষণীয় পোশাক পরিহিত ঘোড়সওয়ার নীল পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুজিবর রহমান যে স্যুইটে রয়েছেন তারই ছাদের ওপর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পত পত করে উড়ছে। রাজভবনের গম্বুজের মাথায় উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিজের স্বতন্ত্র পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা এক হয়ে যাবার পর এখন আর পূর্বেকার মতো প্রধানমন্ত্রী যে রাজভবনে প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে রয়েছেন তার বিরাট জানলা দিয়ে সেই চিরাচরিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পূর্বেকার মতো নীল রং-এর নিজস্ব পতাকা উড্ডীন দেখা গেলো না।

দেখা গেল রাজভবনের চারদিকে অর্থাৎ বারান্দায়, করিডোরে, মাঠে, বাগানে, ফাঁকে ফাঁকে সর্বত্র মিলিটারী সি. আর. পি., সি. আই. ডি. কলকাতা পুলিশের ছড়াছড়ি।

শোনা গেল শ্রীমতী গান্ধী নাকি বাংলার রাজ্যপাল ডায়াস সাহেবকে কড়া হুকুম দিয়েছেন সিকিউরিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার করতে। কারণ এই পশ্চিম বাংলার একটা কাগজে দিন কয়েক পূর্বেই নাকি সংবাদ বেরিয়েছে যে শেখ মুজিবকে কলকাতার হত্যার অপচেষ্টা হতে পারে।

মুজিবর রহমানকে রাজভবনের বাইরে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া

বারণ হয়ে গেছে। এমন কি আমাদের রাজ্যপালের খাশ অফিসের কর্মচারীদেরও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অফিস থেকে। রাজভবনে খালি সিকিউরিটি। খালি কড়া জোরদার পুলিশী ব্যবস্থা।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক সম্মিলিত বক্তৃতা হলো এদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিকেল ৩-১৫ মিঃ থেকে। সে দিনটা ছিল ছয়ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার উনিশশো বাহাত্তর সাল। এখানে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষের সামনে এর পূর্বে আর একবার পঞ্চাশের দশকে ভারত ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীদ্বয় অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল ও শ্রীবুলগেনিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজভবনের ইতিহাসের সঙ্গে এই সব বক্তৃতার কোন সম্বন্ধ নেই বলেই এখানে তার হুবহু পুনরুল্লেখ অপ্রাসংগিক।

যাই হোক, মুজিবর রহমনের সম্মানের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা সেরেই আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান কলকাতার রাজভবনে ফিরে এলেন ও দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গোপন আলোচনায় বতী হলেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধী সোমবার রাজধানী দিল্লীতে ফিরে যাবেন এবং তারই মধ্যে এই দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইস্তাহার সই করতে হবে।

এখন বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে মুজিবর রহমনকে সম্মান দেখাবার জন্য এই যে বিরাট জনসভা হলো তাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা গেল বাংলা ঘরের মায়ের পোশাকে অর্থাৎ সাদাসিধেভাবে বাংলাদেশের সুগৃহিনীর পোশাকে। লাল রঙের কস্তা-পেড়ে গরদের শাড়ী বাংলার কুলবধূর মতো করে পরেছেন। মাথায় রয়েছে সুন্দর ভাবে অবগুণ্ঠন। সেই বিরাট সভার সবাই তাঁকে সর্বপ্রথম এই মাতৃমূর্তিতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়লো। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর সম্মান সভায় পুরোপুরি বাংলা মায়ের পোশাক। সকলেই অতি আনন্দিত। সভার শেষে সাংবাদিকদের কুণ্ঠিত প্রশ্নের সামনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—খাঁটি বাঙালীর গৃহবধূর পোশাকে তাঁকে কেমন লাগলো। উত্তর সকলের—চমৎকার।

এখন শ্রীমতী ইন্দিরাকে নিজস্ব বাংলার এই ঐতিহ্যময় শাড়ী কে পরালো তার একটু আলোচনা করা যাক। রাজভবনের অন্দর মহলের ইতিহাসে এর স্থান আছে।

শ্রীমতী পদ্মজা কলকাতার রাজভবনে বহুদিন বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে ছিলেন। তিনি তাই জানতেন রাজভবনের কোন কর্মচারীর বউ কি কি গুণের অধিকারিণী। —কে ভাল রাঁধতে পারে—কে ভাল পরিবেশন করতে পারে—কে পারে ভাল রুচি-সম্মত ড্রেস করতে। আবার কে পারে ভাল ইংরাজিতে কথা বলতে—কেউ বা পারে নানা রকম ফুলের পরিচর্যা করতে ইত্যাদি। সবই পদ্মজার নখাগ্রে। কারণ তিনি এই রাজভবনে কাটিয়ে গেছেন দীর্ঘ প্রায় এগারো বছর।

তাই যখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মুজিবর রহমনের সম্মান সভায় বাঙালী গৃহবধূর মতো কাপড় পরতে তখন শ্রীমতী পদ্মজা ডেকে পাঠালেন মিসেস বসুকে।

ইনি রাজভবনের মধ্যে বেশ সপ্রতিভ, ওয়েল ড্রেসড এবং সুরুচিসম্পন্না মহিলা। মিসেস বোস এই জরুরী তলব পেয়েই ছুটলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কাপড় পরাতে রাজভবনের সবচেয়ে দামী সুইট প্রিন্স অব ওয়েলস সুইটে।

মানুষের ভাগ্যে জগতে অনেক রকমের সুযোগ-সুবিধে আসে। কিন্তু সামান্য ভদ্রমহিলার ভাগ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কাপড় পরানো সেটা সত্যিই বিরল এবং তা রাজভবনের অন্যান্য মহিলাদের কাছে ঈর্ষার বস্তু।

বলা বাহুল্য এই খবরটা যখন রাজভবনের সব কর্মচারীদের জানা হয়ে গেলো তখন ছোট থেকে বড় সমস্ত রাজভবনের কর্মচারী গিন্নীরাই নিজ নিজ স্বামীদের অকর্মণ্যতার নোটিশ জাহির করতে লাগলেন। কারও কারও মন্তব্য হলো উঁচু পোস্ট-এর হয়েও কেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে এ হেন সম্মান থেকে বঞ্চিত করলেন তার কৈফিয়ৎ সকল স্বামী বেচারাদের ভয়ে ভয়ে রোজ রোজ ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝিয়ে বলতে হতে লাগলো।

কোন কোন উঁচু পজিসনের রাজভবনের অফিসারেরা কেউ ভুল করে তাদের সব সুন্দরী স্ত্রীদের বুঝাতেই পারলেন না যে এটা ইন্দিরার নির্দেশে শ্রীমতী পদ্মজা করেছেন—তাঁরা এটা পূর্বে কিছুতে জানতে পারেননি। তা হলে তারা সত্যিই এ সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখতেন।

এদিকে মিসেস কমলা বোসের অবস্থা তো চরমে। সকলের এক সঙ্গে হিংসার দাবানল।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমনের সম্মানে পশ্চিম বাংলার রাজভবনে যে ভোজসভা বা রাত্রের ডিনার দেওয়া হয়েছিল তার সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেছিলেন এবং যে একশ ছত্রিশ জন কলকাতার সম্মানীয় অতিথিকে এই ভোজসভায় ডাকা হয়েছিল তার নিমন্ত্রণপত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামে ছাপা হয়েছিল। যেটা সাধারণতঃ কখনও ছাপা হয় না।

ভারত স্বাধীন হবার পরে এটাই বুঝি একমাত্র নজির যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনো বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানকে দিল্লীর বাইরে নিজের দপ্তরের খরচে আপ্যায়িত করেছেন বা ভোজসভা দিচ্ছেন।

এই ভোজসভা বসেছিল পাঁচই ফেব্রুয়ারী উনিশশো বাহাত্তর সালের রাত্রি ৮টায় কলকাতার রাজভবনের বিখ্যাত ব্যানকোয়েট হলে।

অতিথিদের খাবার টেবিল সাজানো হয়েছিল 'ইউ' সেপড্ কায়দায়। রাজভবনের ইতিহাসে এই একটিবার মাত্রই রাত্রের ভোজসভা হয়েছিল যখন এর বিশালত্ব দেখে এবং এর সুঠাম সুষ্ঠু কায়দার জন্য রাজভবনের ব্যানকোয়েট হলের বিশাল বিশাল দরজা খুলে ফেলতে হলো। কারণ এতগুলি অতিথিকে একসঙ্গে

ব্যানকোয়েট হলে রাজভবনের ইতিহাসে এ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করে টেবিল পেতে খেতে দেওয়া হয় নি।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখাজীর সময়ে এসেছেন পশ্চিম বাংলা সফর করতে বুলগেনিন, ক্রুশ্চেফ, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সময় এসেছেন বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ কিন্তু তখনও রাজভবনের খানা কামরা ব্যানকোয়েট হলের দরজা সাময়িক ভাবে খুলে ফেলতে হয়নি।

কিন্তু এবার বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমনের কথাই আলাদা। তিনি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে সেটার সমস্ত খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

নিমন্ত্রণ পত্রে যাঁর নাম লেখা হয়েছে তিনি হলেন ভারতের মহান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, বিশাল ব্যাপার। মহৎ উদ্দেশ্য।

এই "ইউ" সেপড্ টেবিলের দু ধারে বসেছিলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী অজয়কুমার মুখাজী, মিসেস জ্যোতি বসু, প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী, ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ রমা চৌধুরী, অশোক সরকার, কে পি এস মেনন, শম্ভু মিত্র, মিঃ এ শের্ভোনিন, মিঃ বেরোভিচ, আবদুস সাত্তার, মিসেস ও লেফটানেণ্ট এস অরোরা, এস এফ কানোরিয়া, জ্যোতি বসু, সমর গুহ, মিঃ ও মিসেস জ্যোতির্ময় বসু, প্রফেসার সুনীতি চ্যাটার্জী, বিচারপতি এস. এ মাসুদ, শেখ জামালউদ্দিন, ডি পি. চট্টোপাধ্যায়, শেখ কামালউদ্দিন প্রভৃতি।

আর 'ইউ' এর মাথায় বসেছিলেন যথারীতি এই ভোজসভার হোস্টরা অর্থাৎ মধ্যিখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর ডান পাশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, বাঁ পাশে রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াস, তার পাশে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও সর্ব ভারতীয় ইণ্ডিয়ান রেড ক্রসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, তাঁর পাশে মিসেস সিদ্ধার্থ শংকর রায়, এবং সর্ব বামে সেণ্ট্রালের হোমের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সি. পন্থ।

আর মুজিবর রহমনের ডান পাশে মিসেস এ. এল. ডায়াস, তার পাশে এ. এস. আজাদ, এবং সর্ব ডানে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়।

এই ঐতিহাসিক ভোজসভা যখন চলছিল তখন যথারীতি ব্যানকোয়েট হলের পূর্ব দিকের বারান্দায় মিলিটারী ব্যাণ্ডে বাজছিল মৃদুসুরে পর্যায় ক্রমে ঃ—

(১) আনন্দ লোকে, মঙ্গলালোকে।
(২) ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।
(৩) বাংলার মাটি, বাংলার জল।
(৪) সংকোচেরও বিহ্বলতা।
(৫) হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর।
(৬) যে রাতে মোর দুয়ারগুলি।
(৭) ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু।

(৮) দুর্গমগিরি কান্তার মরু।
(৯) আমাদেরই ধূলার ধরণীতে।
(১০) এক সূত্রে বাঁধা আছি, প্রভৃতি।

এখন কী কী খাবার অতিথিদের খেতে দেওয়া হয়েছিল তার মেনু চার্ট দেওয়া হল ঃ—

আমিষ—	নিরামিষ—
প্রন্ ককটেল	গ্রেপ ফ্রুট্ ককটেল।
ক্রীম অব আমণ্ড স্যুপ	ক্রীম অব আমণ্ড স্যুপ।
স্পাইড টোমাটো ভেটকী	ম্যাকারণী গ্রেটীন।
চিকেন বিরিয়ানী—নান	পিলাউ ন্যান।
রোগান জুস্ রায়তা	স্টাফড ক্যাপসীকাম রায়তা।
গ্রীলড্ মটন টিক্কা।	আলুর দম - মটর পনীর।
মটর পনীর স্যালাড।	স্যালাড আচার চাটনী।
আচার চাটনী।	রসমালাই।
রসমালাই।	নতুন গুড়ের সন্দেশ।
নতুন গুড়ের সন্দেশ।	ফ্রুট স্যালাড্ এণ্ড ক্রীম।
ফ্রুট স্যালাড এণ্ড ক্রীম।	ফ্রেশ ফ্রুট।
ফ্রেশ্ ফ্রুট।	কফি।
কফি।	পান।
পান।	

টেবিলের প্রত্যেক আসনের সঙ্গে সঙ্গে খাবারের মেনু চার্ট-এ সব নিমন্ত্রিত অতিথিদের নামওয়ালা তালিকা, খাদ্যটি আমিষ কী নিরামিষ, নিজের সিটের নাম ও অতিরিক্ত আর একটি স্লিপ যুক্ত ছিল। তাতে নির্দেশ ছিল অতিথিদের প্রতি—After the Banquet guests may kindly proceed to the Marco Room. (শ্রীমতী পদ্মজার মৃত প্রিয় কুকুরের নামে নামাঙ্কিত স্যুইটে যেটা নাকি বৃটিশ আমলের বল্ ড্রইং রুম ছিল) Where Kabiguru's "Chitrangada" will be staged.

এখানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান, পদ্মজা নাইডু, রাজ্যপাল ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে ছোট এই রাজভবনের স্যুইটে ঠাসাঠাসি করে কবিগুরুর চিত্রাংগদা অভিনয় দেখলেন।

সব শেষ হয়ে গেলে রাত্রি প্রায় এগারটায় রাজভবন থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিরা সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

———

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী ও কলকাতার রাজভবন

হরেন্দ্রকুমার যখন বাংলার লাট ছিলেন অর্থাৎ ১লা নভেম্বর উনিশশো একান্ন সাল থেকে মৃত্যুদিন ৮ই অগস্ট উনিশশো ছাপান্ন সাল পর্যন্ত—তখন বেশ কাছ থেকে তাঁকে নানাভাবে দেখবার আমার অপার সুযোগ হয়েছিল। সুযোগ হয়েছিল এ জন্য যে তখন আমি রাজভবনের কর্মচারী। সুতরাং সকালে সন্ধ্যায় রাত্রে বিকেলে প্রায় দিন রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাঝে মাঝেই রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমারকে দূরে বা কাছ থেকে দেখেছি।

সে সময় বাংলার লাট হরেন্দ্রকুমারকে দেখতাম আর মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম—কী সাদাসিধে অমায়িক মানুষ। কী বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। কী সৌম্য শান্ত মুখচ্ছবি।

আর যেটা সব চেয়ে দেখবার জিনিস কী সুন্দর স্নেহপ্রবণ সরল ব্যবহার তাঁর।

আজকাল দেখেছি মানুষ সামান্যতম পোজিশনে বড় হলেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে কম কথা বলে, চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে নকল গাম্ভীর্য এনে, চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা নকল কটাক্ষ করে নিজেদের পারসোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব অহরহ প্রকাশ করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়; কিন্তু সে সব তথাকথিত শিক্ষিত মূর্খেরা নিমেষমাত্রও ভেবে দেখে না আসল পারসোনালিটি বলতে কী বোঝায়। হরেন্দ্রকুমার তারই প্রতিভূ ছিলেন।

পারসোনালিটি তাকেই বলে যা নিজের আবাল্য ব্যক্তিত্বতাকেই কোনো রকম কৃত্রিমতার কপট গাম্ভীর্যে না ঢেকে প্রকাশ করা। যে চিরকাল দিলখোলা লোক, যার নিজের সত্তা বলতেই মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে বুক ভরা ভালবাসা দেওয়া সে ব্যক্তি হঠাৎ ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কিছু বড় পোস্ট পেলেই রাতারাতি নিজের স্বভাব বদলিয়ে মুখটা নকল গাম্ভীর্যে রাম গরুড়ের ছানার মতো হাঁড়ি মুখ করে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে প্রকাশিত হবে—এটা নিশ্চয়ই তার পারসোনালিটির সপ্রশংস পরিচায়ক নয়।

বিদেশী সার্থকনামা পারসোনালিটিওয়ালা মানুষ ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট। যিনি নাকি তাঁর কাজের দপ্তর হোয়াইট হাউসে যখন মাঝে মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিজের দপ্তরে যেতেন তখন নীচ থেকে ওপর তলার সমস্ত বেয়ারা চাপরাশীকেই নাম ধরে উইশ করতে করতে উঠতেন। এতে তার নিজের পদমর্যাদার কোন রকম হেরফের হোতো না।

শোনা যায় স্যার উনস্টন চার্চিল লণ্ডনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী আবাস ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়ীর চাকর-বেয়ারাদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই হাসি-মস্করা করতেন।

এতে তাঁর পক্ষে সেদিনের সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রিত্ব চালাতে কোন বেগ পেতে হয়নি। এটাই ছিল তাঁর নিজস্ব পারসোনালিটি।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তালতলার চটি পরেই বাংলার লাটের সঙ্গে দেখা করতেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাড়ীতে আদুল গায়ে তেল মাখতে মাখতেই আগত বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হাসি মুখে পূর্ব নির্দিষ্ট সাক্ষাৎপ্রার্থী অতিথিদের পরিচর্যা করেছেন নিজের বুকে কান্নার সমুদ্রকে ঢেকে রেখে পূর্ব রাতের তাঁর আত্মজ-এর মৃত্যুর বেদনাকে প্রকাশ না করে, ইত্যাদি।

একেই বলে ব্যক্তিত্ব। একেই বলে পারসোনালিটি।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের এই রকম সহৃদয় পারসোনালিটির ভূরি ভূরি পরিচয় ছড়িয়ে আছে কলকাতার লাটভবনের চার দেয়ালের মধ্যে। সেগুলি যেন এক একটি হীরে-মণি-মাণিক্য দিয়ে গাঁথা মহামূল্যবান কণ্ঠের মালা, স্মৃতির টুকরো।

একদিনের ঘটনা। কলকাতায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। রাজভবনে চাপরাশী, বেয়ারা, বাবুর্চি, লিফটম্যানেরা জটলা পাকিয়ে বিগত বৃটিশ জমানার সুখের দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে আর সেদিনের প্রচণ্ড শীতের কথা বলছে। সরকারের অশোক স্তম্ভ মার্কা লাল কম্বলের ফুল হাতা চাপকান কোটের উষ্ণ গরমেও এই আজকের শীতকে বাগ মানানো যাচ্ছে না।

লাটবাড়ীর লিফটম্যান ক্ষীণজীবী উড়িষ্যাবাসী অলোক রাউতের মহা ভাবনা। কারণ রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার তো সকাল পাঁচটার সময় লাঠি হাতে এ-ডি-সি ছাড়াই একা একা রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন। কী করে এই ভীষণ হাড় কাঁপানো শীতে কলিঙ্গবাসী অলোক রাউত সারা রাতের ডিউটি দেবে লিফটে।

তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে কলকাতার শীতের আকাশে। শ্রীঅলোক রাউত লিফটম্যান রাজভবনের উর্দি পরে তিনতলায় রাজ্যপালের স্যুইটের সামনে ভোরের জন্য লিফট আটকিয়ে রেখে লিফটের পাশেই শ্বেত পাথরের কনকনে বারান্দায় কুঁকড়ি মেরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে শীতের অস্বস্তিতে লিফটম্যান অলোকের সমস্ত শরীর একবার টান টান হচ্ছে আবার কুঁকড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হরেন্দ্রকুমার নিকটে পা বাড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। তিনি নিঃশব্দে আবার নিজের স্যুইটে আস্তে আস্তে চলে গেলেন এবং তাঁর একটা গরম শাল নিজের হাতে নিয়ে এসে নিদ্রিত লিফটম্যানের গায়ের ওপর চাপিয়ে দিলেন।

নিদ্রিত অলোক রাউত তখনস্বপ্ন দেখছে—সে যেন কোন স্বপ্নের দেশে হারিয়ে গেছে আর তার গায়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এবং একটা সবুজ চাদর জড়িয়ে দিচ্ছেন।

এর পর লিফটম্যানের ঘুম না ভাঙিয়ে হরেন্দ্রকুমার লিফটের সুইচ অন করে নীচে প্রাতঃভ্রমণে চলে এলেন।

প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটেছে। রাজভবনের বারান্দায় একটু রোদদুর আসতে লেগেছে। হঠাৎ অলোকের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখে তার গায়ে দামী একটা শাল আর চোখের সামনে লিফটের খাঁচা নেই। সে তো হতভম্ব। হঠাৎ দেখলো রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার নিজে লিফট চালিয়ে ওপরে উঠে এলেন। সঙ্গে এ-ডি-সি বা আর কেউ নেই।

মুহূর্তে অলোক রাউত সমস্ত জিনিস নিজের মনে বুঝতে পেরে লাট সাহেবের পা দুটি বুকে জড়িয়ে ধরলো—হুজুর ক্ষমা করো। শীতে ঘুমিয়ে পড়েছি। তোমাকে কত কষ্ট দিলাম। নাও তোমার শাল ফিরিয়ে।

সৌম্যমূর্তি হরেন্দ্রকুমার তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আমি একই ভাই। মনে কর বড় ভাই ছোট ভাইকে এই শাল উপহার দিয়েছে। তুমি ওটা পরো। ওটা তোমাকে দিলাম।

রাজ্যপাল হরেন মুখার্জির সময়ে রাজভবনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ও খুশীর হাওয়া বয়ে যেতো। সবাই তাঁর সাধাসিধে চালচলন ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

রাজভবনের প্রতিটি কর্মচারী এই রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলতো। রাজভবনের সবাই যেন মনে করতেন যে সবাই যেন স্বয়ং রাজ্যপাল হরেন মুখার্জির একান্ত আত্মীয় ও তাঁর নিজের লোক। তাঁর সময়ে রাজভবনে কেউ নিজেকে অসহায় বা গরীব বলে মনে করতেন না,— যে লাট স্বয়ং রিপু করা জামা পরেন তাঁর কর্মচারী ময়লা জামা প্যাণ্ট পরবে তাতে কী হয়েছে।

সবাই যেন এক সংসারের লোক। সমভাবাপন্ন। কিন্তু তার মধ্যেও মাঝে মাঝে একটু আধটু গোলমাল বাঁধতো। তবে হরেন্দ্রকুমার হাসিমুখে সেগুলি মিটিয়ে দিতেন।

এই রকম একদিন গোলমাল বাঁধলো খোদ রাজ্যপালের কাছে হঠাৎ তাঁর অফিসের এক বাবুর স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তের জন্য। এই প্রাক্তন চট্টগ্রামবাসী অফিসের বাবুটি অত্যন্ত বদ মেজাজী ছিলেন। এই দে মশায়কে রাজভবনের কেউ বেশি পছন্দ করতেন না। কিন্তু কেন জানিনা অফিসের সবাই তাকে অত্যন্ত ভয় করতো। এই বাবুটি রাজ্যপালকে জানালেন যে তার ৯নং গর্ভমেণ্ট প্লেস নর্থ-এর কোয়ার্টার্সের নীচে যে চতুর্থ শ্রেণীর ঝাড়ুদারেরা থাকে তারা সন্ধ্যার পর একসঙ্গে সকলে মিলে গলা ছেড়ে ভজন গান করে, এতে তার ছেলেদের পড়াশোনা, নিজের কাজকর্মের ও গিন্নীর ভরা সন্ধ্যায় নিদ্রার বেশ ব্যাঘাত হয়।

এর একটা বিহিত করা দরকার। অনেক ওপরওয়ালার কাছে দরবার পেশ করেও তিনি এর কোন সুরাহা পাননি। ঝাড়ুদাররা দু' একদিন প্রথম গান বন্ধ করে আবার পরে তাদের গান দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করে। এর একটা চিরস্থায়ী ফয়শালা করা দরকার।

দরখাস্তটি পেয়ে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার অফিসের সেই বাবুটিকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। সস্নেহে নিজের কাছে বসিয়ে তার মুখ থেকে শুনলেন। কথা শোনার পর খানিক পরে বললেন, 'দেখুন দে মশায়, আমি এক্ষুনি ঐ ঝাড়ুদারদের গান বন্ধ করার হুকুম দিতে পারি। কিন্তু তাতে ফল হবে উল্টো। এখন ওরা কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে ভজন গান করে কিন্তু ওদের এ গান বন্ধ করে দিলে ওরা তখন সদলবলে সন্ধ্যেবেলা মদ খেয়ে মাতলামী করবে। এমন কি আপনাদের ওপরে দোতালায় উঠে হামলা করতে পারে। সেটা কী ভাল হবে। তার চেয়ে গানের আবহাওয়াটা একটু একটু করে সহ্য করুন না কেন। এই কলকাতা শহরে এ রকম কতশত তো আওয়াজ ঝংকার সদা সর্বদা হচ্ছে।

আর যদি কিছুতেই না পারেন তবে বলুন আপনাকে অন্য কোনো কোয়ার্টারে সরিয়ে নিয়ে যাই। রাজ্যপাল আরও বললেন, কিন্তু কী আশ্চর্য দে মশায়, আপনি ছাড়া আরও আমার অনেক কর্মচারী এ ব্লকে আছেন তাঁরা তো কৈ কেউ কিছু কমপ্লেন করেননি এতদিনেও। আপনি দু'দিন এসেই কেন ঐ নিঃসহায় গরীব বেচারাদের পেছনে লাগলেন।

রাজ্যপালের এরূপ সস্নেহে মৃদু ভর্ৎসনাতে দে মহাশয়ের অত্যন্ত লজ্জা হলো ও তিনি মুখ কালো করে এসে আবার দপ্তরে কাজে মন দিলেন।

এদিকে কিন্তু হরেন্দ্রকুমার ঝাড়ুদারসর্দার সন্তকৃপালকে ডেকে চুপি চুপি কড়া হুকুম দিলেন যে সন্ধ্যাবেলা তারা যখন গান বাজনা করবে তখন যেন ব্যারাকের দরজা জানলাগুলির কিছু কিছু ভেজানো বা বন্ধ রাখা হয় যাতে বাইরে খুব বেশী গানের আওয়াজ না পেঁছায়।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের মধুর ব্যবহার ও বিচক্ষণতার যেন কোনই তুলনা নেই।

হরেন্দ্রকুমার যখন হঠাৎ ৮ই আগস্ট উনিশশো ছাপান্ন সালে সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে মারা গেলেন, তার কিছুদিন পরে তাঁর রাজভবনের স্যুইটে একটি তাঁর পুরাতন রোজনামচার খাতা পাওয়া গিয়েছিল; তাতে হরেন্দ্রকুমারের প্রথম জীবনের দৈনিক বাজার খরচ লেখা ছিল। সেটা সত্যিই অনবদ্য। তিনি তাঁর মিতব্যয়িতার জন্যই যে এতো টাকা দেশের লেখাপড়ার জন্য দান করতে পেরেছিলেন তার নিদর্শন তাতে ভুরি ভুরি আছে।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী বঙ্গবালা মুখার্জী সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়।

রাজভবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমতী বঙ্গবালাকে 'মা' বলেই সম্বোধন করে এসেছে এবং শ্রীমতী বঙ্গবালা এই মা নামই বেশী পছন্দ করতো এখানকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে লেডী সাহেবের বদলে।

এখানে এই রাজভবনের চৌহদ্দিতে লাটসাহেবের গিন্নীকে বলা হয় লেডী সাহেব, সেক্রেটারী সমপর্যায়ের গিন্নীদের বলা হয় মেমসাহেব এবং সাধারণ বাবুদের

গিন্নীদের চাপরাশি, বেয়ারারা বলে বৌদি। এটা অলিখিত কনভেনশান। এখানে লাটভবনে সাধারণ চাকুরেদের পদবী হিসেবে পরিচয় হয় যথা মিঃ বসু, রায়, ঘোষ, চ্যাটার্জী, গুহঠাকুরতা ইত্যাদি এবং অফিসারদের এস্ জি সাহেব, সেক্রেটারী সাহেব, ডি-এস-জি সাহেব, এ ডি সি সাহেব, ডাক্তার সাহেব ইত্যাদি।

এখানে কোন অফিসারের বউকে মেমসাহেবের বদলে বৌদি বললে তিনি আহ্বানকারীর দিকে চোখ কটমট করেন।

এইতো সেদিন একজন ইঞ্জিনিয়ারের বিদুষী স্ত্রী অফিসের একজন পিওন যে তার বাড়ীতে কাজকর্ম করতো তাকে বললেন, তুমি আমাকে বৌদি বলবে না। আমি তোমাদের অফিসের বড়বাবুর বউ নই। আমাকে মেমসাহেব বলে ডাকবে।

এখানে লাটগিন্নীকে লেডী সাহেব বললে আনন্দিত হন কিম্বা বড় জোর ম্যাডামের অপভ্রংশ ম্যাম। ব্যাস। এর নীচে কিছুতেই নয়। মা বা মাইজী বললে তাঁরা ক্ষেপে ওঠেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন রাজ্যপাল হরেন্দ্র-জায়া বঙ্গবালা।

ম্যাম্ বা লেডী সাহেব বঙ্গবালার গভীর অপছন্দ ছিল। বঙ্গবালা সিঁদুর সীমন্তিনী হয়ে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, সাধারণভাবে বাঙালী গৃহিণীদের মতো মোটা খদ্দরের শাড়ী পরতেন। তবে মাঝে মধ্যে তাঁকে খাঁটি মুর্শিদাবাদী সিল্কের খাদি শাড়ী পরিহিতাও দেখেছি।

তাঁর আর একটি গুণও এখানে উল্লেখনীয় যে তিনি নিজের ও স্বামী রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের জামা-কাপড় প্রায়শঃ নিজের হাতে কাচতেন এবং ধুয়ে রৌদ্রে শুকোতে দিতেন। যদিও রাজ্যপালের খাশ নিজস্ব ধোবী রাজভবনে সদা সর্বদা এই কাজকর্ম করবার জন্য নিযুক্ত আছে।

বঙ্গবালার আর একটি প্রধান গুণ ছিল যে তিনি রাজভবনের সমস্ত কর্মচারীকে সস্নেহে ডেকে ডেকে কুশল সংবাদ ও তাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের সংবাদ নিতেন।

কখনও কখনও প্রায়ই দেখা যেত রাজভবনের কোন ইলেকট্রিক কর্মী বা মজদুর তাঁর সামান্যতম কাজ করলেই তিনি সস্নেহে তার দুহাত ভরে তাঁর নিজস্ব ঠাণ্ডা-আলমারী (ফ্রিজিডিয়ার) থেকে মিষ্টি বা সন্দেশ বার করে তাদের দিচ্ছেন। কখনও বা সে কৌতুকে সেই সব দুখী মজদুরকে বলছেন নিজের হাতেই ফ্রিজিডিয়ার থেকে খাবার নিতে এবং পরক্ষণেই সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে সে যেন তাঁকে না বলে ওখান থেকে কিছু চুরি করে না খায়! এই কথা বলে ফেলেই তিনি উচ্চহাস্যে ফেটে পড়তেন।

খাঁটি সনাতন পন্থী বাঙালী গৃহিণী বলতে যা বোঝায় শ্রীমতী বঙ্গবালা ঠিক সেই রকম একজন সম্পূর্ণ হৃদয়শীলা সুরুচিসম্পন্না ভদ্রমহিলা বলা চলে। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে রাজভবনের যে কেউ-ই তাঁকে দেখবে সে যেন সব সময়ে তাঁকে হাত তুলে আগে-ভাগে নমস্কার করেন বা মা বলে সম্বাধন করেন। তিনিও সেই নমস্কারের প্রত্যাভিবাদন সঙ্গে সঙ্গেই করতেন।

একবার হয়েছিল কী রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের এ ডি সি ক্যাপ্টেন মুখার্জি'র আধুনিকা সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী রাজভবনের মারবেল হলে মহিলাদের এক সভায় হাইহিলডে গট্ গট্ করে এসে শ্রীমতী বঙ্গবালাকে না নমস্কার করেই আসন গ্রহণ করাতে তিনি খুব মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন।

পরে অবশ্য কথাটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে সেই এ-ডি সি পত্নী তৎক্ষণাৎ তার আসন থেকে উঠে এসে বঙ্গবালাকে হাত জোড় করে নমস্কার করেন এবং তার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা চেয়ে নেন।

শ্রীমতী বঙ্গবালার আর একটি গুণ ছিল যে তিনি রাজভবনের যে কোনো কর্মচারীর বিয়ে-শাদীতে অবশ্যই উপস্থিত হতে ভালবাসতেন। অবিশ্যি যদি সাহসভরে তাঁকে ও রাজ্যপালকে সে সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হতো। কারণ এ সব হাই ডিগনিটারিসদের নিমন্ত্রণ করলে দেখা গেছে রাজ্যপালের এ-ডি-সি থেকে আরম্ভ করে সিকিউরিটি অফিসার মায় আরদালী পিওন পর্যন্ত প্রায় দশ পনেরো ব্যক্তি বহাল তবিয়তে লাট সাহেবের সঙ্গে নেমতন্ন খেয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং রাজভবনের খুব হিসেবী লোক ছাড়া—যারা নাকি আত্মীয়-স্বজনকে রাজ্যপালের নিমন্ত্রণে যোগদানের ফটো দেখাতে একান্ত ইচ্ছুক—তারা ছাড়া এ নিমন্ত্রণে প্রায় সবাই পাশ কাটিয়ে যান।

রাজ্যপাল হরেন মুখার্জি'র মিতব্যয়ী স্বনামধন্য জীবনে পত্নী বঙ্গবালারও কম দান নেই। কারণ প্রায়ই যা দেখা যায় যে স্বামী হয়তো মিতব্যয়ী—পত্নী দ্বিগুণ খরচে। ফলস্বরূপ অর্থাভাব। কিন্তু হরেন্দ্রকুমারের জীবনে শ্রীমতী বঙ্গবালাও মিতব্যয়ী। নিজেই কাপড়-চোপড় ধোন, ব্যারাকপুরের লাট বাগানের সাধারণ তরিতরকারি আদেশ দিয়ে আনান, রাজভবেন দামী প্যানট্রিতে মাছের ঝোল আর লাউ-সুক্তো আর মোচা-বড়ির ঘণ্ট হয়।

তাঁর ও স্বামীর এই রকম সাধাসিধে জীবনযাত্রার জন্য হরেন্দ্রকুমার এতো অধিক টাকা দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করে যেতে পেরেছিলেন।

এখন আবার আসা যাক রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের কথায়।

সেদিনের তারিখটা ছিল ৮ই নভেম্বর উনিশশো তিপান্ন সাল। বেশ জাঁকিয়ে ব্যারাকপুরের লাটবাগানে শীত পড়েছে। হরেন্দ্রকুমার তার আগের দিন সদলবলে ব্যারাকপুর লাটবাগানের ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে এসে উঠেছেন। সঙ্গে আছেন এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন এস ব্যানার্জি ও সিকিউরিটি ইনসপেক্টর তিনকড়ি মুখার্জি।

হঠাৎ পরের দিন সকাল বেলায় অতি প্রত্যুষে কাউকে না জানিয়ে, গায়ে চাদর চাপিয়ে সঙ্গে লাঠিটি নিয়ে রাজ্যপাল ফ্ল্যাগস্টাফ বাংলোর প্রায় সংলগ্ন পুলিশ টি. বি. হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রায় কেউ তাঁকে চেনে না। সঙ্গে এ-ডি-সি বা সিকিউরিটি অফিসার নেই। তিনি রোগীদের ঘরে গিয়ে দেখেন যে, জলের কুঁজো গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে,

নার্স বা আয়া কেউ কোথাও নেই, রোগীরা ছেঁড়া বিছানায় মশারিবিহীন পড়ে রয়েছে।

তিনি কয়েকজন রোগীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেই স্টাফ নার্সের ঘরে গিয়ে তাকে তাঁর পরিচয় জানিয়ে হাতে ফোনটি তুলে নিলেন। রাগে তখন তাঁর শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এদিকে কোন ফাঁকে সিকিউরিটি অফিসার ও এ-ডি-সি তখন এসে হাজির হয়ে গেছে।

তখন পুলিশের আই-জি ছিলেন হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী। হরেন্দ্রকুমার তাঁকে ফোনে তক্ষুণি ব্যারাকপুরে ডেকে—টি. বি. হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, আয়া, কমপাউণ্ডার সকলের বদলির ব্যবস্থা পাকা করে রাগতভাবে বললেন—আমি টি.বি. ফাণ্ডের জন্য ব্যবসায়ী সাহেব-সুবোর কাছে টাকা ভিক্ষে করে আনছি আর নবাব ডাক্তার নার্সরা রুগীদের একটু খাবার জলেরও ব্যবস্থা করে না। এরা সব ভেবেছে কী।...

আর একবারের ঘটনা। কলকাতার সব কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম লনে Star of India show হবে। ভারতের তাবৎ বড় বড় শিল্পী যেমন লতা মংগেশকর, বড়ে গোলাম আলী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, রাধিকামোহন মৈত্র, চিন্ময় লাহিড়ী ইত্যাদিরা গান বাজনা করে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের হাতে টি. বি. আফ্টার কেয়ার কলোনীর জন্য মোটা ডোনেশন তুলে দেবেন। গান বাজনা সব হলো, টাকাও উঠলো কিন্তু কিছু কিছু কলকাতার দৈনিক কাগজে রাজ্যপালের এই শুভ সৎ উদ্দেশ্য না বুঝে নানা রকম বিশ্রী তাঁর সমালোচনা করল। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার এতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

হরেন্দ্রকুমারের কতো যে সাহস ও বঙ্গদেশ প্রীতি ছিল তার দু'একবার নমুনা পেয়েছি রাজভবনে, আমাদের মতো রাজভবনের কর্মচারীদের মেরিট সার্টিফিকেট প্রদানের আহূত সভায় তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ বক্তৃতায়।

এই মেরিট সার্টিফিকেট রাজভবনে বিশ্বস্তভাবে কাজ করার জন্য দশ বছরে, কুড়ি বছরে ও ত্রিশ বছরে কর্মচারীদের দেওয়া হয় এবং তা সেই বৃটিশ আমল থেকে। রাজ্যপালের সেক্রেটারী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মজদুর পর্যন্ত যে কেউ নিজ কার্যে দায়িত্বশীল নিষ্ঠার জন্য এই সার্টিফিকেট পান।

হরেন্দ্রকুমারকে ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজভবনের ঐতিহাসিক মার্বেল হলে বেশ কয়েকবার সগর্বে বলতে শুনেছি—'আমরা বাঙালী সব দিক থেকে সরে গেছি বা পিছিয়ে পড়েছি এ কথা কখনও মনে করবেন না। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার। এই সেদিনও আমার ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ চোখে আঙুল দিয়ে ভারতবাসীকে দেখিয়ে গেছে বাঙালী এখনও মরে নি। দেশগৌরব নেতাজী সুভাষের কথা কেউ কখনও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবে না, সে তারা যতই চেষ্টা করুক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার অতি গোপনভাবে জানা গেল যে হরেন্দ্রকুমার রাজভবনে সরকারের অর্থ

বাঁচিয়ে খুব সাধাসিধে ভাবে চলার জন্য দিল্লীর মহা মহারথীরা নাকি খুব অসন্তুষ্ট, কারণ বিশ্বের ভি-আই-পিরা নাকি কলকাতার রাজভবনে সব রকম আরাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন। এতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে হরেন্দ্রকুমারকে বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল করে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

কথাটা হরেন্দ্রকুমারের কানে যেতেই তিনি লাটগিরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজের এনটালির বাড়ীতে যাবার কথা মনস্থ করলেন। তিনি বললেন—আমি কলকাতার রাজভবনের রাজ্যপাল। সুতরাং আমি যদি এই পরিবেশে নিজে থাকতে পারি তবে আমার অতিথিরা সে যতো বড় দেশের বড় ভি-আই-পি-ই হন, তাকে এখানে থাকতে হবে। তিনি আরও বললেন—আমি তো রাজভবনে ধুলো মাটির ভেতর থাকছি না, তবে আমি রাজভবনকে ফাইভ স্টার হোটেল বানাতে দেব না। রাজভবনের দামী পর্দা ফার্নিচার দুদিন অন্তর বাতিল করে এই গরীব দেশের টাকায় নিত্য নতুন জিনিস কেনা চলবে না। তাতে যদি কারও রাগ হয় আমি রাজ্যপালগিরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। আমার শিক্ষকের জীবনই এর চেয়ে অনেক ভালো। রাজ্যপালের জীবন তো বন্ধ জীবন।

পাঠকেরা শুনলে অবাক হবেন, হরেন্দ্রকুমার এই রকম করে নিজের মৃত্যুর পূর্বে রাজভবনে রাজ্যপালের ফান্ডে আট লক্ষ টাকা জমিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, যেটা নাকি তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর পর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু নতুন রাজ্যপাল হয়ে এসে নতুন নতুন পর্দা, ফার্নিচার ইত্যাদি করে খরচ করে দেন। শ্রীমতী পদ্মজা কলকাতার রাজভবনে এসেই সব গন্ধা, সব গন্ধা অর্থাৎ সব ময়লা, ময়লা ইত্যাদি নিরন্তর বলতে লাগলেন।

তবে এখানে বলা প্রয়োজন হরেন্দ্রকুমারের চরিত্রের ঋজুতার জন্য এবং শোনা যায় অতুল্য ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের হস্তক্ষেপের জন্যেই হরেন্দ্রকুমারকে সে দিনের ঐ লজ্জাকর বদলির খপ্পরে পড়তে হয়নি। তিনি তাতে রাজীও ছিলেন না।

তাঁর সময় উনিশো পঞ্চান্ন সালে একবার দিল্লী থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কলকাতার রাজভবনে এসে এখান থেকে রাজভবনের বেশ কয়েকটা সুন্দর সুদুর্লভ বিদেশী কাটগ্লাসের দামী ঝাড় দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের ত্রিমূর্তি ভবনে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শোনা যায়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের এতে মতও ছিল। কিন্তু রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার বাংলার লাটবাড়ীর এই বহু মূল্যবান কাটগ্লাসের ঝাড় ছাড়তে নারাজ।

শেষে বিজয়লক্ষ্মী বর্ধমানের সদ্য বিক্রী হওয়া ঐ পর্যায়ের ঝাড়বাতি দু' একটা কলকাতায় খোঁজ করেছিলেন কিন্তু অত্যধিক দামের জন্য তা নেওয়া যায় নি।

একবার হলো কী স্বয়ং রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার জনে জনে রাজভবনের সকল কর্মচারীকে কার্ড দিয়ে চায়ের নেমন্তন্নে ডাকলেন ব্যানকোয়েট হলে দুপুরে।

আমরা তো সকলে অফিসে বলাবলি করতে লাগলাম ষ্টার অব ইণ্ডিয়া শো করে টাকা তোলা হলো, ব্যার‍্যাকপুরে ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে ওখানকার ইউরোপীয়ান জুট মিলের মালিকদের থেকে চা খাইয়ে টি. বি. ফাণ্ডের জন্য টাকা তোলা হলো, এছাড়া যেখানে রাজ্যপাল যান সেখানেই টি. বি. ফাণ্ডের টাকা তোলেন, এবার বোধ হয় সে সব শেষ হয়েছে এখন চোখ পড়েছে আমাদের মতন কেরানীর ওপর। আমরা যাবো না।

তবু গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম এবং দেখলাম তার জন্য এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। রাজ্যপাল চায়ের পর্বের পর ব্যানকোয়েট হলে নিজের চেয়ার ছেড়ে প্রতি জনের কাছে এসে হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বললেন—আপনারা রাজভবনের কর্মচারী। আর আমি আপনাদের দরিদ্র রাজ্যপাল। আমি আপনাদের আমার টি. বি. ফাণ্ডের জন্য খাতাপত্রের হিসেব রাখতে আদেশ করতে পারি না। তবু অনেক চিন্তা করে এবং আমার সহধর্মিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাদের একটা অনুরোধ করছি যদি আপনারা মাঝে মাঝে অফিসের ছুটির পর টি. বি. ফাণ্ডের খাতাপত্তরগুলি দেখে দেন তবে আমার এগুলি মেনটেন করবার জন্য লোকদের যে টাকা মাইনে দিতে হয় তা দিয়ে তাতে রুগীদের কিছু ফল মিষ্টি ওষুধ কিনে দেওয়া যায়।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের এই অনুরোধ শুনে আমাদের সকলের মাথা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নীচু হয়ে গেলো—কারণ আমরা যে জানি হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের তৎকালীন পাঁচ হাজার টাকা মাইনের মধ্যে নিজে কেবলমাত্র পাঁচশো টাকা নেন। বাকী সব টাকা দুঃস্থ বিধবাদের বা শিক্ষাখাতে বা টি. বি. ফাণ্ডে দেন।

নেতাদের খাদ্য ও কলকাতার রাজভবন

কলকাতার রাজভবনের জীবনে যেমন ঐতিহাসিক "থেরান" রুমের প্রাধান্য আছে তেমনি প্রাধান্য বা বৈশিষ্ট্য আছে এখানকার 'রন্ধনশালার—ইংরেজীতে যার নাম প্যানট্রি রুম।

বৃটিশ আমলে রাজভবনের রন্ধনশালা ছিল রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে এখন যেখানে মন্ত্রীনিবাস হয়েছে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হবার পর লাট ভবনের যাবতীয় রান্নাবান্না হয় খাশ রাজভবনের দোতলার প্যানট্রিতে—যেখানে বৃটিশ আমলে শুধু চা, কেক, রুটি ও বিস্কুট হতো। এই রন্ধনশালায় নানা জাতের কুক্ বা ঠাকুর আছে।

কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ নেপালী, কেউ অসমীয়া, কেউ চিটাগাং এর, কেউ বাঙালী, কেউ বিহারী, কেউ গোয়ানীজ ইত্যাদি।

পূর্বে বৃটিশ আমলে নানা দেশের নানা জাতের কুক্ বা ঠাকুর রাজভবনে রাখা হতো। এখন আছে তাদের ডাইরেক্ট্ বংশধরগণ—একাদিক্রমে বংশপরম্পরা কাজ করে চলেছে।

মোটামুটি বাংলার লাটদের খাবারের কথা পূর্বে দু এক জায়গায় বলা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে রাজভবনে যে সব ভি-আই-পি পূর্বে এসেছেন বা এখন আসছেন তাদের কয়েক জনের খাদ্য তালিকার কথা।

পরলোকগত জওহরলাল যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন মাঝে মাঝেই নানা কাজে তাঁকে কলকাতায় আসতে হতো। উঠতেন তিনি রাজভবনে। সঙ্গে সব সময় থাকতো তাঁর প্রিয় পরিচারক হরি। সেই-ই জওহরলালের সর্বময় কর্তা বা তাঁর খাওয়া-দাওয়ার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য ছিল।

রাজভবনের সাধারণ চলতি নিয়ম অনুযায়ী আগে থেকেই অতিথিরা কী খাবেন তা প্রাতঃকালেই মেনু চার্ট-এ লিখে জানিয়ে দিতে হয়। কিন্তু নেহেরুজীর বেলায় তা সাধারণতঃ করা হতো না। হরিই প্যানট্রিতে এসে মিঃ অমিয় মুখার্জী যিনি রাজভবনের পাকশালার সর্বময় কর্তা, তাকে নেহেরুজী কী কী খাবেন তা বলে যেতেন।

এই বৃদ্ধ পরিচারক হরিকে রাজভবনের লোকেরা যত না সম্মান করতো তার চেয়ে বেশী করতো ভয়।

কারণ এই হরি ও ইন্দিরা জওহরলালের সকল সময়ের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তাঁর

দেখাশোনার ওঠাবসার। যাকে চলতি ইংরেজিতে বলে 'affectionate guardian and guide'।

হরির বদলে মাঝে মাঝে ইন্দিরাও বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসতেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজভবনের সবচেয়ে দামী ও সম্মানিত প্রিন্স অব ওয়েলেস স্যুটে তাঁরা উঠতেন।

জওহরলাল ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে লেমন দিয়ে এক কাপ চা খেতেন।

এর পর শোবার ঘরে পনেরো মিনিট কৌপিন বা জাঙ্গিয়া পরে শ্রীনেহেরু মেঝেতে যোগাসন করতেন। শীর্ষাসন তাঁর প্রাত্যহিক ব্যায়াম ছিল। পরে পাঁচ সাত মিনিট ঘরেই ঘোরাফেরা। তারপর স্নান করতে বাথরুমে যেতেন। স্নানের শেষে ধোয়া কাপড় পরে নির্জনে একটু গীতা পাঠ করতেন।

সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রাতঃরাশে বসতেন। একখানা মাখন মাখানো রুটি তার ওপর পাতলা মধু দিয়ে টেবিলে দেওয়া হতো। তারপর দেওয়া হতো দুটি মাখন খন্ড ও দুটি মুরগীর ডিমের বয়েল। তিনি চামচ দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতেন।

এরপর দেওয়া হতো এক গ্লাস "পাইপিং হট" বা উগ্র গরম কফি। এমন গরম কফি যে তার থেকে অনবরত ধোঁয়া পেয়ালা থেকে বেরুতে থাকবে। এই কফির একটু গরমের ইতর-বিশেষ হলেই ও'র মেজাজ সপ্তমে চড়তো। অনেক সময় তিনি কাপ ডিস ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিতেন।

দু হাত বাড়ায়ে কেষ্টা বেটা তখন নির্ভয় ত্রাতা রূপে দেখা দিত তাঁর চির পুরাতন ভৃত্য হরি। আবার সব ঠিক হয়ে যেতো। কিন্তু এই যে একবার নেহেরুজীর মেজাজ বিগড়ালো তার দাপট সমস্ত দিন চলতো। দাপটের একটু উত্তাপও হয়তো লাগতো বিকালে বা সন্ধ্যায় রাজভবনে আহূত প্রেস কনফারেন্সের গোল টেবিলে।

বেলা একটা দেড়টায় নেহেরু মধ্যাহ্ন ভোজে বসতেন। পছন্দ করতেন ইংরেজী খানা। প্রথমে তাঁকে দেওয়া হতো এক প্লেট সুপ। তারপর দু' চারখানা মাছের ফ্রাই। ভেট্‌কী মাছের টুকরো লেবুর রসে ধুয়ে ডিমে ভিজিয়ে সামান্য নুন দিয়ে ভেজে দিতে হতো। ফ্রাই-এ পোড়া দাগ তিনি পছন্দ করতেন না।

তারপর যে প্রধান ডিসটা তাঁকে দেওয়া হতো সেটা হচ্ছে "চিকেন রয়াল"।

এই একটা খানা বানাতেই রোজ তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালে খরচ পড়তো ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

এটা বানাতে দুটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী জবাই করা হতো। মেসিনে একটা মুরগীকে কেটে কিমা করে মাখন ও যাবতীয় নুন-মশলা দিয়ে ফ্রাই প্যানে ভাজা হতো। তারপর ভাজা কিমাটা সামান্য গরম জলে ডুবিয়ে দেখে নেওয়া হতো ঠিক ভাজা হয়েছে কিনা। ভাজা কিমাটা জলে ভাসছে কিনা। ভাসলে ঐ ভাজা কিমাটা অন্য আরেকটি ছাড়ানো মুরগীর পেছন দিয়ে পেটের ভিতর পুরে দিয়ে

সেলাই করে দেওয়া হত। পরে মাখন দিয়ে মুরগীটাকে ফ্রাই প্যানে ভাজতে হতো। যখন আস্ত মুরগীর রোমকূপ দিয়ে মাখন গড়িয়ে পড়তো তখন আস্ত ভাজা মুরগীটিকে গরম গরম প্লেটে পরিবেশন করা হতো।

নেহেরুজী কাঁটা চামচ দিয়ে বেশ তৃপ্তি করে সেই 'চিকেন রয়েল' খেতেন।

রাত্রের ডিনারে প্রায় একই রকম ইংলিশ খানা থাকতো।

আর বিকালের "টি'-তে থাকতো কফি, সন্দেশ, কলা, আপেল, আঙুর, স্যান্ডউইচ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও কলকাতায় রাজভবনে বহুবার এসেছেন। তাঁর খুব শখ ছিল তাঁর বিভিন্ন পোজের ফটো বিভিন্ন পত্রিকায় রোজ রোজ বের হোক।

একবার মহাত্মাজীর তিরোধান দিবসে ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে তাঁর মাল্যদানের সময় তাঁকে বলতে শোনা গেছে সরকারি ক্যামেরাম্যান মি· সরকারকে "জলদি ফটো খিচো, জলদি ফটো খিচো।" অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ফটো নাও, ফটো নাও। খবরের কাগজে যেন শীঘ্র বের হয় এই ফটো।

তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর লেখা নিজের 'অটোবায়োগ্রাফি'র বই দু' চারখানা সব সময়েই থাকতো। মান্যগণ্য লোক দেখলেই ওঁনার সেক্রেটারী ওঁনার নির্দেশে বইগুলি বিনামূল্যে তাঁদের উপহার দিতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে এই সেদিনও অর্থাৎ উনিশশো চুরাশি সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যপাল এ. পি. শর্মা নিজের লেখা 'আত্মকথা' রাজভবনের অফিসারদের বাড়ীতে বাড়ীতে আরদালি, পিয়ন দিয়ে সানন্দে পৌঁছে দিয়েছেন।

একবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের সময় রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলকাতার রাজভবনে সাময়িকভাবে উঠেছিলেন। তখন দেখেছি তাঁর পার্টির সঙ্গে বাক্সবন্দী হয়ে তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফি' শ'য়ে শ'য়ে বিতরণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যাচ্ছে। যদিও এগুলির সঙ্গে তাঁর খাদ্যাভ্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলে কলকাতার রাজভবনে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। তিনি রাজভবনের সুদৃশ্য কাঠের পালঙ্কে শুতে পারতেন না। দড়ির নেয়ারের খাটিয়া তাঁর চাই-ই।

তাঁর জন্য রাজভবনে একটি দামী নেয়ারের খাটিয়া সব সময়ে তৈরী থাকতো। কিন্তু একবার রাজভবনের এক ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ ফণী সেনগুপ্ত সেটা সাময়িক ব্যবহার করতে থাকলে রাজেন্দ্রপ্রসাদের হঠাৎ রাজভবনে আগমনে ওটা খুঁজে বার করতে বেশ হৈ-চৈ পড়ে যায়। অবশ্য দু' চার ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির মধ্যেই ওটা হদিশ মেলে মিঃ খাজারুর ঐকান্তিক চেষ্টায়, যিনি রাজভবনে পুরাতন ফার্ণিচার সুপারভাইজার।

প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের গা দলাই-মালাই করবার জন্য রোজ দুজন করে রাজভবনের বেয়ারাদের লাগানো হতো। বেয়ারাকে দিয়ে গা দলাই-মালাই করা তার নিত্যকার অভ্যাস ছিল।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলকাতার রাজভবনে এলেই রাজভবনের পায়খানার ইংলিশ কোমডের কাঠের প্ল্যাটফর্ম লাগিয়ে সাময়িক ইন্ডিয়ান টাইপ পায়খানা করে দিতে হতো। কোমড তিনি ব্যবহার করতে পারতেন না বা পছন্দ করতেন না।

যাক যা বলছিলাম তাই বলি। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন। মুখ হাত ধুয়ে তিনি কিছুক্ষণ পুজো-আচ্চা করতেন। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি খেতেন প্রাতঃরাশ। সকালে চা বা কফি তিনি বড় একটা খেতেন না। ব্রেকফাস্টের টেবিলে থাকতো বড় রুপোর গ্লাসে এক গ্লাস গরুর খাঁটি দুধ আর জল-খাবারের মধ্যে নানা রকমের ফল—যেমন কলা, আম, আপেল, লেবু ও দু'চারটি সন্দেশ।

বেলা ১২টা থেকে ১২-৩০টার মধ্যে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজ সারতেন। তিনি ভারতীয় খানাই পছন্দ করতেন। রুপোর বাসনপত্র ছাড়া তিনি অন্য বাসনে খেতেন না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তাঁর টেবিলে দেওয়া হতো রুপোর একটা বাটি ভর্তি গাওয়া ঘি। দু'তিন খানা চাপাটি গাওয়া ঘিয়ে ভিজিয়ে তরকারি ডাল দিয়ে তিনি বেশ আস্তে আস্তে খেতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী ছিলেন। শেষ পাতে দই, রাবড়ী, চাটনি আর দু'একটা মিষ্টি তাঁকে দেওয়া হতো।

খেয়ে-দেয়ে দুপুরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটু ঘুম দেবেনই, বহু দিনের অভ্যেস। আবার বিকেল ৪টে নাগাদ চা। চায়ের সঙ্গে দেওয়া হতো সিঙ্গারা, কচুরী, পকৌরী, সন্দেশ আর স্যান্ডউইচ। পকৌরী খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'নৈশ ভোজ' সারতেন সাধারণতঃ ৮টা থেকে ৮-৩০ এর মধ্যে। চাপাটি, ডাল, তরকারী, চাটনী, রাবড়ী ও মিষ্টি তাঁর পাতে পড়তো। রাত্রে শোবার আগে এক গ্লাস দুধ খেতে তিনি ভুলতেন না।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনও বেশ কয়েকবার কলকাতার রাজভবনে এসেছেন। তিনি শারীরিক কারণে বেশ অনেকদিন থেকেই খাওয়া-দাওয়ার বাচ-বিচার করতেন বা তাঁর পত্নী বেগম শাজানের ইচ্ছানুসারে খাওয়া-দাওয়া বাচ-বিচার করতে হতো। তিনি মোগলাই খানা অত্যন্ত ভালবাসতেন। আবার ইংরেজি খানাও খেতেন। তবে কলকাতার কাঁচা-গোল্লা জাতীয় সন্দেশ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

এ ছাড়া শ্রীমতি পদ্মজা নাইডুর সময় রাণী এলিজাবেথ ও রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সময় বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেফ-এর খাওয়া-দাওয়া দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এঁদের খাবার-দাবার পুরো ইংলিশ খানা মাফিক এবং খাবার সময়ের টাইমও ইংরেজদের মতো। অর্থাৎ সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে রাত্রের ডিনার পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা—যা ইংরেজ চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বুলগেনিন ক্রুশ্চেফের সঙ্গে যে সব পারসোনাল বা ব্যক্তিগত কর্মচারী এসেছিল তাদের সকলের প্রাণচাঞ্চল্য ও সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তারা কথার পর

চলেছে। তার কতকটা বাক্যে আর কতকটা আবার ইঙ্গিতে। এরা রাজভবনে বাংলাদেশের দই, আম ও সন্দেশ ডিসের পর ডিস খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখেছি। আখরোট, পেস্তা আর বাদামের ডিস এদের সামনে ধরতে এরা মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলছে। আর যে জিনিসটা সদা সর্বদা ঢক্ ঢক্ করে খেয়েই চলেছে সেটা রাশিয়ান ভদকা না বিয়ার তা আজও বুঝতে পারি নি।

তবে তাদের খাওয়া-দাওয়া দেখে এটুকু বুঝছি যে শক্তিশালী জাতি হতে গেলে শক্তিশালী ভিটামিন যুক্ত প্রচুর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। বেশী খেলে মানুষ মরে-এটা ভারতবাসীর মুখেই শোভা পায়। কিন্তু ইউরোপীয়নরা এ কথা শুনে বোধ হয় হাসে।

ষাটের দশকে রাণী এলিজাবেথের পার্টিতে নাকি ভারতের কোন এক প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেলের নাতি এসেছিলেন। সেই নাতি কলকাতার রাজভবনের সুবিস্তৃত বাগানে একাই আপন মনে অনেক ঘুরেছেন। হয়তো দাদুর পুরানো স্মৃতি তার মনে পড়ে যাচ্ছিল! নয়তো বা ভাবছিলেন কেন সোনার খনি ভারতবর্ষকে ইংরেজরা খামকা ছাতছাড়া করলো।

রাণী এলিজাবেথে পার্টিতে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী এসেছিল তারা বেশ কেতাদুরস্ত ফিটফাট ও গম্ভীর। ইংরেজরা সাধারণতঃ বেশ গম্ভীর প্রকৃতির হয় নিজের দেশের বাইরে—এ সব শোনা কথা বিলাত প্রত্যাগত বন্ধুদের মুখে। বাড়তি একটা কথাও বিনা প্রয়োজনে তারা বলতে চান না।

ইংরেজ চরিত্র চিত্রণে সাহিত্যিক মুজতবা আলীর বর্ণনা বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে গোটা ইউরোপ কেবলমাত্র ফরাসীরাই বাঙালীদের মতো আড্ডাবাজ, উচ্ছৃংখল্। এ-কথা ও-কথা ও বসের কথায় হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়তে জানে পশ্চিমীদের মধ্যে কেবলমাত্র ফরাসীরাই।

এলিজাবেথের সঙ্গে যে পার্টি এসেছিল তাদেরকে লক্ষ্য করেছি। খাবার সময় চলে গেলেও না ডাকলে তারা খাবার টেবিলে বসতো না। ডেকে তাদের সকলকে ডাইনিং টেবিলে আনতে হতো। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হতো কী চাই বা না চাই। তাদের আচার-আচরণে যেন সব সময়েই একটা প্রভুত্বের অলিখিত গরিমা।

এ দিক থেকে রাণী এলিজাবেথের পতি ভাগ্য যে কোনো ভারতীয় নারীর ঈর্ষার বস্তু। তাঁর স্বামী ডিউক অব এডেনবরার মতো হাস্যরসিক কৌতুকপ্রিয় কারণে অকারণে কথা বলা, আমোদ করা, এমন সম্মানীয় ব্যক্তি কলকাতার রাজভবনে বড় বেশী আসেন নি। কেবল এর সমগোত্রীয় আর একজনের নাম মনে পড়ে। তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী চো অর্থাৎ চৌ-এন-লাই। তিনিও কলকাতার রাজভবনে একবার পঞ্চাশের শেষ দশকে অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

এই ব্যক্তিটির হাস্যচঞ্চল, কৌতুকপ্রিয় ও অনর্গল কথা বলার শক্তি অপরিসীম। ইনি ও এঁর পার্টির সকলে দেখলাম কলকাতার রাজভবনে ইংরেজিথানাই বেশ

আনন্দের সঙ্গে খেয়ে গেলেন। পরে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফাটল ধরেছিল।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ বেশ কয়েকবার কলকাতার রাজভবনে এসেছেন নানা কাজ-কর্মে। বোধ হয় শেষ এসেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যেদিন মারা যান অর্থাৎ ১লা জুলাই উনিশশো বাষট্টি সালে। সেদিন কলকাতার হাইকোর্টের শতবার্ষিক উৎসব ছিল। তিনি যেমন চেহারা ও পোষাকে খাঁটি ভারতীয় ছিলেন তেমনি খাদ্যের অভ্যাসেও।

রাধাকৃষ্ণণ কট্টর নিরামিষাশী। নিরামিষভোজী স্বদেশী খানা ইডলি, দোসা, দইবড়া, রসম্ ও চালের মিষ্টি পায়েস, সব রকম তিনি খুব তৃপ্তি করে খেতেন। মাঝেমধ্যে যদিও তিনি অন্যান্য খাদ্যও কলকাতায় এসে খেতেন, তবে সবই নিরামিষ।

রাষ্ট্রপতি হবার আগেও তিনি যা খেতেন, রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি সেই রকম সাদা-সিধে চাল-চলন রেখেছিলেন। কখনও বড়লোকী আচার-ব্যবহার বা খাদ্যের অপব্যয় তিনি পছন্দ করতেন না।

কাশ্মীরের যুবরাজ করণ সিং মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় এলে এই রাজভবনেই ওঠেন। সুপুরুষ সুন্দর চেহারার করণ সিং-কে দেখলে আপনা হতেই তাঁর প্রতি আকর্ষিত হতে হয়। সুপণ্ডিত ব্যক্তি এই করণ সিং। হাসিখুশী ভরা এই ব্যক্তি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অত্যন্ত ভালবাসতেন।

খেতেও ভালবাসতেন বাংলাদেশের মজাদার খাবার। তবে ইংলিশ খানাই বেশী পছন্দ করেন। আর পছন্দ করেন বিভিন্ন প্রকারের ফল খেতে ও এই বাংলার দই মিষ্টি।

খাওয়ার শেষে গোটা দুই আপেল তিনি খাবেনই। কাশ্মীরী লোক তো। মাতৃভূমির ফল তাই তার অত্যন্ত প্রিয়।

ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি অর্থাৎ বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি কলকাতার রাজভবনে রাষ্ট্রপতি হয়েও এসেছেন ও উপ-রাষ্ট্রপতি থাকাকালীনও এসেছেন। অনেকে হয়তো জানেন না যে তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। কোনো রকম আমিষ খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন না এবং তাঁর খাবার ব্যাপারেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ন্যায় অত্যন্ত সাধাসিধে।

এখানে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা আছে যে তিনিও নিরামিশাষী; কিন্তু তিনি এর একেবারে উল্টো। তিনি কট্টর আমিষভোজী।

মাছ, মাংস, ডিম, ইংলিশ খানা তিনি সদা সর্বদার জন্য খেয়ে থাকেন এবং পছন্দ করেন। গরম কফি তাঁর চাই-ই চাই। চা বেশী পছন্দ করেন না।

এবার আসা যাক ভারতের প্রধানমন্ত্রী কবিগুরুর প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর খাবার কথার আলোচনায়। সত্যি অবাক লাগে যখন দেখি রাজভবনের এতো

অপ্রতুল খাদ্য ভাণ্ডারের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা যেন নিজে পাখীর আহার করেন। এটা কী সত্যিই তাঁর শক্তি সঞ্চয়ের উৎস না কোনো অলিখিত গুরুর দীক্ষার অঙ্গ তা আজও বুঝতে পারিনি।

পিতা জওহরলালের যেখানে তাঁর খাবার টেবিলে মহা মূল্যবান 'চিকেন রয়েল' না হলে নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো সেখানে ইন্দিরা খান 'অনস্যুপ' মানে মাছ মাংস ও বিভিন্ন ভেজিটেবল দেওয়া এক বাটি স্যুপ বা ঝোল, দু' একটা কিছু ভাজাভুজি, আর সময় সময় ভাত ডাল তরকারি সব শুদ্ধ এক সঙ্গে মেখে একদলা সামান্য আহার। ব্যস, এতেই তার সারাদিন চলে যায়। আর খুব পছন্দ করেন তিনি বাবার মতো হট্ কফি যা তিনি সব সময় ট্যুরে ফ্লাস্কে নিয়ে নেন বা নিয়ে নেন লেবুর সরবৎ। দু' একটা ফুলকো লুচি বা ঘিয়ে ভাজা মুচমুচে নিমকি তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে খান। ব্যস।

ইন্দিরা মহাত্মা গান্ধীজীর মতো শুধুমাত্র ফল খেয়েই দিনের পর দিন অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারেন—এর প্রমাণ কলকাতার রাজভবনে আছে।

এবার রাজভবনে সাধারণতঃ অতিথিদের কি কি খেতে দেওয়া হয় তার একটা খাদ্য তালিকা দিয়ে দেওয়া হলো। এই সব খাদ্যের টেবিল কার্ড বা মেনু চার্ট রাজ্যপালের নিজের যে ছাপাখানা আছে রাজভবনের পাশে লারকিন লেনে, তাতেই রোজকার রোজ ছাপা হয়।

অভ্যাগত অতিথিদের খানা টেবিলে পূর্বে এগুলি সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, অতিথিরা যাতে খেতে বসেই জানতে পারেন আজকের খাদ্য তালিকায় কী কী খাদ্য আছে ও কোন পদ তাঁরা বেছে বেছে খাবেন।

এই রকম একটি রাত্রের ডিনারের মেনু চার্ট রাজভবনের রন্ধনশালায় দেখা গেল।

আমিষ

(ক) গলদা চিংড়ীর মালাইকারী।
(খ) মটন বিরিয়ানী।
(গ) দাহি আলু।
(ঘ) ফুলকপি মটরশুঁটির তরকারী।
(ঙ) তরমুজ দেওয়া আইসক্রীম।
(চ) নানা রকমের মিষ্টি।
(ছ) কফি ও পান।

নিরামিষ

(ক) গ্রেপ ফ্রুট কক্‌টেল
(খ) ক্রীম্ অব আমন্ড স্যুপ
(গ) ম্যাকারলী প্রোটিন
(ঘ) পিলাউ ন্যান

(ঙ) স্টাফড্ ক্যাপসীকাম রায়তা
(চ) আলুর দম—মটর পনীর
(ছ) সালাড্ আচার চাটনী
(জ) দহি আলু
(ঝ) রসমালই
(ঞ) নূতন গুড়ের সন্দেশ
(ট) ফ্রুট সালাড্ এণ্ড ক্রীম্
(ঠ) ফ্রেস্ ফ্রুট
(ড) কফি
(ঢ) পান

কলকাতার রাজভবনে বিভিন্ন সম্মানীয় অতিথিদের ভোজসভার টেবিলের প্রত্যেক আসনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনের খাবারের মেনু চার্ট-এর সঙ্গে সঙ্গে সব নিমন্ত্রিত অতিথিদের নামওয়ালা তালিকা, খাদ্য আমিষ কি নিরামিষ, নিজের সীটের নাম ও অতিরিক্ত আর একটি স্লীপ যুক্ত থাকে। তাতে সাধারণতঃ নির্দেশ থাকে অতিথিদের প্রতি—After the Banquet, guests may timely proceed to the Marco Room (শ্রীমতী পদ্মজার মৃত প্রিয় কুকুরের নামে নামাঙ্কিত স্যুইট যেটা বৃটিশ আমলে রু ড্রইং রুম নাম ছিল) where Kabiguru's Chitrangada will be Staged। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমনের ভোজসভা 5th February 1972, 8 p.m.)

এই প্রসঙ্গে উনিশশো চুয়ান্ন সালের বিশে অক্টোবর রাত্রে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর তৎকালীন চীন ভ্রমণের সম্মানার্থে পিকিং-এ যে ভোজসভা দিয়েছিলেন তার স্ববিস্তার মেনু চার্ট এখানে পরিবেশিত হলো। ইহা অত্যন্ত সুদুর্লভ ও গোপনীয়। অত্যন্ত আয়াস ও কষ্টসাধ্য ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। জনৈক বিখ্যাত ভারতীয় নিমন্ত্রিতের সহৃদয় সহায়তায় পাঠকের জ্ঞাতার্থে এটা সন্নিবেশিত হল।

(১) এ্যাসরটেড হর্স ডি ইউভারস।
(২) ডাক ইন ট্রাই কলার (ত্রি-রঙা হাঁস)
(৩) এগস্ ইন ট্রাই কলার (ত্রি-রঙা ডিম)
(৪) সলটেড ফিস, শার্নাট এণ্ড লেটুস
(৫) সলটেড চিকেন উইথ গ্রীন বিন্স্।
(৬) জিবলেট ইন স্পাইস্ এণ্ড মেলাবি-ইন কোরালসস
(.) স্টাফড ওমলেট রোলস্ উইথ কিউকামবার
(৮) ফ্রাইড ফোনিক্স—টেল ফিস্ এণ্ড রেড পিপার
(৯) স্লাইস অব কিউনী এণ্ড চাইনীজ সালাড
(১০) ব্রিলড পর্ক এণ্ড বিনস্ স্কাউট্স্

(১১) চিকেন ইন পানজেনট্ স্‌স্ এণ্ড ব্রেইস্‌ড বামবো স্যুটস্ ।

(১২) এ্যামাবেণ্ড স্যুপ উইথ ফিস্ বনস্ হন্ ট্রাই কলারস এণ্ড বিনস্ লিভস্ ।

(১৩) ক্রিণ্টারস' অব পিকিং ডাক স্টাফড হ্যাম এণ্ড ওয়ালনাটস্

(১৪) স্টিমড ক্রেস্ ফিস্ ইন ব্রাউন স্‌স্

(১৫) চাইনীজ পার্সাট্রিস্ ।

(১৬) ফ্রাইড কেকস্ উইথ লীকস্

(১৭) স্পনজী কেকস্

(১৮) ডেটস্ কেকস্

(১৯) ব্যাভলী ইন ক্যারি

(২০) স্টীমড কন্‌স্ ।

(২১) ফ্রুটস্ ।

এখন কলকাতার রাজভবনে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ও২ প্রজাতন্ত্র দিবসে অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারি যে ২৭০০ শো থেকে ৩০০০ হাজার অতিথিদের চা-এর নিমন্ত্রণে আহ্বান করা হয়, তাঁরা কোলকাতার কোন্ কোন্ টপ ভি-আই-পি তা জানবার আগ্রহ থাকা সকলের স্বাভাবিক ।

এই দুটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের প্রায় মাস খানেক আগে থেকেই রাজভবনের অফিসে নির্দিষ্ট খামে নাম লিখে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠাবার ধুম-ধাড়াক্কা পড়ে যায় । সে এক এলাহি ব্যাপার । অনেকের আবার এক আধটা ফোনও আসে এই সম্মানীয় নিমন্ত্রণ লিপি পাবার জন্য । নিমন্ত্রণ প্রাপকদের তালিকা সম্প্রতি ক ।

(1) Union Ministers, West Bengal

(2) Ministers, West Bengal.

(3) Ministers of State, West Bengal

(4) Judges of High Court.

(5) Members of Rajya Sava

(6) Members of Lok Sava

(7) Members of Bidhan Sava

(8) Recipients of Civilion Awards e.g. Bharat Ratna ; Padma Bhusan etc.

(9) Members of Sahitya Academy e.g. Premendra Mitra etc.

(10) Members of Lalit Kala Academy e.g. Ostad Aminuddin Dagar ; Gyan Prakash Ghosh etc.

(11) Representative of Foreign countries e.g. High Commissioners, Ambassadors etc.

(12) Imporcant non-official e.g. Mr. Birla ; Lady Ranu Mukherjee etc

(13) Representative Political parties e.g. শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল etc.

(14) Ex. Ministers e.g প্রফুল্ল সেন, খগেন দাসগুপ্ত etc.

(15) President of Chamber of Commerce

(16) State Govt. official e.g. Commisioners, Secretary etc.

(17) India Govt. officials

(18) Defence e.g Army, Navy & Air.

(19) Public Sector undertaking e.g Central and West Bengal

(20) Education etc.

(21) Medical e.g. ডাঃ ছেত্রী, ডাঃ শিশির মুখার্জি, ডাঃ দেব।

(22) Law (Govt. Pleader).

(23) Arts and Letters e.g. শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ; শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী etc.

(24) Ecclectials e.g Arch Bishop of Calcutta etc.

(25) Press e.g. তুষারকান্তি ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত etc.

(26) Labour নীরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, মাখন পাল etc.

(27) Sports পি. কে. ব্যানার্জি, পংকজ রায় etc.

(28) Freedom Fighters তাম্রপত্র যাঁরা পেয়েছেন।

(29) Miscellaneous e.g কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাজভবনের সকল গেজেটেড অফিসারেরা etc.

একটি ভোজসভা ও কলকাতার রাজভবন

কলকাতার রাজভবনে আমার দীর্ঘ দিনের চাকুরী জীবনে লক্ষ্য করেছি কলকাতার ভেতরে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে কলকাতার রাজভবন নিয়ে নানা অরুচিপূর্ণ মন্তব্য ; নানা অশালীন কথা।

জানিনা এটা আঙুর ফল টক কিনা তার ঘটনা। না সত্যিই এই বিলাসবহুল রাজভবনগুলি আর রাখা উচিত নয় এটাই তাদের মত। এটাও সত্যি বাঙালীর এক পারসেনটু লোকেরও কলকাতা রাজভবন দেখা সম্ভব হয় নি। যেটা আমাদের দেখা উচিত, কারণ এখান থেকেই বৃটিশরা সারা ভারতবর্ষ জয় করেছিল।

এমন কি রাজভবনের যাঁরা আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী তাঁরাও এই রাজভবন নিয়ে নানা রসাল কটুক্তি করেন। কিন্তু বড় মজার কথা এই রাজভবনের কোনো অনুষ্ঠানে বা অন্য কোনো কিছু ভোজসভার একটামাত্র লাটবাড়ীর নিমন্ত্রণ পত্র পাবার জন্য সারা রাজ্যের ভি. আই. পি. থেকে মন্ত্রী, এম. এল. এ. মায় খোদ এ জি পর্যন্ত কেমন আগ্রহান্বিত হন—তার সকরুণ লোভাতুর ইতিহাস আমার জানা আছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতি বছরে ছাব্বিশে জানুয়ারি ও পনেরই অগাস্ট এই দু দিন কলকাতার রাজভবনে ২৭০০।৩০০০ অতিথি নিমন্ত্রিত হন। সেই নিমন্ত্রণলিপি পাবার জন্য এই দুটি অনুষ্ঠানের প্রায় মাসখানেক পূর্ব থেকেই রাজভবনে অনেক গণ্যমান্য লোকের অবিরত ফোন আসে—এবার তাঁকে নিমন্ত্রণে ডাকা হচ্ছে কিনা।

কারণ এই শহর কলকাতায় রোজই কিছু কিছু ভি. আই. পি. বেড়ে যাচ্ছে। নূতন গাড়ী কিনে বা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিছু কালো টাকা ঢেলে দিয়ে তিনি দাবী করেন ভি. আই. পি. বলে। কেউ বা সিনেমায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়ে নিজেকেই ভাবছেন ভি. আই. পি.। কেউ বা স্রেফ খুঁটির জোরে ভাবছেন তিনি ভি. আই. পি. ; সুতরাং সব বার সকলকে তো নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো যায় না।

এ ছাড়া আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি খোদ রাজভবনের যে সকল কর্মচারী রাজ্যপাল বা রাজভবনকে সাত সতেরো কথা বলে নিন্দা করেই চলেছেন তাদের অনেকের বাড়িতে তো প্রকাশ্যেই বা কারও কারও ফ্যামিলী এ্যালবামে বিদায়ী রাজ্যপালের দেওয়া সার্টিফিকেট, ছবি বা রাজ্যপালের বিদায়কালীন গ্রুপ ফটোগ্রাফ বেশ মর্যাদার সঙ্গে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী আমিও এটা করেছি আমার বেলায়।

এখন যা বলছিলাম ; রাজভবনে কতো রকমের যে ভোজসভা হয় তার

গোনাগুন্তি নেই। কোনটা হয়তো স্টেট ডিনার, কোনটা কোয়ায়েট ডিনার, কোনটা লাঞ্চ, কোনটা বুফে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ভোজসভায় কতো রকমের, কতো দেশ-বিদেশের যে অতিথি অভ্যাগত কতো বিভিন্ন পোশাকে যে আসেন কেবলমাত্র তাই দেখবার ব্যাপার। স্বাধীন আফ্রিকার নেতারা এলেন তাদের জাতীয় পোশাকে—সে একরকম; আবার সৌদি আরবের নেতারা এলেন তাদের জাতীয় পোশাক—সে একরকম; বার্মীশ নেতারা এলেন তাদের পোশাকে—সে একরকম; দলাই লামা, পাঞ্চেন লামা এলেন তাদের পোশাকে—সে একরকম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার ১৬ই এপ্রিল উনিশশো আশি বুধবার রাত্রে রাজ্যপাল মাননীয় টি. এন. সিং যে তিনশো জন এম. এল. এ. কে রাত্রের ডিনারে ডেকেছিলেন সেই অপূর্ব ভোজসভার বিবরণ দিচ্ছি।

এই ডিনার ছিল বুফে স্টাইলে। অর্থাৎ নিজের পছন্দমতো খাবার রাজভবনের বিখ্যাত ব্যানকোয়েট হলে নানা টেবিলে থরে থরে সাজানো আছে, যার যেটা ইচ্ছে প্লেটে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে বা চেয়ার-টেবিলে বসে খেতে পারেন। বুফে ডিনারে এক একটা খাবার এক একটা প্লেটে নেওয়াই রেওয়াজ।

সেদিন খাবার মেনু ছিল সাদা সরু চালের শিউলীর পাপড়ির মতো ভাত। দু' রকমের মাছ মাংস, রাধাবল্লভী, কালিয়া, ডাল, চাটনী, স্মোক হিলসা, দই ও কে সি দাসের মিষ্টি। সবশেষে তবক দেওয়া মিঠা পান ও কফি।

রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ন সিং এ-ডি-সির সঙ্গে রাজভবনের ইয়েলো ড্রইংরুমে ঠিক রাত্রি আটটার সময় এলেন। দু'একজন এম. এল. এ. দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কথাবার্তা বললেন। তারপর পর্দা সরিয়ে ব্যানকোয়েট হলে ঢুকলেন।

বুফে ডিনার আরম্ভ হলো···

লক্ষ্য করলাম, এই এম. এল. এ.-রা সকলেই ধুতি বা পায়জামা পরে এসেছেন, কিছু এল. এল. এ. আবার স্যুটেড বুটেড অর্থাৎ খাঁটি ইংরেজ পোশাকে অর্থাৎ কোট প্যান্ট সার্ট পরা। আবার কিছু মফঃস্বলের এম-এল-এদের কাঁধে ন্যাকড়ার ব্যাগ ঝুলছে।—আজকাল ডেলি প্যাসেনজারের কাঁধে যেটা সাধারণতঃ দেখা যায়।

এ সব এম এল. এ দের মধ্যে কিছু এম. এম. এ.-র বোধ হয় রাজভবনে এ রকম বুফে ডিনারের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁদের হাবভাব, নিজের ডিসে আহার্য জিনিস অপরিয্যাপ্ত নেওয়ার ভঙ্গি দেখে তো রাজভবনের বৃটিশ আমলের বৃদ্ধ বাবুর্চি খানসামারা মৃদু মৃদু হাসছিল।

এই সব নিমন্ত্রিত এম. এল এ.-দের মধ্যে কেউ হয়তো অপটু নিজের খাবার ডিশে সাত আটটা রসগোল্লাই তুলে নিয়েছেন ভাত ও ডালের পাশে, কেউ হয়তো নিজের ডিশে এমন পরিমাণ মাছ তুলে নিয়েছেন সামান্যমাত্র ভাতের পাশে যা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে উনি হয়তো মাছ খেয়েই জীবন কাটান, কারও প্লেটে এতোটা পরিমাণ ভাত যা দেখে মনে হচ্ছে যে এই ব্যক্তিটা ভাত যদি ফুরিয়ে যায়

তাই ভয়ে আগে-ভাগেই তাঁর এতোটা সতর্কতা। কারও কারও ডিশে আবার মাংসটাই সব, ভাত নেই বললেই চলে এবং যৎসামান্য ভাতের পাশে দই ও মিষ্টির পাহাড় যা এক্কুণি হয়তো বা প্লেট থেকে উপচিয়ে পড়ে রাজভবনের ব্যানকোয়েট হলের বৃটিশ আমলের দামী পশমী কার্পেট নষ্ট করে দেবে।

তবে এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এই বামফ্রণ্টের প্রায় সব এম. এল. এ.-রাই পশ্চিমবঙ্গের সুদূর মফঃস্বলের সাধারণ লোক। দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি। এম.এল.এ. জীবনে একদিন স্বয়ং রাজ্যপালের নিমন্ত্রণে খোদ রাজভবনে রাজ্যপালের পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে ডিনার বা লাঞ্চ খাওয়া এটা হয়তো তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের কুলপঞ্জীতে অনেক প্রেরণা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত হবে। এটা তো সত্যি কথা যে এখনও আমাদের গভর্ণর প্রীতি কমেনি। তবে সবার ক্ষেত্রে একথা আমি বলছি না।

আর এটাও তো একশো ভাগ সত্য যে বৃটিশ আমলে এ দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদারেরা এ রকম একটা ডিনার বৃটিশ লাটদের সঙ্গে রাজভবনে খাওয়ার জন্য কতো হাজারে হাজারে লাখে লাখে টাকা ব্যয় করেছে—শুধু মাত্র এই ভোজের দৌলতে তার সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে রায় সাহেব বা রায় বাহাদুর পদবী পাওয়ার জন্য।

আমি নিজেই দেখেছি বৃটিশ আমলে আমার নিজের শহরের একজন ক্ষুদে জমিদার শ্রেণীর চাটুজ্যে মশায় "রায় বাহাদুর" পদবী পাবার জন্য টিন টিন ভর্তি বহরমপুরের বিখ্যাত ছানাবড়া ভেট হিসেবে প্রায়ই পাঠাতেন সাদা চামড়ার শহরের বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে তথা কলকাতার লাটবাড়িতে। এছাড়াও ছিল আমের সময় আম এবং অবসরকালীন বৃটিশ ডিভিশ্যানাল কমিশনারের লণ্ডনের বাড়ীতে পার্শেল করে মুর্শিদাবাদের জাত মিষ্টি আমের আমসত্ত্ব।

শেষ বস্তুটা যদিও ডিভিশ্যানাল কমিশনারের ব্যক্তিগত রিকোয়েস্ট বা অনুরোধে পাঠানো হয়েছিল বলে আমাকে ওনাদের স্টেটের বুড়ো নায়েব বাড়ুজ্জে মশায় সহাস্যে বলেছিলেন। জানিনা কথাটা কত দূর সত্য। হয়তো বা হতেও পারে। কারণ এর পরেই তাঁর আম বাগানের মধ্য দিয়ে তখনকার দিনে বহরমপুরের রেল লাইন পাতা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার কুকুর ও কলকাতার রাজভবন

এই সংসারে সচরাচর কিছু লোকের হামেশাই দেখা মেলে যাঁরা এমনিতে খুব চালাক-চতুর কিন্তু জীবনের সাফল্যের হিসাবের সালতামামিতে দেখা যায় একেবারে সকলের পিছে পড়ে গেছেন। জীবনে কিছু করে উঠতে পারেন নি।

রাজভবনের বৃটিশ আমলের খাশ রাজকর্মচারী মিঃ খামারু ওরফে গোপীমোহন খামারু অনেকটা প্রায় ঐ রকম ছিলেন। তিনি কথাবার্তা চাল-চলনে যেমন ছিলেন বৃটিশ কেতাদুরুস্ত, বলিয়েও ছিলেন তেমনি। কথায় অকথায় তিনি রাজভবনের অতিথি অভ্যাগতদের ফাঁক পেলেই শুনিয়ে দিতেন—আমি মশায় সেই ইংরেজ আমলের লোক। সাত সাতটা লাট পার করেছি। এই ধরুন লাট স্যার জন এনডারসনের সময়ে ষোলো বছর বয়সে এই লাটবাড়ীতে কাজে ঢুকেছি। এখন আমার বয়স ছাপ্পান্ন। আর বছর দুই পরেই রিটায়ার করবো। সে সব যুগ গেছে লালমুখোদের আমলে কলকাতায় রাজভবনে সোনার যুগ। আর এখন কাউকে কিছু কাজ দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

তবু সেণ্টারে আছে মিঃ নেহেরু আর আমি মিঃ খামারু পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে এখনও টিকে রয়েছি বলে তাও দেশটা চলছে। নচেৎ জাহান্নামে যেতে এ দেশের আর কতো দেরী হতো।

শেষের কথাগুলি যদিও মিঃ খামারু অত্যন্ত সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চাপা গলায় আওড়াতেন। কারণ কোনো রকমে যদি খোদ লাটের কানে মিঃ খামারুর এই কথাগুলি নানা রকমে পল্লবিত হয়ে কানে পৌঁছায় তবে নির্ঘাত তার গর্দান যাবে। নচেৎ অন্তত চাকরী থেকে ছুটি।

আমি যখন রাজভবনে চাকুরীতে ঢুকি তখন মিঃ খামারুকে প্রথম দিন দেখেই তাঁর প্রতি কেন জানি না একটা আকর্ষণে পড়ে যাই। অর্থাৎ কিনা মিঃ খামারুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অনুভব করি। যাকে নাকি কিছুতে প্রতিরোধ করা যায় না।

আমার কেন জানিনা রাজভবনের অন্যান্য সব কর্মচারীকেই দেখলেই মনে হতো মেকানিক্যাল—যান্ত্রিক কলের পুতুলের মতো। খালি স্বাতন্ত্র্য ছিল এই বৃদ্ধ গোপীমোহন খামারুর মধ্যে। তিনি দেখতাম সেই বৃটিশ আমলের কায়দা মাফিক ঢোলা ঢোলা প্যাণ্ট কোট গায় ওয়েস্ট কোট পরে হাতে একটা রঙিন ছোট্ট নোটবুক নিয়ে রাজভবনের এধারে ওধারে ছুটছেন।

দেখা হলেই কারুর সঙ্গে অতি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গুড মর্ণিং ইত্যাদি বলেই আবার হন্তদন্ত হয়ে দে ছুট। লাট সাহেব নাকি তাঁকে ডাকছেন···কিন্তু পরে জেনেছি ওসব বাজে কথা। নিজের দাম বাড়ানো।

মিঃ খামারু লাটবাড়ীর ফার্ণিচার সুপার ভাইজার ছিলেন অর্থাৎ লাটবাড়ীতে যত কিছু দামী দামী কার্পেট, ডিভান, সিংহাসন, ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি আছে সে সবের ভার সবই তাঁর ওপর ন্যস্ত। লাটবাড়ীতে ভোজ বলো, পার্টি বলো, ডিনার বলো ও ব্যানকোয়েট বলো সব কিছুর সাজাবার বা বসবার এ্যারেনজমেণ্টের ভার মিঃ খামারুর ওপর। এই সামান্য টেক্‌নিক্যাল কাজের জন্য মিঃ খামারুর রাজভবনে বেশ প্রতিপত্তি ছিল। স্বয়ং লাট সাহেবও তাঁকে বেশ পছন্দ করতেন।

তা ছাড়া তাঁর আর একটা জিনিস ছিল সেটা এক মাথা ভর্তি পক্ককেশ। শুভ্র শাদা শোনের মতো চুল। যেটা সকলের আগেই সব লোকের চোখে পড়তো। আর এই চুল মিঃ খামারুর ভাষায় রোদে পাকে নি, বয়সের ভারে নিজ অভিজ্ঞতায় পেকেছে। পেকেছে নিজ কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদনে।—এসব কথা মিঃ গোপীমোহন খামারু সকলকেই ডেকে ডেকে বলতেন।

সে যাই হোক, মিঃ খামারু অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা এঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মিঃ খামারুকে আমি নিজে স্বচক্ষে দেখেছি শ্রীমতী পদ্মজাকে বৃটিশ কায়দায় হাঁটু গেড়ে অভিবাদন করতে। যদিও উনি সকল লাটকেই নাকি এমনিভাবে অভিবাদন করে এসেছেন। এটাই নাকি রীতি। বৃটিশ আমলের কায়দা। আমরা হাসি তামাসা করলে উনি তাই বলতেন এ সব বিষয়ে।

যখনকার কথা বলছি তখন বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ঃ শ্রীমতী পদ্মজার কুকুর প্রীতি কেবলমাত্র পশ্চিবাংলায়ই নয়, সারা ভারতের অভিজাত মহলে সুপরিচিত। তিনি যখন বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন অর্থাৎ তেসরা নভেম্বর উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে সাতই অগস্ট উনিশশো সাতষট্টি সাল পর্যন্ত তখন কলকাতার রাজভবনে তাঁর নিজের চার পাঁচটি সাদা ধবধবে এ্যালশেসিয়ান কুকুর ছিল। সে রকম দামী সাদা এ্যালশেসিয়ান কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই নয় সারা ভারতবর্ষে সুদুর্লভ। রাজভবনের চারপাশে বিকেলবেলায় ময়দানে এদেরকে ঘুরতে অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন।

এই কুকুরগুলির মধ্যমণি ছিল মারকো পোলো। যাকে শ্রীমতী পদ্মজা মারকো বলে ডাকতেন। এ ছাড়া ছিল পুপকলী, গীতা, শ্যামা, জীবু প্রভৃতি। মারকোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজবভনের ব্লু ড্রইং রুমের নাম মারকো সুইট রাখেন শ্রীমতী পদ্মজা নিজেই। এ ছাড়া তাঁর দামী একটা শ্যামদেশীয় বিড়াল ছিল। নাম জিয়া-থাই।

আর ছিল তাঁর দুটি বাঘের বাচ্চা। অমর ও রাজা। ক্রুশ্চেফ ও বুলগেনিন উনিশশো ষাট সালে এ দুটি রাশিয়ান উষরী বাঘের বাচ্চা শ্রীমতি পদ্মজাকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। পদ্মজার নিজের নাম দেওয়া বাঘ দুটিকে প্রথমে কলকাতার চিড়িয়াখানায় ও পরে অত্যন্ত গরমের জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতার চিড়িয়াখানা থেকে দু' একটা জীবজন্তু, দার্জিলিং-এর জঙ্গলে ধরা দু' একটা কালো ভল্লুক ও এই উষরী বাঘ শাবক

দুটি নিয়ে খোলা হয়েছিল দার্জিলিং-এর নতুন চিড়িয়াখানা। এখন ও তাদের প্রজাতি বর্তমান সেখানে।

বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা রাজভবনে রুটিন মাফিক বছরে দু'বার দার্জিলিং পরিভ্রমণে যেতেন—এপ্রিল ও অক্টোবরে।

পদ্মজা প্রতিবার দার্জিলিং গিয়েই অন্যান্য ভি. আই. পি. সাক্ষাতের মতো 'অমর ও রাজার' সঙ্গে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখা করতেন। সে এক অভিনব দৃশ্য। দুটি রুপোর বড় থালায় থাকে মাংস। আর থাকে দুটি সদ্য গাঁথা পাহাড়ী লাল জবা ফুলের মালা। শ্রীমতী পদ্মজা সদলবলে এসে বাঘের খাঁচার সামনে চেয়ারে গিয়ে বসেন, নেপালী দারোয়ান মিঃ থাপা যিনি ছেলেবেলা থেকে দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানার বাঘ দুটিকে পরিচর্যা করছেন তিনি মাংস শুদ্ধ রুপোর থালা দুটি ও জবার মালা দুটি নিয়ে বাঘের খাঁচার মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েন আর বাঘ দুটো লোহার শিক দিয়ে ঘেরা দুর্গম পাহাড়ের ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে শ্রীমতী পদ্মজার খুব কাছে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর থালা থেকে কাঁচা মাংস খেতে থাকে। মিঃ থাপা খাঁচার মধ্যে আস্তে আস্তে জবা ফুলের মালা দুটি অমর ও রাজার গলায় পরিয়ে দেয়।

একবার চিড়িয়াখানার কর্মী মিঃ পি থাপাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমার ভয় করে না ঐ রকম দুর্দান্ত বাঘের মুখের কাছে যেতে। থাপা হেসে উত্তর দিয়েছিল—স্যার, মানুষই সংসারে বেইমান হয়। লেকীন বনের জানোয়ারকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে তারা কখনও বেইমান হয় না। কথাগুলি শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—কী বলে লোকটা।

রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর প্রিয় এ্যালশেসিয়ান কুকুর মারকো পোলো ও প্রিয় বিড়াল জিয়া-থাই-এর সমাধি রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আকাশবাণী ভবনের দিকে যেখানে দেওয়া হয়েচে সেটা দীর্ঘ পাম ও নারকেল গাছ বেষ্টিত পুষ্করিণীর পাশে ছায়া সুশীতল সুন্দর পরিবেশে।

একজন বৃটিশ সুন্দরী মহিলা কলকাতার রাজভবনে বেড়াতে এসে এই সুন্দর নির্জন সমাধি স্থানটি দেখে আক্ষেপে ভেঙে পড়েছিলেন—আমার মৃত্যুর পর যদি কেউ আশ্বাস দেয় যে আমার সমাধি রচনা হবে কলকাতার রাজভবনের এ রকম সুন্দর ছায়শীতল পরিবেশে তবে এক্ষুণি আমি সানন্দে মরতে রাজি আছি।

প্রিয় কুকুর মারকো পোলোর সমাধির ওপর লেখা আছে—

Marco Polo
of
The golden threshold
Dear companion for a decade
Born Hyderabad 9th Oct. 1952.
Died Calcutta 4th Dec. 1962.

"In my heart
I shall remember always
I know you, O, beautiful and wise".

শ্রীমতী পদ্মজার নিজস্ব রচনা এই কবিতা কণা।

তাঁর বিড়াল জিয়া-থাই-এর সমাধির উপর লেখা আছে ঃ—

Zia-Thai
Born October 1956
Died October 1965

শ্রীমতী পদ্মজার কুকুর মারকো পোলোর মৃত্যুতে চৌঠা ডিসেম্বর উনিশশো বাষট্টিসালে আমরা রাজভবনের কর্মচারীরা যে হাফ-হলিডে পেয়েছিলাম সে স্মৃতি এখনো কৌতুকাবহ হয়ে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

রাজ্যপাল পদ্মজার কুকুরগুলি ও শ্যামদেশীয় বিড়ালটি দেখাশোনার জন্য ও ঠিক ঠিক সময়ে খাওয়ানো-দাওয়ানোর জন্য শান্ত কৃপাল নামে একজন ঔরাঙ্গাবাদ জেলার চাকর ছিল। পদ্মজা কুকুরগুলিকে এমন ভালবাসতেন যে কুকুরের প্রকৃত নাম না ধরে কুকুর বলে কেউ সম্বোধন করতে উনি ভীষণ চটে যেতেন—বলতেন, ওদের সব সুন্দর সুন্দর আলাদা নাম আছে তাই বলে ডাকুন।

একবার হয়েছে কি শ্রীমতী পদ্মজা রাজভবনের লিফটম্যান উদয় পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লিফটের ভেতর কিসের আঁচড়ের দাগ। যেই লিফটম্যান বলেছে, ম্যাম, ওগুলি আপনার কুকুরের আঁচড়ের ফলে হয়েছে, আর যায় কোথায়! শ্রীমতী পদ্মজা বললেন, তুমি আমার কুকুরের নাম জানো না। যাও, কাল থেকে তুমি আমার ওই রাজ্যপালের খাশ লিফটে থাকবে না।

সত্যি তার পরদিন থেকে উদয় পাণ্ডার অন্য লিফটে ডিউটি পড়লো।

পদ্মজার কুকুরগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বজ্যেষ্ঠ-মারকো যেদিন মারা যায় সেদিন সমগ্র রাজভবনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে। কার্পেটের টুকরো কেটে, সদ্য কেনা তুলো বিছিয়ে চতুর্দোলায় কাঁধে চড়িয়ে মারকোকে রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছায়া শীতল ছোট্ট পুকুরের পাড়ে শ্রীমতী পদ্মজার সম্মুখে তাঁর অশ্রুসজল চাপা কান্নার মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়।

সে এক এলাহি কাণ্ড। রাজভবনের প্রায় সকল কর্মচারীর চোখেই জল। অন্ততঃ কুকুরের মৃতদেহ যে নব নির্মিত সুন্দর লাল রং-এর চতুর্দোলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার বাহকবৃন্দের। দু' চারটি ঘন ঘন টেলিফোনও এলো রাজভবনে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজাকে শোক ভুলাবার জন্য। এবং সে সব টেলিফোন কলকাতার যে সে হেজিপেঁজি লোকের কাছ থেকে নয়, বেশ হোমরা-চোমরা ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে।

শুনেছি বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে কলকাতার বহু বিত্তশালীদের বিড়ালের বিয়েতে লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার সংবাদে খাস বিলাতে বেশ হাসি-তামাসা, ঠাট্টা-

কৌতুক হতো। এটাও কিন্তু অনেকটা ঐ রকম। তবু বলতে বাধা নেই কুকুর মানুষের অত্যন্ত স্নেহস্পর্শ জীব। উপকারও করে অনেক। অতন্ত প্রভুভক্ত অন্ততঃ বিড়ালের চেয়ে।

যাই হোক আগেই বলেছি রাজভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আকাশবাণীর দিকে যেখানে সুন্দর পুকুরের পাড়ে ছায়া সুনিবিড় বিদেশী কতকগুলি লম্বা পাম গাছ ও কেরেলিয়ান নারকেল গাছের ঝোপ আছে, সেখানে শ্রীমতী পদ্মজার প্রিয় কুকুর মারকোর সমাধি দেওয়া হল। এখনও কোন উৎসুক রাজভবন দর্শনার্থী রাজভবনে এলে ঐ সমাধি অশেষ কৌতুহল নিয়ে দেখতে যান। ঐ সমাধির ওপর শ্বেত পাথরে শ্রীমতী পদ্মজার নিজের রচিত কবিতা কণা খোদিত আছে পূর্বেই বলেছি।

শ্রীমতী সরোজিনী দুহিতা শ্রীমতী পদ্মজাও যে মন মেজাজে কাব্যিক প্রকৃতির ছিলেন ও অশেষ সৌন্দর্যপিপাসু ছিলেন তার অনেক পরিচয় রাজভবনের বহু অন্তরঙ্গ কর্মী জানেন।

আগেই লিখেছি শ্রীমতীর প্রিয় কুকুর মারকো মারা যাওয়ায় আমাদের রাজভবনের অফিস বেলা দুটোয় ছুটি হয়ে গেলো তদানীন্তন সেক্রেটারীর আদেশ বলে। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এই খবর শুনে আজও হাসিতে ফেটে পড়ে মাঝে মাঝে।

শ্রীবিদুৎ চ্যাটার্জী বলে একজন রাজভবনের গার্ডেন সুপার ইনটেনডেন্টকে চোখে রুমাল দিয়ে সজল নয়নে মারকোর শবযাত্রায় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার সম্মুখে আমি কাঁদতে দেখেছি। পরে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেছেন—মশায় গরজ বড় বালাই। রিটায়ার করবো শীঘ্রই। এক্সটেনসন নিতে হবে রাজ্যপালের কাছে। আপনি তো দু' দিন চাকরীতে ঢুকেছেন। শুনেছি বহরমপুরে বেশ জমিজমাও আছে। ক্রমে ক্রমে কাঁধের কম্বল ভিজুক, বুঝতে পারবেন—কতো ধানে কতো চাল।

যাই হোক, সাতই জুন উনিশশে একষট্টিতে শ্রীমতী পদ্মজা দু' মাসের ছুটিতে বিলাতে বেড়াতে গেলেন। তদানীন্তন বৃটেনের হাই কমিশনার শ্রীমতী পদ্মজার আবাল্য বন্ধু পণ্ডিত বিজয়লক্ষ্মী তখন লণ্ডনে। তখন হঠাৎ শ্রীমতী পদ্মজার আর একটি কুকুর মারা যায়। মনিবহীন সেই মৃত কুকুরটিকে ল্যাজে দড়ি বেঁধে রাজভবনের মাঠের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে যেখানে মারকোর সমাধি আছে তার পাশে সমাধি দেওয়া হয়।

তার মৃতদেহ চতুর্দোলায়ও নিয়ে যাওয়া হয়নি আর রাজভবনের কোন কর্মচারীও শোক মিছিল করে নি। একেই বলে ভবিতব্য। রাজ্যপাল পদ্মজা নেই এখন তার কুকুরকে কে সম্মান দেখাবে? ক তার মৃতদেহ কাঁধে বইবে? কে পদ্মজাকে দেখিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে পূর্বের মতো বলবে—ম্যাম, মারকো ইজ গোয়িং, মারকো ইজ নো মোর। যদিও নিয়মমাফিক বিলাতে শ্রীমতী পদ্মজার কাছে তাঁর এই কুকুরের মৃত্যু সংবাদ সেদিনই পাঠানো হয়েছিল টেলেক্সে।

এখন আসা যাক মিঃ থামারু রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার অন্যতম সুন্দরী

এ্যালশেসিয়ান রূপকেলীর বাচ্চা কী করে বাগালেন ও ঐ দামী এ্যালশেসিয়ানের বাচ্চার শেষ পরিণতিই বা কী হলো তারই সকৌতুক ইতিহাসে।

আজ এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো ছেষট্টি সাল। শ্রীমতী পদ্মজার সুন্দরী এ্যালশেসিয়ান রূপকেলীর আজ বাচ্চা হবে। সারা রাজভবনে হুলস্থূল। দামী কার্পেট কেটে কেটে টুকরো করা হচ্ছে। রাশি রাশি নূতন তুলো বাজার থেকে আনা হয়েছে। কলকাতার ভেটেনারী কলেজের ডাক্তাররা ঠায় গালে হাত দিয়ে রূপকেলীর পাশে বসে আছেন। রাজ্যপাল পদ্মজা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছেন প্রসবে যেন কোন কষ্ট বা গাফিলতি না হয়।

রূপকেলীর বাচ্চা হলো চারটি। গভর্ণরের কাছে খবর গেলো। পদ্মজা দেখতে এলেন। রাজভবনের কর্মচারী ম্যার ডাক্তারবাবুরা শুদ্ধ সবাই রাজ্যপাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পদ্মজা ভেটেনারী ডাক্তার কুলের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কারণ একটি বাচ্চা হয়েছে মৃত। তাঁর অভিমত ডাক্তারদের গাফিলতির জন্যেই একটি বাচ্চা মারা গেল। ডাক্তাররা নিরুপায় হয়ে নিরুত্তরে দাড়িয়ে রইল। লাটকে কীই বা বলবার আছে তাদের।

পরের দিন রাজভবনে পদ্মজার কাছে ঘন ঘন টেলিফোন আসতে লাগল কুকুরের বাচ্চার চাহিদায়। সঙ্গে সঙ্গে সে সব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা তাঁদের সৌজন্যমূলক গভীর উদ্বেগ অবসানের কথাও তাঁরা টেলিফোনে শ্রীমতী পদ্মজাকে জানাতে ভুললেন না।

কুকুরের বাচ্চার চাহিদার লিষ্টে নাম উঠলো কুচবিহারের মহারাজার, সিকিমের তদানীন্তন চোগিয়ালের, বর্ধমানের মহারাণীর, রাজভবনের ডেপুটি সেক্রেটারীর ইত্যাদি। কোনো সাধারণ হেজিপেজী লোক কী আর রাজ্যপালের এ্যালশেসিয়ানের খরচ বহন করতে সক্ষম হলেই স্বয়ং লাটের কাছে এ্যালশেসিয়ানের বাচ্চা চাইবার সাহস ধরে।

কিন্তু সে অঘটনও ঘটলো। রাজভবনের তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কর্মচারী মিঃ খামারু পদ্মজার কাছে একটি নতুন বাচ্চা চাইলেন। এই গোপীনাথ খামারু পদ্মজার ব্যক্তিগত অনেক কাজ করেন আর রাজভবনের এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকেও পদ্মজা অত্যন্ত ভালবাসতেন। সেই বৃটিশ আমলের কোন কালে মিঃ খামারু রাজভবনে ঢুকেছিলেন আর এই সেদিন তিনি নিজের ছেলেকে রাজভবনে ঢুকিয়ে নিজে রিটায়ার করেছেন।

শ্রীমতী পদ্মজা স্বাস্থ্যের কারণে রাজ্যপালের পদ ছেড়ে দিল্লী চলে যাচ্ছেন তাই তিনি খামারুকে একটি বাচ্চা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও তিনি মিঃ খামারুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এ্যালশেসিয়ান পোষার খরচ অনেক। তাঁর কুকুরের যেন কোনো রকম অবহেলা না হয়। সকালে কলকাতার ধনী গণ্যমান্য লোকেরা গাড়ী চড়ে এসে রাজভবন থেকে যে যার কুকুরের বাচ্চা নিয়ে গেলো।

মিঃ গোপীনাথ খামারুও বহু তোড়জোড় করে তার বরাদ্দ এ্যালশেসিয়ানের বাচ্চাটা প্রথমে আমাদের অফিসে ও পরে যত্ন সহকারে স্ফীত বক্ষে তাঁর গ্রামের বাড়ী ডায়মণ্ডহারবারে নিয়ে উঠলেন।

মানুষের ভাগ্যের মতো কুকুরও যে নিজের ভাগ্য দ্বারা পরিচালিত হয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল।

আমরা মিঃ খামারুর সহকর্মীরা অফিসে বলাবলি করতে লাগলাম কুকুরটির দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে। নতুন বাচ্চার সব কটিই ঠাঁই পেল রাজা-মহারাজার ঘরে আর মিঃ খামারু নিয়ে তুললেন তার গ্রামের খড়ের বৈঠকখানায় ঐ বাচ্চাদেরই একটি সুন্দরী বোনকে।

কুকুরের জীবনপঞ্জীতেও কপাল লিখনই বড় হয়ে উঠলো।

যথারীতি মিঃ খামারু কুকুর বাচ্চাটিকে গ্রামে সহজলভ্য মুড়ি ও দুধ খাইয়ে বড় করতে লাগলেন। কিন্তু এ্যালশেসিয়ানের শরীরের যে সহজাত বাড় তা রোধ করবে কে?

ঐ অঞ্চলের বি. ডি. ও. শ্রীযুক্ত এস কে মুখার্জী কুকুর চিনতেন। তাঁর নিজের দু' একটি কুকুর ছিল। তিনি মিঃ খামারুকে বললেন—আপনার কাছে এ কুকুর বাঁচবে না। এ কুকুরের খরচ অনেক। ঠাণ্ডা দই, মাংসের স্যুপ, কাঁচা মাংস এর রোজ প্রয়োজন। মাসে এর পেছনে প্রায় দু' আড়াই শো টাকা খরচ। আপনি পারবেন না। আমাকে দিয়ে দিন।

প্রথমে মিঃ খামারু তার যুক্তি মানলেন না। মিঃ খামারু কিছুতেই কুকুর ছাড়তে রাজী নন। পরে আমরাই সহকর্মীরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের বি. ডি. ও. কে কুকুর বাচ্চাটা দেওয়ালাম।

লটারিতে মানুষের ভাগ্য রাতারাতি বদলায়। কুকুরের ভাগ্যও আমাদের শুভেচ্ছায় হয়তো কিছুটা বদলালো।

* * *

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা একটি এ্যালশেসিয়ানের নাম রেখেছিলেন গীতা। দেখতে একেবারে সাদা ধবধবে। অত্যন্ত সুন্দর। এ্যালশেসিয়ানের জাতিকুলে এমন সাদা রং মেলা ভার। একদিন হলো কী রাজভবনের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ প্রবোধ ঘোষ শ্রীমতী পদ্মজার কাছে কাজের কিছু নির্দেশ নিজের নোট বুকে লিখে নিচ্ছেন, হঠাৎ তার হাতের কলমটা মেঝেতে পড়ে গেলো। রাজ্যপাল পদ্মজার কাছেই ছিল এ্যালশেসিয়ান গীতা বসে। যেমনি মিঃ ঘোষ কলমটি মেঝে থেকে উঠিয়ে নিতে যাবে অমনি গীতা এসে মিঃ ঘোষের ডান হাত কামড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কলম তার হাত থেকে মেঝেতে গেল পড়ে। রক্ত ঝর ঝর করে তার হাত থেকে পড়তে লাগলো।

শ্রীমতী পদ্মজা মৃদু হেসে গীতাকে ধমক দিলেন। এ্যালশেসিয়ান গীতা

প্রবোধ ঘোষ-এর কামড়ানো হাত দিল ছেড়ে। মিঃ ঘোষের হাত কুকুরের কামড়ে দারুণ জ্বালা করতে লাগলো।

রাজ্যপাল পদ্মজা সামান্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আমার গীতার সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক করে নিন মিঃ ঘোষ।

কুকুর গীতা পদ্মজার নির্দেশে সম্মুখের ডান পা এগিয়ে দিল আর মিঃ প্রবোধ ঘোষ তাঁর কামড়ানো রক্তঝরা ডান হাত দিয়ে কুকুরের পায়ের সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক করলেন আর অফিসে ফিরে এসে রাজভবনের হাসপাতালে ডাঃ রায় চৌধুরীর কাছে যাবার আগে সদর্পে শাসিয়ে গেলেন—আজই আমি চাকরীতে রেজিগ্‌নেশন দিমু। যত সব বাড়াবাড়ি। আমাগো জীবনে আর এসব হীনতা সহ্য হয় না। কুকুরের ঠ্যাং-এর সঙ্গে মনুর ডাইন হাউতের হ্যাণ্ডসেক। যতো সব আলগা কথা—ফাসলামি। হুঃ।

মিঃ প্রবোধ ঘোষ ছিলেন খাঁটি ঢাকাই বাঙাল।

কলকাতার রাজভবন

কলকাতা রাজভবন রাজভবনই আছে। সেই রাজকীয় জাঁক-জমক, জৌলুষ, রাজা-রাজড়ার আসা-যাওয়া, পদস্থ রাজ অমাত্যের থাকা-খাওয়া এ সবই আগের মতই আছে। তার সঙ্গে আছে লোক-লস্করের চাকর-বাকরের বিরাট এক বাহিনী।

চৌত্রিশ বছর পূর্বে স্বাধীনতার বিপ্লব-উল্লাসে লোকে ভেবেছিল কলকাতার রাজভবন বোধহয় গণভবন বা প্রজাতন্ত্রভবন বা লোকভবন হবে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাধীনতার বিপ্লবের ধরতাই বুলি মিলিয়ে গেল। শুধু পূর্বের মতই রাজভবনের স্তম্ভে পায়রার বাসার মত থেকে গেল উল্লাস আর বিলাসের ঘনঘটাপূর্ণ আড়ম্বর।...

তবু কলকাতার রাজভবন নয়নাভিরাম। প্রায় একশো বিঘা জমির ওপর ফুলের গালিচা-ঘেরা উননব্বইটি ঘরের রাজপ্রসাদ। বাইশ ফুট উঁচু ও প্রায় ছাব্বিশ ফুট চওড়া এই সব এক ঘর থেকে বেরিয়ে আর এক সুনির্দিষ্ট কোন ঘরে যাওয়া যে কোনো নূতনলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্য।

বিশাল বিশাল ষোলো ফুটওয়ালা আসল বার্মাটিকের দরজাগুলি সুন্দর, কারুকার্য-মণ্ডিত। কারুকার্য যে কোন সুশালীন দেশের পক্ষেই গর্বের বস্তু। পুরনো কালের দরজার ওপর খিলানগুলির বা কি সুষমা। দেয়ালে ঘরের সিলিং-এ কত রকমের যে নক্সা করা তার ইয়ত্তা নেই। কোথায়ও প্রস্ফুটিত পদ্মের স্বর্গীয় সুষমা, কোথাও বা সুপুষ্ট দ্রাক্ষাকুঞ্জের লতানে বিলাস।

কোথাও সুন্দর তরুলতার সঙ্গে সুপুষ্ট ফলের মনোহারী কলকা, কোথাও সুন্দর সুন্দর পাতার বাহার, কোথাও প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা। সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-শোভিত দেওয়াল ও ঘরের শিলিং। সব কিছু সূক্ষ্ম শিল্পীসুলভ কারুকার্যময়। দুশো বছরের অজানা অনামী দরিদ্র শিল্পীদের নানা ভাবনার সোনার ফসল।

মেন রাজভবনের বিল্ডিং-এর চূড়ায় যে বিশাল গম্বুজ যা কলকাতার বহু দূর থেকে দেখা যায় তা খাঁটি ইস্পাতের চাদর দিয়ে তৈরী সেই বৃটিশ আমল থেকে। তার ওপর রূপালী রং-এর বাহার। কলকাতার চাঁদনী রাতে রাজভবনের সৌন্দর্যের এটি একটি 'বিউটি স্পট'—লাস্যময়ী সুন্দরী যুবতীর মুখাবয়বের বাঁ গালে সযত্নে অংকিত কুমকুমের ফোঁটা। হয়তো বা ময়দানের অপর পারে শ্বেত শুভ্র ভিক্টোরিয়ার গম্বুজের সঙ্গে চাঁদনী রাতে রাজভবনের রূপালী গম্বুজের নিরালায় হয় বৃটিশ আমলের স্মৃতি রোমন্থন—যেন ফেলে-আসা কতো দিনের খাশ বৃটিশ ললনাদের রাজভবনের প্রেম বিরহ গাঁথা।

এই রূপালী গম্বুজের ওপর পত্‌পত করে সারাক্ষণ ওড়ে রাজ্যপালের নিজস্ব

গেরুয়া রংএর পতাকা। রাজ্যপাল স্বয়ং কলকাতায় না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে এই পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। এটাই ভারতীয় সংবিধান।

পতাকা নামানো উঠানোর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের জন্য রাজভবনের সেই বৃটিশ আমল থেকে মাইনে করা সরকারি ফ্ল্যাগম্যান আছে। রাজভবনের নেপালী শিং লামা এই কাজ করে করে বুড়ো হতে বসেছে।

তবে এখানে বলা দরকার, ষাট দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন রাজ্যপালের নিজস্ব গেরুয়া পতাকার বদলে এখন অশোক চক্র মার্কা জাতীয় পতাকা সে স্থান দখল করেছে। এর ও একটা বিতর্কিত ইতিহাস আছে। সেটা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

লর্ড কার্জন থেকে মহাত্মা গান্ধী, রাণী এলিজাবেথ, বুলগেনিন, ক্রুশ্চেফ, মার্শাল টিটো, কর্ণেল নাসের, চৌ-এন-লাই, হো-চি-মিন, ভরোশিলভ, মিঃ ভুট্টো, দালাই লামা, পাঞ্চেন লামা প্রভৃতিরা এখানে কোনো না কোনো সময়ে পদার্পণ করে সকলেই বাংলার এই সুন্দর রাজভবনটির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন।

বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অনেক সুন্দর দুষ্প্রাপ্য জিনিস, বহু রাজপ্রাসাদ দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মতে বাংলার এই রাজভবনের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই—এটা রাণী এলিজাবেথের উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে কলকাতা রাজভবনের থ্রোন রুমে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত উক্তি।

আটারোশো পাঁচ খৃীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলীর হাতে তৈরী এই লাটভবন বাড়ীটির পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি মিঃ ক্যাপ্টেন ওয়াট তাঁর সঠিক বংশপঞ্জী জানিনে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রশংসা করি অপরূপ সৌন্দর্যবোধের জন্য। যেমন প্রশংসা করি পৃথিবীর বিখ্যাত তাজমহলের অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য এর স্থপতি ওস্তাদ মুশাকে সম্রাট শাহজাহানের চেয়েও। হয়তো বা স্থপতি ওস্তাদ্ মুশার মনের কান্নাই রূপ পেয়েছে তাজমহলে। কারণ জনশ্রুতি আছে, দোসরা তাজমহল আর যাতে পৃথিবীর বুক না নির্মিত হয় তার জন্য তাজমহল গড়া শেষ হলেই ওস্তাদ মুশাকে মেরে ফেলা হয়।

প্রায় একশো বিঘে জমির ওপর অবস্থিত প্রায় উননব্বইটি বৃহৎ কামরাবিশিষ্ট যে রাজভবন আজ বাংলার মানুষের আনন্দের ও ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে ১৭৯৮—১৮০৫ খৃীস্টাব্দে ফিরে যেতে হয়।

তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী এই বিশাল রাজভবন ৬৬,১৫০ পাউণ্ডে অর্থাৎ ১১,৯০,৭০০ টাকা ব্যয়ে দীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রমে তৈরী করান।

এর পূর্বে রাজভবনের বর্তমান প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছোট্ট একটি বাড়ী থেকে বড়লাটেরা সমগ্র ভারতের রাজ্যশাসন করতেন।

প্রসংগত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১১ খৃীষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান লাটবাড়ীতে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হতো ভাইসরয়। আর ছোটলাট বা লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর

থাকতেন আলীপুরের বেলভেডিয়ার প্যালেসে যা এখন ন্যাশনাল লণ্ডনের ব্রিটিশ হয়েছে।

বর্তমান রাজভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেই ছোট্ট বাড়ীটির তখন নাম বিলাত 'বাকিংহাম হাউস'। সেটা ছিল ভাড়া বাড়ী। নবাব দিলওয়ার জং-এর কাছ থেকে ভার থেকে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর লর্ড ওয়েলেসলী সেই ছোট্ট বাড়িটি ও তৎসংলগ্ন সমগ্র জমি কিনে নেন ৯,৫০,০০০ টাকায়; কারণ তাঁর মতে অত ছোট বাড়ী রাজমর্যাদার উপযুক্ত নয়, লর্ড ওয়েলেসলী তাই মনে করতেন। তারপর তিনি বর্তমান রাজভবনটি তৈরী করতে আরম্ভ করান।

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি লর্ড ওয়েলেসলী ডালহৌসী স্কোয়ারে তাঁর পুরোনো কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের বাড়ী থেকে বর্তমান রাজভবনে উঠে আসেন।

বর্তমান রাজভবন-প্রাসাদ করতে তখনই সব মিলিয়ে খরচ পড়ে ঃ—

বাড়ী তৈরী খরচ	= পাউণ্ড	৮৭,৭৯০
ফার্নিচার খরচ	= ,,	১৮,৫৬০
জমির খরচ	= ,,	৭১,৪৩৭
	মোট	১,৭৭,৭৮৭ পাউণ্ড

তারপর কলকাতার রাজভবনের জীবনে অনেক লাট-বেলাট পার হয়েছেন। রাজভবনের ভেতরের শাসনের অনেক হয়তো পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু রাজভবনের বিশাল প্রাসাদটি ঠিক পুরানো দিনের মতোই রয়েছে—আদি, অকৃত্রিম। কেবল রাজভবনের মধ্যে দুই পাশে মন্ত্রী নিবাস গড়ে উঠেছে এই যা।

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের রাজভবন আর ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের রাজভবন ঠিক একই। সেই পূর্ব ও পশ্চিম ধারের বড় বড় গেটের ওপর বৃটিশ সিংহ ও গেটের নীচে মিশরীয় ফিংক্স্। এরা সেদিন যেমন ছিল এখনও বর্তমানে সেই রূপেই আছে। কেবলমাত্র রাজভবনের জীবনে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ গিয়ে ভারতীয়রা এর মালিকানা পেয়েছে; সেদিনের গভর্ণর হয়েছেন এখন রাজ্যপাল। আর লাটবাড়ী হয়েছে এখন রাজভবন।

এই রাজভবনটির নক্সাকার হচ্ছেন কাপ্টেন মিঃ ওয়াট্। তিনি ছিলেন পেশায় ইন্জিনিয়ার। আর মুখ্য ইন্জিনিয়ার ছিলেন মিঃ ক্যামেরণ।

লর্ড কার্জনের প্রপিতামহদের ইংলণ্ডের ডারবিসায়ারে যে কেডেলস্টোন প্যালেস আছে তারই হুবহু অনুকরণে এই বাংলার লাটভবন। তবু ইন্জিনিয়ার মিঃ ওয়াটের কিছুটা মৌলিক কৃতিত্ব আছে নিশ্চয়ই। ডারবিসায়ারের বাড়ীটি পাথরের তৈরী আর কলকাতার বাড়ীটি ইটের এই যা তফাৎ। বাংলার ইটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজভবনের মমতা, ইংলণ্ডের পাথরের রুক্ষতা সেখানে পরিদৃশ্যমান।

বাংলার এই রাজভবনটিকে রূপে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় করে তুলতে প্রায় প্রত্যেকটি বৃটিশ রাজপুরুষেরাই আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এখনও স্বাধীন

ভারতে যাঁরা রাজ্যপাল হয়ে আসেন তাঁরাও প্রচুর খরচ করেন এই রাজপ্রাসাদটিকে সুচারুরূপে সাজাতে।

দরিদ্র ভারতবাসী সেটাকে ভাল চোখে দেখেন না। মনে করে খরচের অতিশয় বাহুল্যতা, স্রেফ শ্বেতহস্তী পোষা। সাধারণ লোকের চোখ ধাঁধিয়ে ভয় দেখানোর ব্যাপার।

ইংরেজ আমলেও অনেকবার বোর্ড অব কাউন্সিলে এই রাজভবনের ব্যয় বাহুল্যের জন্য তর্কের ঝড় বয়ে গেছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

স্বয়ং লর্ড ওয়েলেসলীকেই তো এত খরচ করে লাটের বাড়ী রাজভবন তৈরী করবার জন্য বিলাতে বোর্ড অব ডাইরেকট্টারসের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

তিনি নাকি পূর্বেই জানতেন এত টাকা খরচ করে ভারতবর্ষের মাটিতে লাটবাড়ী তৈরী করাতে বোর্ড অব ডাইরেকটার্স-এর সভ্যরা সম্মতি দেবেন না। তিনি তাই না জানিয়েই এটা তৈরী করাতে আরম্ভ করান এবং এর নির্মাণ কার্য শেষ হলে বিলাতে জানান।

তখন মিঃ পিট ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। ওয়েলেসলীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই ওয়েলেসলী সে যাত্রায় বোর্ডের মেম্বারদের কাছে অপদস্থের হাত থেকে রেহাই পান।

এই রাজভবনের রাজনৈতিক ইতিহাস সৃষ্টিতে যেমন একটা সুনির্দিষ্ট স্থান আছে তেমনি আছে এর অপরিসীম সৌন্দর্য খ্যাতি ভারতের প্রতি প্রদেশের লোকের মুখে মুখে।

কেবলমাত্র যারা পথচারী তারা রাজভবনের যে সৌন্দর্য দেখেঁন তার শত গুণ বাড়তি সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে রাজভবনের আশ্রিত টিপু সুলতানের রাজসিংহাসনে, বার্মার শেষ রাজা থিবোর চন্দন কাঠের লাল পালঙ্কে, বিভিন্ন শ্বেত পাথরের শুভ্র মর্মর মূর্তিতে, নানকিং যুদ্ধে পরাজিত চীন প্রদত্ত ড্রাগন সজ্জিত কালো কামানে, ক্যানভাসের দামী দামী অজস্র অয়েল পেণ্টিং-এর অপূর্ব শোভায়, বহু মূল্যেবান সত্তরটি আসল বেলজিয়াম কাট গ্লাসের অপূর্ব ঝাড়ে, বার্মিস যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের বিভিন্ন সৌখিন জিনিসের নানা সংগ্রহে, ফরাসী দেশ থেকে আনিত গিল্ট করা মহামূল্যেবান সোফা, ডিভান এবং সুন্দর সুন্দর চেয়ারে, বড় বড় প্রায় এক ইঞ্চি পুরু বেলজিয়াম গ্লাসের সুশোভিত আয়নায়, ঝকঝকে শোভিত মোম পালিশে পা পিচ্ছিল করা বার্মাটিকের বলরুমের কাঠের ফেন্নারে ও কাঠের পাটাতনে।

এছাড়া যে কতো রকমের সৌখিন জিনিসের সংগ্রহ আছে এ রাজভবনে তার কোনো গোনাগুন্তি নেই।

কোনোটা কোনো ইংরেজ গভর্ণর হয়তো এনেছে পারস্য দেশ থেকে, কোনোটা জাভা থেকে, কোনোটা কোন দেশীয় রাজ্যের রাজার কাছ থেকে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সেগুলি সযত্নে সাজালে পৃথিবীর যে কোনো নাম করা বড়

মিউজিয়ামের সমকক্ষ হবে। হায়দ্রাবাদের সালাজার মিউজিয়াম বা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামও তার কাছে হার মানবে।

বৃটিশ আমলের যে সকল চৌদ্দ ঘোড়ার টানা রাজ্যপালের গাড়ী খাস বিলাত থেকে আনা হয়েছিল তার এক একটার দাম তখনকার দিনের ত্রিশ বত্রিশ হাজার টাকা।

এছাড়া আছে বড় বড় পেতলের ফুলের সুন্দর সুন্দর ভাস, দামী দামী মহামূল্যবান পুরু পশমের কার্পেট আবার সেই কার্পেটের কোণায় কোণায় আসল সোনার সুতোর কাজ করা—কোনোটাতে উর্দু হরফে লেখা যেটা নাকি সিরাজ-উদ্দৌলা বা টিপু সুলতানের আমলের, কোনোটায় এমন সব ফুলের ছবি আঁকা যা সত্যিই শিল্পীর গুণগরিমার সমুজ্জ্বল।

এছাড়াও আছে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা গজের আর্ট সিল্কের হিমরু কাপড়ের হাজার হাজার পর্দা, হাজার হাজার দামী রুপোর কাটলারি বাসন। রুপোর কাপ-ডিস, থালা-বাটি প্রভৃতি। আছে রুপোর সিংহাসন। সেখানে বসে নব নিযুক্ত রাজ্যপাল শপথ নেন।

রাজভবনের বাগান সে তো একটা যে কোনো নামী বোটানিক্যাল গার্ডেনের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এই একশো বিঘা জমির মধ্যে এমন সব ফুলের বা ফলের গাছ আছে যা বৃটিশ আমলে আনা হয়েছে কোনোটা সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে, কোনোটা জাভা থেকে, কোনোটা হিমালয়ের অতি উচ্চ পর্বত শিখর থেকে, কোনোটা খাস বিলাতের মাটি থেকে।

এই সেদিনও উত্তর ভিয়েতনামের জনদরদী প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো-চি-মিন একটা চেরী ও একটা পিচ জাতীয় ফলের গাছ এই রাজভবনের পূর্ব দিকের মাঠে পুঁতে দিয়ে গেছেন। ভিয়েতনামীদের বৃক্ষ রোপণই নাকি বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। যদিও ভারতবর্ষ ভিয়েতনামের যুদ্ধে এমন কিছু সাহায্য করেনি বা বলেনি যা ভিয়েতনামীরা ভারতীয় বন্ধুত্বের নিদর্শন রূপে আদরের সঙ্গে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে।—যাক সে সব শুষ্ক রাজনীতির কথা।

১৯৬০ সালে এপ্রিল মাসে শ্রীমতী পদ্মজা দার্জিলিং ও সিকিম থেকে প্রায় হাজার খানেক নানা রকমের গাছের চারা এনে রাজভবনে লাগালেন; কিন্তু তাঁর চলে যাবার পর পরই অনেকগুলি দামী চারাই অযত্নে অবহেলায় ঝরে শুকিয়ে গেল। যেমন রাজভবনে অযত্নে মরে গেছে হো-চি-মিনের পোঁতা পীচ বা চেরী গাছ। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার মতো প্রকৃতি প্রেমিকা সুদুর্লভ।

লাগানো গাছ অযত্নে মেরে ফেলে তার জায়গায় আড়ম্বর করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে গভর্নমেণ্টের খরচায় কিনে আনা নতুন চারাগাছ লাগানই হচ্ছে আজকালকার দিনে। আমাদের সরকারের বনমহোৎসব এর নিদর্শন, স্টেটাস সিমবল। তাই বলে হাতীকা দিখানে কা দাঁত এক, খানেকা আলাগ হ্যায়। হাতী যে গজদন্ত দেখায় সেটাতে

সে খায় না। ওটা ওর আড়ম্বর, অহঙ্কার। খাবার জন্য আলাদা দাঁত আছে মুখের ভেতর।

কলকাতার রাজভবনের এই বাগানে আছে দামী ও সচরাচর দুষ্প্রাপ্য ফেমস্ অব দি ফরেস্ট—সুন্দর রক্তরাঙ্গা ফুলের গাছ, আছে হোয়াইট সিল্ক কটন ট্রি, রয়েল পাম, সিলোনিজ পাম, বোগানভেলিয়া, ক্যাসুরিনা, দেওদার, অশোক, পিপুল, বাঁশ, কর্ক, ক্যান্ডেল গাছ—সুন্দর সাদা মোমবাতির মতো ফুল, চায়না পাম, ব্যাকবেরী গাছ, মহুয়া, গিনিসিডিয়া ম্যাকুলটা, লুকিং গ্লাস—গাছের চকচকে পাতায় নিজের মুখ দেখা যায়, অর্জুন গাছ, নানারকমের ডুমুর জাতীয় গাছ, তালিপট পাম—লম্বা খুব বড় বড় পাতা, ব্রাউনিয়া, নানা রকমের ও নানা বর্ণের জলজ লিলি, ওয়াটার লিলি অব সাউথ আমেরিকা—৭ ইঞ্চি চওড়া কানা উঁচু পদ্মপাতা, আফ্রিকান অয়েল পাম, রবার গাছ, নানাজাতীয় বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য লতানে ক্রিপার, টেমপেল ফ্লাওয়ার ট্রি, নিম গাছ, আম, নারকেল, কলা, কদম প্রভৃতি।

এই লাটবাড়ী সাজাতে বিদেশী ও স্বদেশীয় যে সকল লাটসাহেবের নাম ইতিহাসে মনে পড়ে তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য লর্ড ওয়েলসলী, লর্ড কার্জন, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড মিণ্টো ও সাম্প্রতিক কালে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নাম।

আরও কয়েকজন বিদেশিনী বৃটিশ মহিলার সস্নেহ আদর ও সোহাগ বর্ষিত হয়েছে এই লাটবাড়ীর যাবতীয় বৃক্ষপুঞ্জ ও তরুলতা শ্রেণীতে। লেডী মেয়ো—(১৮৬৯-১৮৭২), লেডী লিটন—(১৮৭৬-১৮৮০) এবং মিস্ এ্যামেলী ইডেন (১৮৩৫-১৮৪২)—(ইনি লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন) এঁদের সকলের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল কলকাতার লাটবাড়ীটিকে সৌন্দর্য ও সুষমায় ভরিয়ে তুলতে।

কত দূর দেশ, কত অজানা অচেনা জায়গা থেকে এঁরা নানারকমের জিনিস নানা গাছপালা এনে রাজপ্রসাদটিকে ভরিয়ে তুলেছিলেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এসব বর্ণনা কল্পনা নয়। ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল মুখরসাক্ষী। আজ এগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঝরাপাতা ও আগাছা জঙ্গলের দৌরাত্মে।

লাটবাড়ীর গ্রন্থাগারের বিভিন্ন গ্রন্থে এ সবের বিস্তৃত কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে।

মিস্ এমেলী ইডেনের নাম অনুসারেই কলকাতার ইডেন উদ্যানের নামকরণ। এটা হয়তো অনেকেরই অজানা আছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলো লর্ড কার্জনেরই অপূর্ব কীর্তি।

যদি তাজমহলের জন্য সম্রাট শাহাজানকে স্মরণ করতে হয় তবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবনের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছবি, কার্জন পার্ক ইত্যাদি কলকাতার কিছু কিছু সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য লর্ড কার্জনকে মনে রাখা উচিত। যদিও বহুবিতর্কিত বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা লর্ড কার্জনের অমার্জনীয় অপরাধ, এবং তার ফলেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। যেটা পরে অবশ্য বন্ধ হয়।

এখন যেখানে বিখ্যাত কার্জন পার্ক সেখানে পূর্বে ছিল বিশাল পুকুর। নাম ধর্মতলা পুষ্করিণী। এই পুকুর বুজিয়ে উদ্যান করা হয়।

সত্যিই শহরের বুকে রাজভবনের ঠিক পাশে এই কার্জন পার্কের সৌন্দর্য এককথায় অনুপম। অন্ততঃ শীতকালে নানা বর্ণের ফুলের শোভায় এই স্থানটিতে যেন স্বর্গের শোভা ফুটে ওঠে। ডালিয়া, জিনিয়া, গোলাপ, স্ক্রিশেনথিমামের নানা বর্ণের সম্ভারে যেন কর্মক্লান্ত শত শত ডালহৌসী স্কোয়ারের নানা পর্যায়ের কর্মচারীদের হাত-ছানি দিয়ে এরা ডাকে। পাশে বসতে অনুরোধ করে। শিশু ঝাউ-এর চারা তাদের মাথায় দোলায় ঝালরের চামর। ছোট্ট ফোয়ারার জল যেন তাদের আলিঙ্গনে বাঁধতে চায়। এরাও যেন কলকাতার রাজভবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্মা হয়ে আছে।

বলা হয় যে রাজভবনের ঐতিহাসিক থ্রোনরুমের সিংহাসনটি, যার ওপর বসে কত লাট গভর্ণর কতো রকম নামী ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান করে গেছেন বা এখনও করছেন সেটি ওয়েলেসেলী সাহেব টিপু সুলতানকে দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধে হারিয়ে কেড়ে ছিনিয়ে কলকাতার রাজভবনে নিয়ে এসেছিলেন। যদিও এর সঠিক ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নি।

এই থ্রোনরুমের সিংহাসনে বসিয়েই ১৯১১ সালে পঞ্চমজর্জ ও ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসকে রাজকীয় সম্মান দেখানো হয়েছিল।

আজকেও যেমন রাজভবনের থ্রোনরুমে যাবতীয় বিশিষ্ট সম্মানজনক কাজ সম্পন্ন করা হয় তখনও বৃটিশ আমলে রাজারাজড়াদের দরবার, গভর্ণরের বক্তৃতা প্রভৃতি এই ঐতিহাসিক থ্রোনরুমে প্রায়শই সুসম্পন্ন হতো।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট রাত্রি ১২টার সময় থেকে একটানা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের ও ১৯৬৭ সালে এবং পরে ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ এই থ্রোনরুমেই হয়েছে চিরাচরিত প্রথায়। সে ব্যবস্থা আজও হয়ে চলেছে। এখানেই নতুন রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের শপথ হয়।

রাজভবনের থ্রোনরুমের পরেই রাজভবনের মার্বেল হলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এই মার্বেল হলের চৌদ্দটা সুন্দর সিজারের পাথরের অপূর্ব মূর্তি—এগুলিও লর্ড ওয়েলেসলীই কলকাতার রাজভবনে এনেছিলেন।

কেউ বলে গ্রেট নেপোলিয়ান এগুলি টিপু সুলতানকে উপহার দিয়েছিলেন, কেউ বলে তদানীন্তন ফরাসীরাজ হায়দ্রাবাদের নিজামকে এগুলি উপঢৌকন দিয়েছিলেন, কেউ বা জাভার রাজপ্রাসাদে শোভিত হবার জন্য ইউরোপ থেকে এগুলি বঙ্গোপসাগর হয়ে জাভায় যাচ্ছিল, ইংরেজরা এগুলি কেড়ে নেয় ও লর্ড ওয়েলেসলী এগুলি কলকাতার রাজভবনে আনেন।

কলকাতার রাজভবনে যে মূল্যবান সত্তরটি বেলজিয়াম কাট গ্লাসের দুশো মালার সুশোভিত ঝাড় আছে এগুলিও লর্ড ওয়েলেসলী লক্ষ্মৌ-এর কোন এক বিখ্যাত ধনী মিঃ মার্টিনের কাছ হতে কিনেছিলেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে।

শেষ: কিছুদিন পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন নেহেরুর ভগ্নী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী একবার এখান থেকে কয়েকটি ঝাড় দিল্লীর প্রধানমন্ত্রীর আবাসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দিল্লীর সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদে।

কিন্তু তদানীন্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার তাতে ভীষণ বাধা দেন। তাতেই সেই ওয়েলেসলীর আমলের ঝাড়গুলি এখনও রাজভবনে শোভা পাচ্ছে নচেৎ যেমন বাংলা থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্যময় শিল্পসম্ভার দিল্লীতে রাজধানীর শোভা বর্ধনের জন্য চালান হয়েছে হরেন্দ্রকুমারের মতন মহান রাজ্যপাল না থাকলেও এই মহামূল্যবান ঐতিহাসিক ঝাড়গুলির একই দশা হতো।

স্বাধীনতা পাবার পর থেকে ভারতের ক্রমবর্ধমান ষাট কোটি লোক দীন-দরিদ্রের কষাঘাতে কতো ভাবে জর্জরিত হচ্ছেন তার সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু অকেজো শ্বেতহস্তী সদৃশ এই রাজভবনগুলির অপরিসীম ব্যয় বাহুল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।

রাজভবনের খরচ "চাজ' হেডের" এক্তিয়ারে, সুতরাং বিধান সভার এম এল. এ. দের ভোটে একে অনুমোদন করতে হয় না। ভারতের প্রেসিডেন্ট ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের রাজভবনের খরচ বেঁধে দিয়েছেন। সাংবিধানিক নিয়মে খরচ জোগাতে হবে সেই প্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে, কিন্তু প্রাদেশিক বিধান সভায় তা অনুমোদন করতে কোন ভোট বা ওজর আপত্তি চলবে না। কোনো বামপন্থী পপুলার জনগণের গভর্ণমেণ্ট এর বিরুদ্ধে কিছু উচ্চবাচ্য করবার ক্ষমতা নেই।

তাই ভারতের রাজভবনগুলিতে অজস্রভাবে টাকার অপব্যয় হচ্ছে।

যদি ও অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের যুক্তি 'যাক প্রাণ থাক মান'—আমরা ভারতবাসীরা গরিব হতে পারি তবু বিদেশী অতিথি-অভ্যাগতদের তা প্রকাশ করবো কেন।

কিন্তু কিছু লোকের মত এর বিরুদ্ধে ভারতের সংবিধান এখনই বদলানো উচিত। অযথা ব্যয়বহুল এই জীবনধারা এখনই শুকিয়ে দেওয়া উচিত।

বাঙালীর ঘরে ঘরে একটি সুন্দর প্রবাদ বাক্য চালু আছে—সদ্যজাত ছেলের পা দেখলেই অনেক সময় আঁচ করা যায় তার বাবা খেলোয়াড় ছিল কিনা? তেমনি আমি বলি কেবলমাত্র বাংলার রাজভবনের খরচ জানলেই ভারতের তাবৎ প্রদেশের রাজভবনের খরচের অন্তত কিছুটা আঁচ করা যায়।

প্রায় একশো বিঘে জমির ওপর কলকাতার রাজভবনের মালিক বা একছত্র অধিপতি বাংলার রাজ্যপাল। এর উননব্বইটি ঘরের আনাচে-কানাচে রয়েছে অজস্র উইনডো টাইপ এয়ার কনডিশানার ঠাণ্ডা মেশিন। আর রাজ্যপালের খাস স্টাডি যেখানে বসে রাজ্যপাল রোজ অফিস করেন তাতে আছে ব্যয়বহুল ত্রিশ হাজার টাকার প্যাকেজ টাইপ পাঁচ টনের এয়ার কনডিশনার। রাজ্যপাল ধর্মবীর এসে যেটা আবার নতুন মডেলের কিনলেন।

তিনতলা এই লাটবাড়ীটির দোতলায় রয়েছে 'প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইট, কাউন্সিল চেম্বার', এইচ-ই স্টাডি অফিস, থ্রোন রুম, ব্যানকোয়েট হল, ইয়োলো ড্রইং রুম, ব্রাউন ড্রইং রুম, মারকো রুম। কভার্ডপ্যাসেজ, প্যানট্রি, ইত্যাদি।

রাজভবনে মারকো ড্রইং রুমটি শ্রীমতী পদ্মজার মৃত কুকুর মারকো পোলের নাম অনুসারে রাখা হয়েছে। পূর্বে এই রুমটির নাম ছিল ব্লু ড্রইং রুম—লাটবাড়ীতে আভিজাত্যের পাশে প্রভুভক্তির এতটুকু নিদর্শন।

এই বাড়ীর তিনতলায় আছে প্রাইম্ মিনিস্টার স্যুইট, হিস্ এক্সেলেনসীজ স্যুইট, লর্ড ডাফরিন স্যুইট, লর্ডওয়েলসলী স্যুইট, রাজভবনের বিখ্যাত বল রুম, সেক্রেটারী অফিস।

নিচের তলায় আছে ঐতিহাসিক মারবেল হল, মিলিটারি সেক্রেটারিস্ অফিস, গ্র্যান্ডস্টেয়ার কেস, চাঁদী কামরা ইত্যাদি।

রাজভবনের এই মারবেল হলটি যদিও পাথরের তৈরী নয় তবু এই হলের মর্যাদার জন্য ব্রিটিশরা দ্বাদশটি পাথরের সুন্দর স্টাচু এই মারবেল হলটিতে রেখেছিলেন। মূর্তিগুলি দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি ভাস্কর্যের সুনিপুণ নিদর্শন।

এই মারবেল হলে বহু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছে বৃটিশ আমলে এবং স্বদেশী আমলে এখনও হয়; কিন্তু পূর্বের সৌন্দর্য এখন আর নেই। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু নতুন রাজ্যপাল হয়ে এসেই এই সুন্দর স্টাচুগুলি এবং রাজভবনের সোনালী গিল্ট করা সুন্দর সুন্দর সব ফার্ণিচার নিলামে জলের দামে বিক্রি করে দেন—ওল্ড ফ্যাসানের দোহাইএ।

স্টাচুগুলি যদিও বিক্রী করা হয়নি, শোনা যায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামে।

বহু বছর পরে উনিশশো উনআশি সালে রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এই স্টাচুগুলি উদ্ধার করে এনে আবার রাজভবনের মার্বেল হলে বসাবেন ঠিক করেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্য দু' চারটি স্টাচু বসান।

বৃটিশ আমলের রাজভবনের সে চাকচিক্য আর নেই।

যে হাজার হাজার টাকার নতুন ফার্নিচার পদ্মজার আমলে কেনা হয়েছে সেটা সৌখিনতার ও শালীনতার দিক থেকে রাজভবনে বেমানান—যে কোনো বড় হোটেলে সেগুলি শোভা পাবার মতো, কলকাতার রাজভবনে নয়। এই উক্তিটি যদিএ একজন দক্ষিণবাসী শিক্ষিত মাদ্রাজী রাজভবন দর্শনার্থীর নিজের উক্তি।

এখানে যদিও বলা প্রয়োজন যে বৃটিশ আমল থেকে গভর্ণরের "পাওয়ার ও প্রিভিলেজ"-এ লিখিত আছে যে কোন নতুন রাজ্যপাল ইচ্ছে করলে তাঁর পাঁচ বছরে চাকরীর মেয়াদে প্রায় আশি হাজার টাকার মতো নতুন ফার্নিচার কিনতে পারবেন ও এই কেনা বাবদ উদ্বৃত্ত পুরানো ফার্ণিচার যা গুদামে আছে ও নতুন যে ফার্ণিচার কেনা হ'ল তা যেন এক লক্ষ আশি হাজার টাকার মূল্যের বেশী না হয়।

তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে কোনো নতুন রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে ফার্ণিচার নাও কিনতে পারেন।

∴ প্রাতঃস্মরণীয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার যেমন কোনো নূতন ফার্ণিচারই রাজভবনে কিনতে দেন নি। তাঁর মত ছিল আমি রাজ্যপাল যদি এই পরিবেশে থাকতে পারি তবে আমার ভি. আই. পি. গেস্টদেরও এতে ক্ষুন্নমনা হওয়া উচিত নয়।

কলকাতার রাজভবনের প্রতিটি ঘর মোড়া রয়েছে পুরু পশমী গালিচা দিয়ে। এগুলি খাস বৃটিশ আমলেই হাজার হাজার টাকা মূল্যে কেনা হয়েছিল। পরে অবশ্য দেশী আমলেও অনেক নূতন কার্পেট কেনা হয়েছে।

কেবলমাত্র পদ্মজার আমলেই ষাটের দশকে রাণী এলিজাবেথ আসার সময় প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের কার্পেট কেনা হয়েছে অন্যান্য জিনিস ছাড়াও। রাণী এলিজাবেথ কলকাতা রাজভবনে আসার জন্য এ ছাড়া রাজকীয় মর্যাদাযুক্ত নতুন একটা লিফট্ ও একটি নতুন বহু মূল্য গাড়ীও কেনা হয় বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে। যদিও রাজভবনে তিনটি ভাল লিফ্ট ও বেশ কতকগুলি দামী গাড়ির মিছিল আছে এবং তাতেই বেশ কাজ চলে যায়।

এছাড়া রাজভবনের ঘরে ঘরে আছে উঁচু ডানলোপিলোর গদি, সোফা বা পালঙ্ক সব জায়গায়ই।

আছে দামী আটাশ তিরিশ টাকা গজের অজস্র রং-বেরং-এর পর্দা যেগুলি গুটিয়ে রাখতে রাজভবনের দোতলায় বিরাট টেলার স্টোর্স—দর্জির গুদাম। আর আছে বিরাট বিরাট দামী দামী কাঁচের ঝাড়, দামী দামী অয়েল পেন্টিং বার্মাটিকের বিভিন্ন প্রকারের কাঠের সুন্দর সুন্দর মূর্তি, ঘরে ঘরে টেলিফোন, ম্যাসেনজার বেল, কলিং বেল, পিতলের বড় বড় ফুল রাখবার গামলা, কয়েক হাজার টাকার কাটলারি বাসন প্রভৃতি।

বৃটিশ আমলের মহামূল্যবান নক্সা করা তাঁবু এখন আর পড়ে না রাজভবনের দক্ষিণের মাঠে যা বৃটিশ আমলে বড়দিনের সময় বা দরবার বসবার সময় পড়তো।

তাই রাজভবনের পূর্ব দিকের টেন্ট গুদাম এখন দুজন অধস্তন কর্মচারীর আবাসস্থল। পচে যাওয়া সুন্দর তাঁবুগুলি কাগজের মন্ড হতে জলের দরে বিক্রয় হয়ে গেছে।

পুরানো আমলের দুটি সূর্য ঘড়ি বা সান ডায়াল রয়েছে রাজভবনের বাগানে।

আর আছে দুটি ছোট্ট পুকুর যা হয়তো কলকাতাবাসী অনেকেরই জানা ছিল না এযাবৎ। কিন্তু সম্প্রতি "রাজভবনে মাছ চুরির জের—পুলিশ মহলে বিক্ষোভ" ইত্যাদি রসাল খবর কলকাতার দৈনিক কাগজে বেরুতে সাধারণ জনসাধারণের তা জানা হয়ে গেছে।

এছাড়া রাজভবনের খাস সুইমিং পুল বা সুন্দর লিলি পন্ড ইত্যাদি যেগুলি রয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরের সৃষ্ট বা তৈরি। এগুলি সৃষ্টিতে শ্রীমতী পদ্মজাকে বার বার মনে পড়ে।

প্রায় উননব্বইটি কক্ষবিশিষ্ট এই রাজভবন অনেক কিছু দেখেছে তার এই এই দেড়শো বছরের জীবনে। রাজভবনের গ্র্যান্ড স্টেয়ার কেসের সামনে যে চৈনিক ড্রাগন দেওয়া বড় কামানটি আছে সেটা শোনা যায় বৃটিশরা চীনাদের কাছ থেকে পেয়েছিল নানকিং যুদ্ধে।

১৯৫৭ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই রাজভবনে ঢুকেই ওটা সরাতে বলেন তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজাকে, কিংবা তিনি অনুরোধ করেন চীনকে ওটা ফেরৎ দিতে। জানিনা ওর ভেতর চীনাদের কোনো অসম্মানের ইতিহাস লুকানো আছে কি না? কিন্তু চৌ-এন-লাই-এর সে অনুরোধ রাখা হয়নি।

এখনও চীনা কামানটি ঠিক যে জায়গায় ছিল চৌ-এর সময় ঠিক রাজভবনের সেই জায়গাই সেটা সমুজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।

কলকাতা রাজভবনের ঐশ্চর্য উপছিয়ে পড়ছে রাজভবনের বিভিন্ন স্যুইটে বা গেস্ট কামরায়। যেখানে এসে রাজ অতিথিরা দু'চার দিনের জন্য কলকাতায় বাসা বাঁধেন।

এই সব প্রত্যেক সুইটে আছে সেলফ কনটেন্‌ড বাথরুম সমেত বৃহৎ বৃহৎ ঘর—সিটিং রুম, বেড রুম এবং ড্রইং রুম। প্রত্যেক ঘরগুলি মোটা পশমী দামী কার্পেটে আচ্ছাদিত। এই ঘরের দেওয়ালগুলি নানা বর্ণের দামী প্ল্যাস্টিক পেন্ট রং করা।

বাথরুমে বাথটাব, ঝরণা, কোমড, ফ্যান, ঘরে টেলিফোন, কলিং বেল, বই শুদ্ধ বুক কেস, কাপড়, সুট, গাউন, কোট প্রভৃতি রাখবার মূল্যবান কাঠের আধুনিক রুচির আলমারী।

দু' একটি করে সুরুচিপূর্ণ হাতে আঁকা ছবি। দেওয়ালের মধ্যে লুকানো কনসিলড ওয়্যারিং-এর সঙ্গে যুক্ত ওয়াল ল্যাম্প। ঘরে ঘরে এয়ার কণ্ডিসানার সমেত সিলিং ফ্যান। কোনো সময় এয়ার কণ্ডিসানার যদি বিগড়ে যায় তার বিকল্প ব্যবস্থা। দেওয়াল-আলো ছাড়াও কয়েকটি ঘরে মহামূল্যবান বেলজিয়াম কাটগ্লাসের দোদুল্যমান সুন্দর সুন্দর ঝাড়বাতি। সিটিং রুমে আধুনিক কেতাদুরস্ত সোফা, ডিভান, কৌচ প্রভৃতির গর্বিত জৌলুষ।

কলকাতার রাজভবন এখন বিজলীর আলোতে ঝলমল্। বছরে ইলেকট্রিক বিলই দিতে হয় প্রায় এক লাখ টাকার ওপর। মাসে গড়ে পড়ে দশ হাজার টাকা।

কিন্তু এই লাটবাড়ীতে কোন লাট প্রথম ইলেকট্রিক লাইট আনেন তা জানা দরকার। লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজভবনে বিজলী বাতি আনেন। এই সম্বন্ধে রাজভবনের লাইব্রেরীতে রাখা ইতিহাসপঞ্জীতে জানা যায় এখানে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে গ্যাস, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ইলেকট্রিক বেল, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ঠাণ্ডা ও গরম জলের গিজার, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইলেকট্রিক লাইট, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে

ইলেকট্রিক ফ্যান ও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে সবুজ রং-এর কাঠের বাথটাবের জায়গায় সুন্দর চীনে মাটির বাথটব লাগান হয়।

রাজভবনের এখন করপোরেশান ট্যাক্স লাগে বছরে ৩,২৬০০০ হাজার টাকা, তার মধ্যে মেন বিল্ডিং-এর জন্যেই বছরে ট্যাক্স লাগে ২,৯০,২০৯.৯২ পয়সা। রাজভবনের বাগানের গঙ্গার জলের জন্য ট্যাক্স লাগে বছরে ৩,০০০ টাকা। দার্জিলিং রাজভবনের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স লাগে বছরে ১১,০০০ টাকা ও ব্যারাকপুর লাটবাগানের বাৎসরিক ট্যাক্স লাগে ১,০০০ টাকা।

রাজ্যপালের নিজের একটি হাসপাতাল আছে। রাজভবন স্টেটের মধ্যেই ৮নং গভর্ণমেন্ট প্লেসের একতলায়। বৃটিশ আমল থেকে সেখানে দুজন ডাক্তার বর্তমান। একজন রেসিডেনসিয়াল আর একজন বাইরের থাকেন। রাজ্যপালের সর্বশ্রেণীর কর্মচারিরা এখানে চিকিৎসিত হন।

যদিও রাজ্যপালের নিজের ও ফ্যামিলীর জন্য আরও বড় বড় অনেক ডাক্তার বরাদ্দ আছে। তবু কলকাতার সব নামী নামী বড় বড় স্পেশালিস্টরাই রাজ্যপালের অনারারি ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এঁদের নামের তালিকা রাজ্যপালের সঙ্গে যুক্ত কলকাতার টেলিফোন গাইডে সমুজ্জল। এঁদের মাসিক অনারারি ভাতাও বরাদ্দ।

রাজ্যপালের নিজের একটা খাস প্রেস আছে। এটিও রাজ্যপালের এস্টেটের মধ্যে। এখানে রাজ্যপালের দপ্তরের যাবতীয় কাজকর্ম ছাপা হয়। ম্যায় রোজ-কার টেবিল মেনু, ইনভিটেশন কার্ড, রাজ্যপালের বক্তৃতা ইত্যাদি।

বৃটিশ আমলে রাজ্যপালের জলপথে গঙ্গাবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য একটি স্টীমার লঞ্চ ছিল। নাম ছিল যতদূর মনে পড়ে 'মেরী এক্সপ্রেস'। রাজভবনের পশ্চিমে আউটট্রামঘাটে সেটা সদা সর্বদা বাঁধা থাকতো।

স্বাধীনতা পাবার পর সেই স্টীমারটি এখন রাজ্যপালের হয়ে পোর্ট কমিশনার দেখা শোনা করে। যখন রাজ্যপালের প্রমোদ ভ্রমণের দরকার হয় তখন স্টীমারটি নেওয়া হয়।

এছাড়া কেবলমাত্র রাজ্যপালের ব্যবহারের জন্যই একটি রেলওয়ে সেলুন আছে। নাম এইচ. ই. সেলুন। এর জন্যও রাজ্যপালের তহবিল থেকে বছরে মোটা টাকা ব্যয় হয়।

এছাড়া বৃটিশ আমলে লাটভবনের সম্মুখে ফ্যান্সি লেনে বিরাট তিনতলার কোয়ার্টারে ব্যাণ্ড পার্টির লোকেরা সদা সর্বদা হাজির থাকতেন। এখনও তেত্রিশ বছর পরেও সেই বাড়ীটার নাম ব্যাণ্ড মাস্টার্স কোয়ার্টার। লাঞ্চ ও ডিনারের সময় এরা দল বেঁধে বৃটিশ লাটসাহেবের খাওয়ার সময় ব্যাণ্ড বাজাতো।

এই ব্যাণ্ড পার্টির দলনেতা মিঃ ডাফ না মিঃ শেরিন—নাম সঠিক জানা যায় নি—এমন করুণ সুরে বেহালা বাজাতেন যে শক্ত পাথরও যেন গলে যেতো।

এখনও এই বাড়ীর বাসিন্দরা হঠাৎ হঠাৎ নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙা চোখে ভয়বিহ্বল

হৃদয়ে মাঝে মধ্যে সেই করুণ সুর যেন শুনতে পান। এই সেদিনও কয়েকজন বাসিন্দা আমাকে এ কথা বলেছে।

যদিও এখন ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও অন্যান্য কয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া লাটবাড়ীতে আর কোনো দিন ব্যাণ্ডের বাজনা বাজে না। আর সেই ব্যাণ্ড পার্টি'ও আসে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে। 'রুল বৃটানিয়া' 'লং লীভ আওয়ার কিং'-এর বদলে তাতে বেজে ওঠে জনগণমন অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বা চলরে চলরে চল।

রাজভবনের আস্তাবলে ২নং ওয়েলেসলী প্লেস স্ট্রীটে প্রায় একশোটি অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া থাকতো বৃটিশ আমলে। গভর্ণর পোলো খেলতেন। খিদিরপুরের বডি গার্ড লাইন থেকে গোরা সৈন্য এসে গভর্ণরের সঙ্গে পোলো খেলায় যোগ দিত। দেশ স্বাধীন হবার পর সে সব ঘোড়া এখন কলকাতার মাউনটেন্ড পুলিশের হেফাজতে চলে গেছে।

রাজ্যপালের মটর গ্যারাজে প্রায় বারো চৌদ্দটি দামি দামি গাড়ী আছে। জীপ আছে। ট্রাক আছে।

গাড়ীর মধ্যে আছে আবার দুটি সম্পূর্ণ এয়ার কনডিসন্ড ইমপেলা শেভোলেট ও বুইক। আর আছে একটি রোলস্ রয়েস। যেটা সম্প্রতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে।

কলকাতার রাজ্যপালের অফিসের বাবুদের ও বেশ চটকদার নাম। ক্যাশিয়ারকে এখানে বলা হয় ট্রেজারার, প্যানট্রি-ইন-চার্জকে বলা হয় কমপট্রোলার এবং মটর গ্যারেজ যে দেখা-শোনা করে তাকে বলা হয় গ্যারেজ সুপারিনটেন্ডেন্ট।

হাউস খালাসী বা পিওনরা লাটবাড়ীকে কুঠী আর লাটের ছেলের বউকে বলে বৌরাণী ও লাটগিন্নীকে বলে লেডি সাহেব এবং সময় সময় রাণীমা। লাটকে বা ছেলেকে স্যার বা ইওর এক্সেলেন্সী বলেই এরা দায় সারা কাজ চালিয়ে যায়। এ না বলার জন্য মাঝে মাঝে এদের বিপদে পড়তে হয়। সেটা পরে 'লছি।

বৃটিশ আমলের রাজভবনের কয়েকটি ঘটনা অতি আকর্ষণীয়। সুন্দর। সমগ্র বৃটিশ চরিত্রের ব্যঞ্জনাময় ইতিহাস।

তখন বাংলার লাট ছিলেন লর্ড ব্রাবোর্ণ। ১৯৩৭ সাল। বৃটিশ লর্ড বংশের খুব কম লোকই তখন গভর্ণর হয়ে এদেশে এসেছেন। সুতরাং তাঁর সময় বাংলার রাজভবন বেশ সরগরম। তাঁর স্ত্রী লেডী ব্রাবোর্ণ লর্ড বংশের। সকল রাজভবনের কর্মচারী তাঁকে লেডী সাহেব বলে। তিনি খুব আত্মাভিমানী, দাম্ভিক, দর্পী মহিলা। ঠিক স্বামী লর্ড ব্রাবোর্ণের মত অমায়িক, হাস্যময় প্রজাবৎসল।...

একদিন লেডী ব্রাবোর্ণ হুকুম দিলেন কলকাতা বিশেষতঃ ব্যারাকপুর লাটবাগানের ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে শিয়ালের ডাকে তার রাতের ঘুম ব্যাহত হয়। তাঁর দিবা নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে সেখানকার কাক চিল প্রভৃতি পাখীর ডাকে।

তাঁর হুকুম হলো বন্দুক দিয়ে পাখী ও শিয়াল তাড়াতে বা মারতে হবে

আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালিত হলো। এটা যে স্বয়ং গভর্ণরের লেডির হুকুম। তারপর সুনিদ্রা হলো লেডী সাহেবের।

কিন্তু এই লেডী সাহেবই আর একবার বেশ কিছু শিক্ষা পেলেন।

তখন উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। কলকাতার রাজভবনের বেশ সুন্দর সুন্দর নানা রং-এর বড় বড় ডালিয়া ফুল ফুটেছে। রাজভবনের তিন তলার দক্ষিণের বারান্দা থেকে লেডী সাহেব হুকুম দিলেন সদ্য প্রস্ফুটিত ডালিয়া কয়েকটি কেটে এনে রাজভবনে তার নিজস্ব শয়ন ঘরে সাজাতে। মালী কিন্তু ফুল কাটতে নারাজ। বিনা অনুমতিতে গার্ডেন সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব ওয়াটসনের বারণ আছে রাজভবনের কোন ফুল কাটতে, কিন্তু শেষে লেডী সাহেবরই হুকুম মানতে হলো মালীকে।

দু' তিনটি বড় বড় খয়েরী ও হলুদ রং-এর ডালিয়া ফুল গাছ থেকে কাটা হলো।

সাহেব ওয়াটসন্ প্রাত্যহিক বাগান পরিদর্শনে এসে সব লক্ষ্য করলেন। সব জানতে পারলেন। গুণধর মালীর জরিমানা হলো কুড়ি টাকা। টাকা জমা হবে রাজভবনের রাজকোষে নয়, গভর্ণমেণ্টের শম্ভুনাথ হাসপাতালের চ্যারিটি ফাণ্ডে— দরিদ্রের সেবায়। মালীর মাইনে থেকে টাকাটা কাটা হলো।

লেডী ব্রাবোর্ণ সব ঘটনা শুনলেন। নিজের দোষের জন্য তাঁর স্বামী গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণকে কোন অযৌক্তিক অনুরোধ করলেন না গার্ডেন সুপারিনটেনডেণ্টের বিরুদ্ধে। মালীর হাতে একশোটা টাকা দিয়ে দিলেন নিজের ভুলের খেশারত হিসেবে। আশি টাকা গুণধর নেবে লেডীর কথা রাখার পুরস্কার স্বরূপ আর কুড়ি টাকা ফাইন বাবদ। বৃটিশ চরিত্র প্রস্ফুটিত হলো সমুজ্জ্বল ভাবে। **Law is Law.**

আর একবারের একটি ঘটনা। তখন বাংলার লাট ছিলেন স্যার জন্ উডহেড আই. সি. এস.। ১৯৩৪ সাল।

হাজার এক বিঘে জমি সম্বলিত ব্যারাকপুর লাটবাগানে তখন খুব গলফ খেলা হতো।

লাটেরা শীতকালটা মাস দুই ব্যারাকপুর লাটবাগানের লাটকুঠীতে কাটাতেন। কলকাতার রাজভবন থেকে তাঁদের কাছে কাগজপত্র যেতো সই-সাবুদ করবার জন্য। তখন ব্যারাকপুর লাট বাগানে কর্মচারীদের বাসস্থান সকল লাটের নিজের কুঠী থেকে কাঁটা তারের শক্ত বেড়া ও গেট দিয়ে বিভক্ত করা হতো।

লাট স্যার জন উড়হেড একদিন ঘোড়ায় চড়ে একা প্রাত্যহিক প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন লাট-বাগানে। তিনি গেট পার হয়ে তাঁর কর্মচারীদের বাসস্থানের দিকে একটু প্রাতঃভ্রমণে বেড়াতে চান। গেট রক্ষক দারোয়ান গুদাই কাহার গেট খুলতে নারাজ; কারণ তদানীন্তন গার্ডেন সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ অমূল্য রায়ের বারণ আছে।

লাট উডহেড নিজের পরিচয় দিলেন গেটম্যানকে। তাতেও গুদাই কাহার তাঁকে ভেতরে যেতে দিতে নারাজ।—ডিউটি ইজ ডিউটি। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করাই তার কাজ। নিষ্ঠা ভরে হুকুম তালিম করেই সে ব্যারাকপুর রাজভবনে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর কাটিয়েছে। আর দু বছর বাদেই তার রিটায়ার। সুতরাং অন্যায় সে করবে না। করতে পারে না। মনিব ওপরওয়ালার কথা সে কোনো দিন অমান্য করেনি, করতেও পারবে না। স্বয়ং গভর্ণরের অনুরোধেও নয়।

গভর্ণর উডহেড তাকে ভয় দেখালেন যে তিনি ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে তারের বেড়া টপকিয়ে যাবেন।

গুদাই কাহার তার মোটা ভোজপুরী লাঠিখানা তুলে প্রত্যুত্তরে বললো,—সে চেষ্টা হলে সে ঘোড়ার পা দুখানা লাঠির আঘাতে ভেঙে দেবে।

গভর্ণর উডহেড ঘোড়ার মুখ ঘুরালেন! ফিরে এলেন লাটবাগানের নিজের কুঠীতে।

তখন কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র লাটবাগানে। সবাই হায় হায় করছে গুদাই কাহারের ভবিষ্যৎ ভেবে। এমন কি গার্ডেন সুপারিনটেনডেন্ট অমূল্য রায়ও গুদাই কাহারকে যা তা বকলেন,—সাদা চামড়াকে তো ভয় করাব। আমার আদেশটাই সব হলো। এখন কি মুস্কিল বল তো। স্বয়ং লাট বলে কথা।

কিন্তু গুদাই কাহার নির্ভীক। নিশ্চল। বললে, রামের দয়ায় ফাঁসী তো হবে না বাবু। নকরি ছেড়ে উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় নিজের গ্রামে এটাওয়াতে চলে যাবো। কর্তব্যহীন কোনো দিন জীবনে হয়নি, হবোও না এই বৃদ্ধ বয়সে রিটায়ার করবার দু' বছর আগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গভর্ণরের ডাক পড়লো অমূল্য রায়ের সঙ্গে তার বিশ্বস্ত কর্মচারী গুদাই কাহারের।

সমস্ত লাট বাগান নিশ্চুপ। মনে হয় যেন গাছের পাতারও টপ করে খসে পড়ার শব্দ শোনা যায়। কি হয় কি হয় ভাব।

স্বয়ং লাট উডহেড তাঁর সেক্রেটারীর সামনে গুদাই কাহারকে তার কর্তব্যে ও বিশ্বস্ততার জন্য সেদিনই একটা সোনার মেডেল, পঞ্চাশটি টাকা ও একটা স্বহস্তে লিখিত সার্টিফিকেট দিলেন।

সকলেই অবাক। হতভম্ব। সকলেই পুলকিত। মহা আনন্দিত।

বৃটিশ চরিত্রের এই গুণাবলীর জন্যই একদিন হয়তো সমগ্র বিশ্বের সূর্য অস্ত না যাওয়া ভূখণ্ডের তারা অধিকারী হয়েছিল।

এই কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে রাজভবনের দু' চার জন বৃদ্ধ সুইপার বা মেথর চাকরীতে অবশিষ্ট ছিল যারা তাদের বৃটিশ লাটদের সঙ্গে দু' একবার খাস বৃটেনেও গেছে প্রভুদের সাময়িক ছুটির সময়ে।

বৃদ্ধ শনি বাল্মিকী ঝাড়ুদার সে রকম একটি সুইপার। তার সঙ্গে আমার অনেক গল্প হতো পুরোনো দিনের রাজভবনের। সে চোখ নিমীলিত করে তার ফেলে আসা বৃটিশ প্রভুদের গুণগান করতো।—লর্ড লিটন (১৯২৬); স্যার

স্টানলি জ্যাকসন (১৯২৭); স্যার জন অ্যান্ডারসন (১৯৩২); স্যার জন উডহেড (১৯৩৪); লড ব্রাবোর্ন (১৯৩৬); লড হারবার্ট (১৯৪২); লর্ড ব্যারেজ (১৯৪৭) প্রভৃতির।

শনি বাল্মিকী ঝাড়ুদার একবার বাংলার গভর্ণর স্যার জন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে বিলাতে গিয়েছিল। সে সালটা ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাস। স্যার জন উডহেড স্যার জন অ্যান্ডারসনের জায়গায় চার মাসের জন্য গভর্ণর হয়ে এসেছেন। অ্যান্ডারসন আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি নিয়েছে। শনি ঝাড়ুদার তখন গভর্ণর প্রভুর সঙ্গে লন্ডনে।

একদিন শনি প্রভুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে লন্ডনের একটি ছোট গলি দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছে। হঠাৎ তার চক্ষুস্থির। এ কি? এ যে আমার লাট ও লেডী স্টানলী জ্যাকসন: সাহেব। দুই হাতে তাদের বাজারের বড় বড় থলি। বাজার করে ফিরছেন।

শনি ছুটে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করে হাতের বোঝা দুটি নিতে গেলো। সাহেব ও মেমসাহেব তো তা দেখে অবাক—তুমি কে? কি চাও? শনি ঝাড়ুদার সবিনয়ে নিজের পরিচয় দিল। সাহেব খুব খুশী হলেন। কিন্তু নিজের হাতের বোঝা বা মেমসাহেবের বোঝা শনির হাতে দিলেন না।

শনিকে কাছেই নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে জামাই আদরে চা কেক পেস্ট্রি ইত্যাদি খাওয়ালেন। তখন তো আর প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নেই।

তাছাড়া বৃটিশ চরিত্রই আলাদা। সেখানে যে অফিসে কাজের সময় সাহেব, অফিসের বাইরে বন্ধু।

আমাদের দেশীয় কালা সাহেবদের মতো অফিসে, বাইরে, রাস্তায়, দোকানে, সাহেব সাহেব ভাবে আত্মম্ভর ও সন্ত্রস্ত নয়। তাদের লেডীকে লেডী বললেই চলে। কিন্তু আমাদের অফিসের সাহেবদের মিসেসকে বৌদি, মা বা আণ্টি বললে তারা চোখ পাকান। আর মেমসাহেব বললে খুশীতে ঝলমল হয়ে ওঠেন।

এইতো সেদিন রাজভবনের এক অফিসারের বউ মিসেস দত্তকে একজন বাঙালী চাপরাশী বৌদি বলায় তিনি চোখ রাঙিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন—আমি তোমাদের অফিসের বড়বাবুর বউ নয় যে আমাকে বৌদি বলবে। এরপর যেন মেমসাহেব ছাড়া অন্য কোন সম্বোধন না শুনি।

ঝাড়ুদার শনি বাল্মিকী এখানে ঝাড়ুদারই থেকে যাবে জীবন ভোর। আর সেখানে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সামান্য মুচির ছেলে নিজের গুণে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন, অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্য বৃটিশ রাজত্বের অভূতপূর্ব সম্মানীয় রাজার দাবী এক কথায় প্রত্যাখ্যান করেন, লর্ড বংশের ছেলে মাউন্টব্যাটনকে যুদ্ধ জাহাজের সামান্য বয়ের সঙ্গে জাহাজ পরিষ্কার করবার শিক্ষানবীশী করতে হয়। রাণী এলিজাবেথের ছেলে চার্লস হন রয়্যাল এয়ারফোর্সের হেলিকপটার চালক।

আমাদের স্বাধীন ভারতের চাষীর ছেলে চাষীই হবে, জোলার ছেলে জোলা,

মেথরের ছেলে মেথর আর মুচীর ছেলে মুচী বা বড় জোর কোনো কলের কুলী মজুর বা রিক্সাওয়ালা বা সিডিউল কাস্টের বরাত জোরে কোনো অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী।

এর বেশী আমরা ভাবতেও পারি না। আর আমাদের তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতাদের কাছে তা প্রত্যাশিতও নয়। এটা যেন 'মিটিং কা কাপড়া'। অন্য সময় দামী জামা-কাপড়। মিটিং-এ গেলে খদ্দর। গরীবানা দেখাতে হবে তো। মনে মনে কিন্তু দারুণ বুর্জোয়া।

কথায় কথায় আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। রাজভবনের দপ্তরী জানকী পাণ্ডের হঠাৎ কলকাতায় বাস দুর্ঘটনায় ডান হাতটা কাটা পড়ে যায়।

এই কর্মচারীটি অত্যন্ত সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল, সে মন প্রাণ দিয়ে অফিসের, কাজকর্ম করতো। যখন এই সংবাদ রাজভবনে ইংরেজ সাহেব সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ করিডনের কানে পৌঁছুল তিনি তখন গম্ভীর হয়ে বললেন— ইংরেজ কাজের মূল্য বোঝে। আমি মেডিকেল কলেজে ফোন করে তার চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ও সেরে উঠলে ওর চাকরী যাবে না। ওকে সাহায্য করার জন্য আমি আরেক জন লোক নেব। সম্ভব হলে ওর বড় ছেলে থাকলে তাকেই নেব চাকরীতে। ও বসে বসে মাইনে পাবে। ছেলে ওকে সাহায্য করবে কাজে। ইংরেজ কখনও নিমক-হারাম হয় না। আজও রাজভবনের জানকী পাণ্ডের ছেলে লিফটম্যানের কাজ করছে বহাল তবিয়তে।

এখন কলকাতা রাজভবনের এক বছরের বার্ষিক খরচের হিসেব দেওয়া হচ্ছে— (ষাট দশকের)

		বরাদ্দ	যথার্থ খরচের পরিমাণ
(১)	সামচুয়ারী এ্যালাউয়েন্স পাবলিক হসপিটালেটি	২২,৫০০	৫২,৪৭৬.৫২ প.
(২)	রিনিউয়ানস্ অব ফারনিসিং	১৭,৫০০	১৩,০৯৩.৭৮ প.
(৩)	মিলিটারী সেক্রেটারী ও তার দপ্তরের জন্য	১,২৫,৫০০	১,৯২,২৯৩'৩৬ প.
(৪)	আমোদ-প্রমোদের জন্য	৫,০০০	৩৫২'০৫ প.
(৫)	ডাক্তার ও তার দপ্তরের জন্য	১৭,০০০	সঠিক খরচ পাওয়া যায় নি।
(৬)	মেণ্টনেস্ এণ্ড রিপেয়ার অব ফারনিসিং অব অফিসিয়াল কোয়াটর্স	২৫,০০০	৩২,৩৮৯'৬১ প.
(৭)	কনট্রাকট এলাউয়েন্স ও মটর গাড়ীর খরচ সমেত অন্যান্য খরচ	১,৩০.০০০	২,১৮,৫১৩,৪৫ প.
(৮)	ট্যুর—ঘোরাঘুরি খরচ	৪৬,০০০	১,৩১,০০০
(৯)	রেলওয়ে সেলুন বাবদ খরচ	৮,০০০	৮,০০০

(১০) ইকুপমেণ্ট এ্যালাউয়েন্স	১,৬০০	খরচ পাওয়া যায় নি
(১১) গভর্ণরস স্টেট কলকাতা, ব্যারাকপুর, দার্জিলিং	৫,৯০,০০০	২৩,১৩,৫৫১.০৯

এ সব খরচ ছাড়াও আরও দু'চার হাজার টাকা-এদিক ওদিক খরচ হয়।

এই তো সেদিন ১৯৬৭ সালে ধর্মবীর রাজ্যপাল হয়ে এসেই বক্তৃতা দিলেন—রাজভবনের রঙিন ফুল মানুষ খাবে না। ওতে মানুষের পেট ভরবে না। রাজভবনে সব্জীর চাষ করো। দেশে যখন খাদ্যাভাব তখন ব্যারাকপুর লাটবাগানের বিস্তীর্ণ জমি চষে ফেল। সব্জী ফলাও।

তাঁর আদেশে নিযুক্ত হলো নতুন করে গার্ডেন সুপারিনটেনডেনট ও এ্যাসিসটেণ্ট ফার্ম ম্যানেজার রাজভবনের চাষ আবাদ তদারকি করবার জন্য। শুধু চাষ আবাদ করতেই ধর্মবীরের সময় ১৯৬৭—১৯৬৮, ১৯৬৮—১৯৬৯, এই দুই বছরে যথাক্রমে ১,৪৫,০০০ হাজার ও ১,৯০,০০০ হাজার টাকা ব্যারাকপুরের বাগানে খরচ করা হলো।

আর সব্জী ও গম বিক্রী করে আয় হলো প্রথম বছরে ২,০০০ হাজার ও দ্বিতীয় বছরে ৩,০০০ হাজার টাকা, একুনে মোট ৫,০০০ হাজার টাকা।

অফিসার ও কর্মচারীদের নৈপুণ্য ও সততার এ এক চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যি হে সেলুকাস। কী বিচিত্র এই দেশ? আর বিচিত্র এই দেশের মানুষজন। তবে এর ভেতর চুরির কারসাজি আছে কিনা জানি না।

রাজ্যপালের নিজের একটা ত্রাণ তহবিল আছে। এখান থেকে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী, বেকার, অভাবগ্রস্ত লোক, কঠিন পীড়ায় শয্যাগত রোগী, বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার লোক-জনের কিছু কিছু খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়;

এই বাবদে রোজ রাজভবনে দশ-পনেরোটা দরখাস্ত আসে সাহায্যের আবেদন নিয়ে। বিচিত্র আমাদের দেশ। বিচিত্র আমরা জাতি হিসেবে বাঙালী। এখানে এমন অনেক দরখাস্ত পাওয়া যায় যার সারমর্ম পরে পুলিশের মারফৎ সম্পূর্ণ অসত্য বর্ণিত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন বিখ্যাত জমিদারের বাউণ্ডুলে ছেলে রাজ্যপালের কাছে আবেদন করেছে খাবার টাকা নেই। যেমন ভদ্রলোকের কোনো কন্যাই নেই, তিনি রাজ্যপালের কাছে সাহায্য চেয়েছেন কল্পিত কন্যার বিবাহের জন্য। যায় বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ সে আবেদন করেছেন পড়াশোনার খরচের জন্য। আরও কত কী।…

কলকাতার রাজভবনে আরও কত রকম দরখাস্ত আসে প্রত্যহ তার ইয়ত্তা নেই। সত্যি সত্যিই ব্যাকুল দুর্ভাবনাগ্রস্ত মানুষ এখনও রাজ্যপালকে কী সম্মানের চক্ষেই না দেখেন, তা দরখাস্তগুলি পড়ে বোঝা যায়।

কেউ লিখেছেন অবাধ্য পুত্রের নির্যাতনের কথা। কেউ হয়তো লিখেছেন গ্রামের রাস্তা মেরামতির কথা। কেউ লিখেছেন কোনো বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর

দুর্নীতির কথা। কোনো ভদ্রমহিলা হয়তো অভিযোগ পাঠিয়েছেন তার ডাক্তার স্বামীর অত্যধিক মদ্যপানের কথা। ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম অভিযোগ।

রাজ্যপাল যতটা পারেন দরখাস্ত দেখে শুনে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত পাঠিয়ে দুস্থ লোকদের মুস্কিল আশানের নির্দেশ দেন, আর কলকাতার কেস হলে ডি. সি. ডি. ডির কাছে।

কাজ কতটা হয় তা কে জানে। তবে কিছুটাতো হয়ই। কারণ রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দিয়েও চিঠি আসে রাজভবনে ঐ সব দুঃস্থ লোকদের কাছ থেকে এও দেখেছি।

একবার কিছুদিন আগে কলকাতায় একটা বিখ্যাত দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রে একটা খবর বেরিয়েছিল যে মেদিনীপুরবাসী জনৈক ব্যক্তি কিছু অর্থ সাহায্য চেয়ে স্বয়ং ইংলণ্ডে রাণী কুইন এলিজাবেথের কাছে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিল।

রাণীর বাকিংহাম প্যালেস থেকে স্বাধীন ভারতের দিল্লীতে এ দরখাস্তটি ফেরৎ পাঠানো হয়। দিল্লী থেকে আবার বাংলা সরকারকে সেটি ফেরত দেয়। পর্যায়ক্রমে সেটা রাজ্যপালের কাছে আসে। রাজ্যপাল খোঁজখবর নিয়ে মেদিনীপুরবাসী সেই ভদ্রলোকটিকে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন স্বাধীন ভারত এখনো হয়তো ইংরেজের পরাধীনে আছে বা কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে ইংলণ্ডের রাণীর কথা শুনতে ভারত বাধ্য। তাই তার এই অপপ্রয়াস।

তেমনি আবার অপরপক্ষে খাস ইংলণ্ডের মাটি হয়েও সুদূর পশ্চিমবাংলার মহামান্য রাজ্যপালের কাছেও অনেক দরখাস্ত আসে।

বেশ কিছুদিন পূর্বে সেরকম একটা দরখাস্ত রাজভবনে এসেছিল। দরখাস্তকারীর নাম ডি আউটরাম। বিখ্যাত বৃটিশ জেনারেল আউটরামের গ্রানডসন বা প্রপৌত্র।

চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে যেখানে এখন মহাত্মাজীর মূর্তি (মেট্রো রেলের জন্য এখন ময়দানে স্থানান্তরিত) যেখানে পূর্বে এই বীর আউটরামের ঘোড়ায় চড়া বিখ্যাত তেজীয়ান মূর্তি ছিল।

এই রকম সুন্দর মূর্তি সুদুর্লভ। তা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র পৃথিবীতে। বাংলার দৈনিক বিখ্যাত স্টেটসম্যান লিখেছিল পৃথিবীর বিখ্যাত সাতটি স্ট্যাচুর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। দেশ স্বাধীন হলে সেই আউটরামের স্ট্যাচু সরিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচু সেখানে সসম্মানে স্থাপন করা হয়।

কিন্তু এই স্ট্যাচু সড়ানোর পন্থাটি সেই ইংরেজ তনয়ের ভাল লাগে নি। মূর্তিটির গলায় পাঁয়ে দড়ি বেঁধে তাঁর প্রপিতামহকে কলকাতার রাস্তায় ছেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া ইংরেজ জাত্যাভিমানে ঘা দিয়েছিল।—এই খবরটি কোনোক্রমে বিলাতে গিয়ে পেঁছায়। তাতেই পরলোকগত আউটরামের প্রপৌত্রের এই বিষোদগার।...

খাস রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব কোণে বর্তমান মন্ত্রীনিবাস বেশ ব্যয় বাহুল্যের সঙ্গে নির্মিত হয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের আমলে। যদিও এর প্রাথমিক পরিকল্পনা হয় রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজুর আমলে।

এই উভয়দিকের মন্ত্রীনিবাসে সবশুদ্ধ আটটি চার কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বা স্যুইট আছে।

কংগ্রেস আমলে একাদিক্রমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেসী মন্ত্রী খগেন দাসগুপ্ত, আবদুস সাত্তার প্রভৃতিরা অনেকদিন এখানে ব্যয়বহুল সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে দিন কাটিয়ে গেছেন।

১৯৬৭ সালে এই রাজভবনের মন্ত্রীনিবাসে যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী থাকতে চাননি। প্রথমে বেশ কয়েকজন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী চেয়েছিলেন এই মন্ত্রীনিবাসে থাকতে। কিন্তু পরে তাঁরা ভেবেছেন রাজভবনের মন্ত্রীনিবাসে সাদাসিধে ভাবে থাকতে চাইলেও রাজভবনের গুটিকয় অফিসারের গায়ে পড়া যে অভ্যেস আছে তাতে মন্ত্রীরা অনিচ্ছা সত্বেও মন্ত্রীনিবাসে ব্যয়বহুল জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। তবে পরে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের ও ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের জনা কয়েক মন্ত্রী এখানে ছিল।

রাজভবনের এই রকম একটা বহু পুরাতন অফিসার হচ্ছেন মিঃ ভাস্কর সেন। তিনি সম্প্রতি সরকারী কর্মজীবন হতে অনিচ্ছাসত্বেও বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই অফিসারটির দাপট ও অভদ্র ব্যবহারে রাজভবনের প্রতিটি কর্মচারী উত্যক্ত ও নিপীড়িত ছিল।

তাঁর কথায় অকথায় শাসানি ছিল—'রাজভবন থেকে খেদিয়ে দেবো',—'মেরে তাড়িয়ে দেবো'—'এটা কি জমিদারী সেরেস্তা পেয়েছ', ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এই অফিসারটিই আবার লাট বা বাইরের কোনো গণ্যমান্য ভি. আই. পি. রাজভবনে এলে যে রকম নির্লজ্জভাবে তাদের আপ্যায়নের নামে তৈলমর্দন করতেন তা রাজভবনের ছোট বড় সকল কর্মচারীর চোখেই ভীষণ বিসদৃশ্য লাগতো।

আগেই বলেছি শ্রীমতী পদ্মজা যখন পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল ছিলেন তাঁর কুকুর ও বেড়াল অনেকগুলি ছিল নিত্য সঙ্গী।

তিনি যখন রাজভবনে ঘুরতেন তখন তারাও পদ্মজার সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনে ঘুরতো। এই ছবি প্রায় প্রতি রাজভবন কর্মচারীরই চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রায়ই দেখা যেতো এই অফিসার মিঃ ভাস্কর সেন নির্লজ্জভাবে পদ্মজার সামনেই যে কোনো তাঁর একটি কুকুর বা বেড়ালকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করছেন। আর রাজ্যপাল পদ্মজাও মৃদু হেসে ঐ অফিসারটিকে তারিফ করছেন।

এই মিঃ সেন অফিসারটি সব সময়েই তাঁর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সামনে মাথা চুলকাতে চুলকাতে কথার উত্তর দিতেন। কিন্তু অধস্তন কর্মচারীর কাছে যমের

ডুপলিকেট ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে দেখে রাজভবনের অনেক কর্মচারীরই এই বদ অভ্যাস আয়ত্ত হয়ে গেছে।

এই অফিসারটির ভাগ্য তথা তদবিরের এত জোর ছিল যে রিটায়ারের পরও দু'তিন বছর রিএমপ্লয়মেন্ট পেয়ে বহাল তবিয়তে রাজভবনে কাজ করে গেলেন। অবশ্যি যদিও সেটা ছিল কংগ্রেস আমল।

উনিশশো সাতষট্টি সালের যুক্তফ্রন্টের সময় অনেক তদারকি করেও তার সে জারিজুরি খাটল না। তাঁকে রাজভবন থেকে বিদায় নিতে হলো। আর সে বিদায় অতি করুণ। যে ব্যক্তি দীর্ঘ আঠারো বছর রাজভবনে এতো দাপটে ও মুরুব্বিয়ানায় কাটিয়ে গেলেন তাঁর বিদায়ের সময় নিয়মমাফিক একটি বিদায় সম্বর্ধনা মিটিং ও হলো না রাজভবনের কর্মচারীদের তরফ থেকে।

তিনি রাজভবন থেকে যাবার প্রাক্কালে মনে মনে হয়তো ব্যথিত হয়ে ভেবেছিলেন যে এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের মিষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারই চিরদিন মনে জাগ্রত থাকে। থাকে না কোনো টাকাকড়ি বা পদমর্যাদার গৌরব। কর্মচারীরা সুযোগ খোঁজে কখন তার ওপরওয়ালা রিটায়ার করবে। তাঁর পদাধিকারে কাউকেই বদলির কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তখনই সেই সব অধস্তন নিপীড়িত কর্মচারীরা তাঁর পূর্ব ব্যবহারের বদলা নেয়। বুঝিয়ে দেয় আকার-ইঙ্গিতে সেই সনাতন পুরাতন প্রবাদ 'সুইট ওয়ার্ডস্ কস্টস্ নাথিং বাট ইট গেনস্ এভরিথিং।'—প্রেম ভালবাসা মিষ্টি ব্যবহারই মানুষের চিরদিনের আত্মীয়তায় শেষ সম্বল।

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজভবনের প্রায় একশো বিঘে জমির মধ্যে খাস রাজভবনের বাড়ীটি ছাড়া একটা 'মিনিয়েচার' বোটানিক্যাল গার্ডেন ও দুটি ছোট ছোট পুকুর আছে। রাজভবনের ঘন গাছপালা বিশিষ্ট বাগানের মধ্যে এমন সব গাছ-গাছড়া আছে যা পৃথিবীর অনেক বড় বড় বোটানিক্যাল গার্ডেনে নেই—এও বলা হয়েছে।

রাজভবনের মধ্যে আছে বৃটিশ আমলে সযত্নে প্রোথিত রবার গাছ, নানা রকমের পাম গাছ প্রভৃতি।

নানারকম অরকিড বা টবের গাছ সব সময়ে রাজভবনের প্রয়োজনে লাগাবার জন্য মজুত করা আছে রাজভবনে বাগানের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ইংরেজ আমলের নির্মিত সুন্দর গ্লাস হাউস ও নয়নাভিরাম গ্রীন হাউস দুটিতে। সুন্দর পাতায় ঘেরা এই ছোট্ট কুটির দুটি রাজভবনের বাগানের হৃদপিণ্ড-প্রাণ। এর একটু দূরেই আছে সেই বৃটিশ আমলে তৈরী নানা আবর্জনা ও ঝড়ে পড়া গাছপালার পাতা পচিয়ে সার করবার দেশী 'ভ্যাট' বা চৌবাচ্চা।

দেশ স্বাধীন হবার পর রাজভবনে হাজার হাজর টাকার সার কেনা হচ্ছে সুন্দর গাছপালা বা নূতন বাগান করবার জন্য।

কিন্তু সেই কোন বৃটিশ যুগে রাজবাগানের মধ্যে স্রেফ ইট দিয়ে তৈরী করা 'ভ্যাট' বা কুয়ো জাতীয় সারের কারখানা থেকে সুদূর লণ্ডন ও ইউরোপেও এই

সার রপ্তানি হতো। এখনও রাজভবনের পুরাতন কাগজপত্র ঘাটলে দেখা যায় সেই সব সারের বেচা কেনার জন্য একাউণ্টসে যে 'হেড' ছিল তাকে লণ্ডন স্টোর্স হেড বলতো।

দেশ স্বাধীন হবার মাত্র দু'চার বছর পূর্বেও এখানে পচানো গোবর ও পচানো পাতার সারের গুণাগুণ পরীক্ষারত তদানীন্তন রাজভবনের খাঁটি ইংরেজ সুপারিনটেনডেণ্ট ওয়াটসন্ সাহেবকে গোবরে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে দেখেছে এমন লোক এখনও রাজভবনে দু'চারজন আছেন। ধন্য স্বাধীন দেশের সুসভ্য কর্তব্যপরায়ণ বৃটিশ নাগরিক ও ধন্য তাদের কর্তব্যবোধ।

সবটা কাঁচে-ঢাকা রাজভবনের গ্লাস হাউসে আছে শত শত টবে নানারকম দুষ্প্রাপ্য অরকিড, মানি প্লাণ্ট, সাহারা মরুভূমির দুষ্প্রাপ্য পাদপাদপের সযত্নে রক্ষিত চারা।

রাজভবনের 'গ্রীন হাউস' তো একটি দেখবার জিনিস।

এই সুন্দর মনোরম পাতায় ছাওয়া লতাগুল্ম ভরা কুটিরটির মধ্যে আছে সদা জল উচ্ছ্বসিত শ্বেত পাথরের ফোয়ারা, আছে ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী বয়ে যাবার মতো নানা রং-এর নুড়ি ছড়ানো ছোট্ট খাল, আছে মির্জাপুরী লাল পাথরের তৈরী ছোট্ট ছোট্ট বসবার উঁচু আসন।

কতদিন কতো সন্ধ্যায় দূরপ্রবাসী ইংরেজ লাট ও লাটগিন্নীরা যে এখানে বসে স্বদেশের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন তার ইতিহাস খুব কম লোকই জানে।

ইদানীং কালে সৌন্দর্য পিয়াসিনী কবি কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর দুহিতা রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা ও হরেন্দ্র বনিতা ছাড়া এই গ্রীন হাঁউস কারুরই স্নেহধন্য হয়ে ওঠে নি।

বৈশাখের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে, শীতের কুহেলীভরা শান্ত সন্ধ্যায়, বসন্তের দখিনা বাতাসের মৃদু আলোড়নে এই ফেলে আসা ছায়াশীতল গ্রীন হাউসের ফোয়ারার কাছে বসলে মানুষের অনেক দঃখের, অনেক বেদনার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এই সবুজ গ্রীন হাউস রাজভবনে আজ অবহেলিত। একে দেখবার, পরিচর্যা করবার, সুন্দরী রূপসীর সাজে গড়ে তুলবার লোকের অত্যন্ত অভাব। স্বাধীন ভারতে রাজ্যপাল, লেডী সাহেবরা, বিভিন্ন পার্টি ফাংশন নিয়েই সদা ব্যস্ত। কোথায় মিলবে রাজভবনে মিস্ এমিলি ইডেনের মতো ইংরেজ তনয়া, কোথায় দেখা পাবো ইংরেজ গভর্ণর পত্নী অত্যন্ত পুষ্প প্রেমিকা মিসেস লেডী জ্যাকসনের, কোথায় মিলবে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীশ্রী রাজ্যপাল হরেন্দ্র-বণিতা বঙ্গবালা মুখার্জির সজীব স্নেহস্পর্শ।

কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল

১৮০৩ সালে কলকাতার এই লাটবাড়ী তৈরী হবার পর এই বাড়ীতে যত সব দোদণ্ডপ্রতাপ লাটেরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁদের কড়া মেজাজী লাট গিন্নীরাও ছিলেন।

কিন্তু রাজভবনের খাস লাইব্রেরীতে যে কয়েক খানা দুষ্প্রাপ্য এই লাটদের ও এই লাটবাড়ী সম্বন্ধে পুস্তক আছে সেগুলি অনেক কৌতূহল নিয়ে পড়েও এই লাটদের গিন্নী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা দেখতে পাই নি।

লাটদের সম্বন্ধে শুধু লেখা আছে কোন তারিখে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ আইন চালু করতে মনস্থ করেন, কোন তারিখে ১৮৯৯ সালে কার্জনের সময় এই লাটবাড়ীতেও প্রথম ইলেকট্রিসিটি আসে, কবে বেন্টিক কী পর্যায়ের মধ্যে দেশের সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন বলবৎ করেন, এই লাটবাড়ী তৈরী করাতে ১৮৫৩ সালে লর্ড ওয়েলেসলির কতো বেগ পেতে হয়েছিল, এই লাটবাড়ীতে বাংলার তথা ভারতবর্ষের কোন কোন মনীষীর পদধূলি পড়েছিল, মহাত্মা গান্ধী কত সালে এই লাটবাড়ীতে এসেছিলেন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কী পরিবেশে এই লাটবাড়ী থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কখনো কলকাতার লাটবাড়ীতে পদার্পণ করেন নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বৃটিশ লাটগিন্নীদের সম্বন্ধে কিছুই এই সব বই-এ লেখা নেই।

কেবলমাত্র দু'এক জায়গায় পেয়েছি যে লাট জ্যাকসনের মিসেস লেডী জ্যাকসন এই লাটভবন ও দার্জিলিং-এর রাজভবনকে ফুলের ও গাছের সৌন্দর্যে সাজাতে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন, তিনি খুব পুষ্পপ্রেমী ছিলেন, দার্জিলিং-এর লাটবাড়ীর গ্লাস হাউস যেখানে দুষ্প্রাপ্য 'বার্ড অব প্যারাডাইস' এখন ফুটন্ত অবস্থায় দেখা যায় সেটা নাকি তারই ইচ্ছায় লাগানো হয়েছিল ইত্যাদি।

ব্যস এই পর্যন্ত এর বেশী আর কিছু নেই।

এই সব বই এ আরও একজন বৃটিশ মহিলার সবিস্তার গুণকীর্তন করা হয়েছে।

তিনি হচ্ছেন মিস এমিলি ইডেন। যাঁর নামে ও যাঁর সৌন্দর্য্য প্রীতিকে সমুজ্জ্বল করে রাখবার জন্য তখনকার দিনে আজকের ইডেন উদ্যানকে ইডেন গার্ডেন নামে ভূষিত করা হয়েছিল এবং যার পরিকল্পিত রূপেই তখনকার দিনে ময়দানের ঐ অংশে ঐ রূপ সুন্দর উদ্যান তৈরী হয়েছিল। শীতের মরসুমে যেখানে ফুটে ওঠে যৌবনচঞ্চলা ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে যেখানে গন্ধস্তবক ছড়িয়ে দেয় রজনীগন্ধা, প্রভৃতি।

এই চিরকুমারী ভদ্রমহিলা যদিও লাটগিন্নী ছিলেন না তবু যে কলকাতার রাজভবন ও তার আশে পাশের অংশকে সাজাতে নিজে কতটা পরিশ্রম করেছিলেন তার বর্ণনা এই সব লাটবাড়ীতে রাখা দুষ্প্রাপ্য গুটিকয় পুস্তকে লেখা দেখতে পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি ইনি লাটগিন্নী ছিলেন না। ইনি ছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন। এঁরা দুই বোন এমিলি ইডেন ও ছোট বোন ফ্যানী এই লাটবাড়ীতে ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত নিজের অবিবাহিত প্রিয় লাট অকল্যাণ্ডের সঙ্গে সুমধুর স্মৃতিতে কাটিয়ে গেছেন। তখনও সাম্প্রতিক কালের আধুনিক যুগের এই বহু বিতর্কিত "আপনি ও কোপনীর" যুগ আরম্ভ-হয়নি যাকে শুধু বাংলায় Husband, wife and children-এর ফ্যামিলি বলে তখন খালি ভারতবর্ষেই নয় সুদূর ইউরোপেও ভাই বোনের ভালবাসার যুগ ফুরায় নি। তাই তো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর পঙ্গু অবিবাহিত বোনকে কাঁধে নিয়ে নিজে আজীবন চিরকুমার থেকে গেছেন।

এঁরা উভয়েই রাজভবনের বাগানের সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই মশগুল ছিলেন এবং এটাই ছিল এঁদের হবি, বিশেষত্ব বা প্রেম—যেমন ধুপের স্বর্গীয় প্রেম থাকে নিজে খাক হয়ে নিজের সুগন্ধে মিলিয়ে যাওয়া। যেমন চকোরের প্রেম থাকে জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের সুধা পান করে নিঃশেষে সুদূর নভে একাকিনী হয়ে ক্লান্ত পাখা মেলে দেওয়া।

১৮৩৬ সাল। চার্লস মেটকাফের পর নতুন গভর্ণর জেনারেল হয়ে কলকাতায় এলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। তিনি বিয়ে করেন নি। সঙ্গে এলো কিন্তু দুই বোন। এমিলি ইডেন ও তার ছোট বোন ফ্যানী।

অকল্যাণ্ডের পাঁচ ভাই আট বোন। ছ বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাকী এঁরা দুজন। দাদার সঙ্গে ভারী দোস্তী। তাই যখন শুনলে দাদা যাচ্ছে ভারতবর্ষে, বোনেরাও ধরে বসলো দাদার সঙ্গে সঙ্গী হবার জন্য। এমিলির স্বাস্থ্য ছেলেবেলা থেকেই তেমন শক্ত নয়। অনেকে ভয় দেখালো ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়ায় তার রোগা শরীর আরও ভাঙ্গতে পারে।

যা হবার হবে, এমিলির বায়না আমি যাবোই। দুই বোন সত্যিই চলে এলো কলকাতায়। এমিলির অনেক গুণ। লিখতে পারেন, আঁকতেও পারেন। নিজের আঁকা ছবির বইও বেরিয়েছে তাঁর। কবি কবি মন। তাই যে শহরে বাস সেটাকে ছবি ছবি দেখতে তাঁর ভারী সাধ।

বাগান নেই কলকাতায় এটা তার চোখে পড়েছিল। তাই নিজের চেষ্টায় তিনি উঠে পড়ে লাগলেন নিবিড় শ্যামল কুন্তলা ঘন বীথি ঘেরা বাগান পরিকল্পনায়। তারই ফলশ্রুতি বর্তমান ইডেন গার্ডেন। কলকাতার নন্দন কানন।

কেউ মনে করেন জমিটা রাণী রাসমণির উপহার দেওয়া মিস ইডেনকে।

কেউ মনে করেন জায়গাটা মিরজাফরের কাছ থেকে সিরাজউদ্দোলার কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেছিল ইংরেজরা।

মাটিতে সবুজ ঘাস। রঙীন ফুল গাছে গাছে। পশ্চিম দিকে ব্যান্ড স্ট্যান্ড। প্রত্যেকদিন বিকেলে ফোর্ট উইলিয়মের বাজনাদার এসে বাজনা বাজাতো সেখানে। রাত্রিতে যেন হাসনুহানা ফুলের মতো জ্যোৎস্না ফুটতো, এমন আলোকসজ্জা চারপাশে।

রেঙ্গুন থেকে বর্মী প্যাগোডা এনে বসানো হয়েছিল এর ভিতরে, মাঝে এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মেরামত হয়েছে প্রায় নতুন করে এই শতাব্দীর সত্তর দশকে। প্রথম লর্ড অকল্যান্ডের প্রতিমূর্তি ছিল এই বাগানের মধ্যে। এখন নেই। ক্যাপ্টেন ফিটজারল্যান্ডের ওপর ভার ছিল বাগান তদারকির। এই বাগানের গায়েই এখানকার পৃথিবী বিখ্যাত ক্রিকেট মাঠ। রনজি ষ্টেডিয়াম। লর্ডস, ওভাল, পার্থ ও মেলবোর্ণ এর মতো সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে।

নিজের গুণপনায় এমিলি কেবল শুধু ইংরেজ মহলেই নন, সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের কাছেও প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ তখন খ্যাতি প্রতিপত্তিতে মাঝ আকাশের সূর্যের মতো। তাঁর বেলগাছিয়া-ভিলা নামে সখের বাগান-বাড়ী ছিল ; সেটা সেকালের দেশী বিদেশী গণ্যমান্যদের মেলামেশার জায়গা। এখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া ইউরোপীয়ান, বাঙালী, পার্শী সকলের কাছেই একটা সৌভাগ্য।

এমিলিকে সম্বর্ধনা জানাতে দ্বারকানাথ এক ভোজসভা ডাকলেন নিজের সেই বাগান বাড়ীতে। তার ঘরে ঘরে আয়না। ঠিকরে পড়ছে আলো। মেঝেয় পাতা মির্জাপুরী কার্পেট। বুটিদার লাল কাপড়, সবুজ সিল্কের পর্দা উড়ছে বাতাসে। শ্বেত পাথরের টেবিলে ফুলের তোড়া।

সিঁড়ি, বারান্দা, বৈঠকখানা, হলঘর দামী দুষ্প্রাপ্য অর্কিড আর লতাপাতার গাছ দিয়ে সাজানো। বাগানের মধ্যে ঝুলন্ত সেতু। লতাপাতা, ফুল, দেবদারু পাতা আর পতাকা দিয়ে মোড়া। উঠোন জুড়ে হাজার হাজার বাতি।

ভোজসভার সঙ্গে নাচের আসর। নাচের সঙ্গে গান। বাইরে তখন আকাশ জুড়ে আলোয় আলোয় আর এক চন্দ্র সূর্যের আকাশ। লাখ লাখ বাজীর নক্ষত্র ফুটছে। ফুটছে আলোর ফুল হয়ে। সেদিনের মতো বাজী পোড়ানো কলকাতার কেউ নাকি দেখেনি কখনো।

কলকাতা লাটবাড়ীর আরও দু' একজন লাটগিন্নী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। লাট কেসীর গিন্নী লেডী কেসী অত্যন্ত সুন্দর অংকনপটীয়সী ছিলেন এবং তিনি ও তাঁর দশ বছরের ছেলে জনকে অনেক সময়েই দেখা যেতো রং তুলি ও ক্যানভাস নিয়ে এই লাটবাড়ীর আশ-পাশের দৃশ্য আঁকতে মশগুল।

লাট কেসী ও লেডী কেসী তো এই রাজভবনের পশ্চিম দিকের বাগানে একটি

নীচু বটগাছে তার ছেলের ছবি আঁকবার জন্য একটা মাঁচা পর্যন্ত তৈরী করে দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে।

এছাড়া আরও একজন লাটগিন্নীর খাদ্যপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতির কথা শোনা যায়। তিনি হচ্ছেন বাংলার লাট লর্ড ক্যানিং-এর সহধর্মিণী লেডী ক্যানিং। যাঁর নামে বাংলার প্রসিদ্ধ মিষ্টি তখনকার দিনে উদ্ভাবিত ও নামাঙ্কিত হয়ে আজও লেডী-কেনী হিসেবে বাংলার মিষ্টির বাজারে প্রসিদ্ধ।

এছাড়া আরও জানা যায় বাংলার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টকারী (১৯৪৩) লাট জন হারবাটের পত্নী লেডী হারবাট সম্বন্ধে। যিনি ইংলন্ডের লর্ড ফ্যামিলীর কন্যা ছিলেন এবং নিজ বংশের আভিজাত্যের দম্ভে তিনি নাকি লাট হারবাটকে তোয়াক্কা করতেন না। কারণ হারবাট নাকি ইংলন্ডের সাধারণ ছেলে এবং খুব নীচু অবস্থা থেকে বাংলার লাট হয়েছিলেন। অনেকটা বৃটিশ রাজ্যের স্তম্ভ লর্ড ক্লাইভের মতো।

এই মিসেস হারবাট নাকি অত্যন্ত নৃত্যপটিয়সী ও বলড্যান্সে তখনকার দিনে অত্যন্ত পাকাপোক্ত ছিলেন এবং ইংরেজ আমলে বড়দিন, ১লা জানুয়ারী নিউ ইয়ার্স ডে-তে এই লাট গিন্নী নাকি এই রাজভবনের তিনতলার সাউথ বলরুমে এ-ডি-সি দের সঙ্গে বাহুলগ্না হয়ে নাচতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।

এছাড়া শোনা যায়, লর্ড ব্রাবোর্ণ-এর পত্নী লেডী ব্রাবোর্ণ অত্যন্ত ঘুমকাতুরে ছিলেন। তাঁর সময় শীতপ্রধান লন্ডনের কায়দা মাফিক ঠিক বেলা নটার পূর্বে রাজভবনের দরজা-জানালা খুলে দেবার হুকুম রাজভবনের বেয়ারা-চাপরাশীদের ছিল না। কারণ ইংলন্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে 'আরলি রাইজ' যেমন সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, সেই আবহাওয়ায় মানুষ লর্ড ও লেডী ব্রাবোর্ণ এখানেও ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও সেই কালচার সদম্ভে চালিয়ে ছিলেন। শীত গ্রীষ্ম সে যাই হোক। রেওয়াজ, রেওয়াজ। খানদান, খানদান।—পড়তি জমিদারও সোনার মোহর দিয়ে নায়েবের নাতনির মুখ দেখেন।

লাটগিন্নী লেডী ব্রাবোর্ণের আরও দু' একটা মজার বাতিক ছিল।

যেমন তিনি হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর রাজভবেন স্যুইটের পাশ দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান রেডিও ষ্টেশনের ডালহৌসী স্কেয়ারের পশ্চিম পাড় দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেখান দিয়ে দুপুরে ও রাত্রে হর্ণ বাজিয়ে কোনো মটর গাড়ী বা ট্রাক চলতে পারবে না। তাতে ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। বড় লোকের পাড়া ডালহৌসী তখন বৃটিশ আমলে রাতে ও দিনে যেন সুসজ্জিত বাসর কন্যা। কোথাও একটুও মালিন্য নেই। একটা স্বপ্নের কুয়াশা যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। দমকল এখানে আসে:আগুন নেভাতে নয় রাজভবনের গাছে গাছে জল ছিটিয়ে দিয়ে পাতার মালিন্য দূর করতে। সুতরাং তখন রাজভবনের চারপাশে গাছের পাতা পড়লেও যেন শোনা যেতো। নিঃশ্চুপ। নিঃঝুম। যেন বাসর ঘরের চোখ চাওয়া-চায়ি আছে কিন্তু তা নিঃশব্দে স্তিমিত আওয়াজে।

এখানে বোধহয় অপ্রাসংগিক হবে না বলা যে এই রকম দু' একটা উদ্ভট নিয়ম লাট শ্রীমতী পদ্মজাও প্রবর্তন করেছিলেন রাজভবনে তাঁর আমলে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাতের দোহাই দিয়ে।

তিনি হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর দিকের স্যুইটের নিচ দিয়ে জুতো পরে কোন পুলিশ প্রহরী ঘোরাফেরা করতে পারবে না। যদিও শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু রাজভবনের তিনতলার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর স্যুইটের পশ্চিমদিকের বর্তমান বিধানসভা হাউস এর মাথায় যে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক ভেপার ল্যাম্প জ্বলে তাতে ঠুলী পরিয়ে দিতে হবে এটাও ছিল তাঁর একটি স্বতন্ত্র হুকুমনামা। কারণ ঐ সুদূরের লাইটে রাত্রে তাঁর ঘুম আসে না —বিছানায় আলো পড়ে।

লেডী ব্র্যাবোর্ণ আর একটি বিষয়ে ক্ষ্যাপা ছিলেন মারাত্মক রকম।

তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে ব্যারাকপুরের লাটবাগানের অতুলনীয় সুন্দর ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন তখন রাত্রে শিয়ালের ডাক ও দুপুর বেলায় গাছে কাকের চিৎকারে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হোত। তিনি তদানীন্তন ব্যারাকপুরের মিলিটারী পুলিশকে হুকুম দিয়েছিলেন ঐ সব পাখীদের বন্দুক দিয়ে মেরে তাড়াতে বা ভয় দেখিয়ে লাটগাবানের চৌহদ্দী ছাড়া করাতে।

আশ্চর্যের কথা কাক ও শিয়াল এই সময়ে ব্যারাকপুর লাটবাগান থেকে প্রাণের ভয়ে বেপাত্তা হয়েছিল—প্রাণের মায়া যে বড় মায়া। এ পৃথিবী ছেড়ে কে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায়।

লেডী ব্রাবোর্ণের বাতিকের অন্ত ছিল না। তিনি পাকাচুলওয়ালা কোনো রাজভবনের কর্মচারী দেখলেই ক্ষেপে উঠতেন। তাকে নকরী থেকে রিটায়ার করতে বলতেন। আর আনসেভড্ দাঁড়ি গজানো মুখ দেখলে তিনি তো রণচন্ডীমা—সাক্ষাৎ কালী তবে গাত্র বর্ণে আলতাদুগ্ধনিভা।

এই প্রসঙ্গে লেডী ব্রাবোর্ণের সততা সম্বন্ধে একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

লেডী ব্রাবোর্ণ অত্যন্ত সুরসিকা ও পুষ্প প্রেমিকা ছিলেন। প্রাতঃকালে ডিসেম্বর মাসে একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি রাজভবনের তাঁর তিনতলায় স্যুইট থেকে নিচে রাজভবনের ফুলের বাগানে বিলম্বিত প্রস্ফুটিত বিরাট নানা রং-এর ও নানা আকারের ডালিয়া দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ তিনি বৃদ্ধ মালী গুণধরকে দিয়ে কয়েকটি ডালিয়া কেটে এনে নিজের শোবার ঘর সাজালেন।

পরের দিন সকালে খাস ইংরেজ গার্ডেন সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ ওয়াটসন সেই গাছের ফুলগুলি দেখতে না পেয়ে তো রেগে খাপ্পা। তাঁর বিনা অনুমতিতে ফুল ভাঙার জন্য গুণধর মালীকে কুড়ি টাকা ফাইন করা হল।

গুণধর মালী তোকাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লেডী ব্রাবোর্ণকে সব জানাল। লেডী একটা কথাও না বলে গুণধরের হাতে ফাইনের কুড়ি টাকা দিলেন তবু—নিজের স্বামী গভর্ণর ব্রাবোর্ণকে ফাইনের প্রতিবাদে মিঃ ওয়াটসন সম্বন্ধে একটি কাথাও বললেন না।

এই হচ্ছে লর্ড ফ্যামিলীর গুণ। ব্লু ব্লাড।

এবার আসা যাক দেশ স্বাধীন হবার পরে লাট গিন্নীদের মেজাজের, আলোচনায়। এটা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে যেমন অবিবাহিতদের সংখ্যাই বেশী তেমনি কল াতার রাজ্যপালদের মধ্যে বিপত্নীক বা অবিবাহিতদের স্থানই বিশেষ সমুজ্জ্বল।

প্রথম রাজ্যপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী, তারপর শ্রীকাটজু, শ্রীধর্মবীর প্রভৃতি রাজ্যপালেরা ছিলেন বিপত্নীক। সুতরাং তাঁদের গিন্নীদের কলকাতার রাজভবনে পদার্পণ হয়নি। তাঁদের মেজাজ বা মর্জির কথা এখানে উঠেই না।

আর অবিবাহিত রাজ্যপাল ছিলেন শ্রীমতী পদ্মজা ও শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী; সুতরাং এঁদেরও তথৈবচ অবস্থা।

এখন সস্ত্রীক রাজ্যপাল যাঁরা এই রাজভবনে এসেছিলেন তাঁদের লেডীদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথমেই ধরা যাক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে। যদিও এঁর স্ত্রী বঙ্গবালা মুখার্জীকে রাজভবনের বেশীর ভাগ লোক "মা" বলেই সম্বোধন করতেন এই এখানকার সদা প্রচলিত নিয়ম লেডী সাহেবের বদলে।

রাজভবনের চৌহুদ্দিতে লাটসাহেবের গিন্নীকে বলা হয় লেডী সাহেব, সেক্রেটারী ও অফিসার পর্যায়ের গিন্নীদের বলা হয় মেমসাহেব এবং সাধারণ চাকুরে বাবুদের গিন্নীদের বলা হয় বৌদি। এটা অলিখিত ডিমারকেশন বা বলতে পারা যায় আনরিটিং কনস্টিটিউশন।

এখানে রাজভবনে সাধারণ চাকুরেদের পদবী হিসেবে পরিচয় থাকে যথা মিঃ বসু, রায়, ঘোষ, চ্যাটার্জী ইত্যাদি ইত্যাদি। অফিসারদের এসজি সাহেব, সেক্রেটারী সাহেব, ডি, এস, জি সাহেব ইত্যাদি। রাজভবনের কোন অফিসারের বউকে মেমসাহেবের বদলে বৌদি বললে তিনি তো তার দিকে চোখ কটমট্ করে তাকান যেন এক্ষুণি ভস্ম করবেন। লাট গিন্নীকে লেডী সাহেব বললেই তিনি আনন্দিত হন এবং এবং এর নিচে বড়জোর ম্যাডামের অপভ্রংশ ম্যাম। ব্যস। ওর নীচে কিছুতেই নয়। ভারতবর্ষের গরীবের ডাক মা বা মাইজী বললে তাঁরা একেবারে ক্ষেপে ওঠেন।

কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন রাজ্যপাল হরেন্দ্র বনিতা শ্রীমতী বঙ্গবালা। রাজভবনে যে তিনি কয় বছর কাটিয়ে গেছেন ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সেই কয় বছর দেখেছি রাজভবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাশ্রীমতী বঙ্গবালাকে 'মা' বলেই সম্বোধন করে এসেছে। এবং শ্রীমতী বঙ্গবালা এই মা নামই বেশী পছন্দ করতেন। ম্যাম বা লেডী সাহেব তাঁর গভীর অরুচি ছিল।

বঙ্গবালা সীমন্তনী হয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে সাধারণ ভাবে বাঙালী গৃহিণীদের মতো সব সময়ে সাধারণ হাতে বোনা মোটা খদ্দরের শাড়ী পরতেন। মাঝে মধ্যে তাঁকে খাঁটি "মুর্শিদাবাদী" সিল্কের শাড়ী পরিহিতাও দেখেছি।

তাঁর আর একটি গুণও উল্লেখনিয় যে তিনি নিজের ও স্বামী রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের জামা-কাপড় প্রায়ই নিজের হাতে কাচতেন। এবং সেগুলি ধুয়ে

রোদে শুকাতে দিতেন। যদিও রাজ্যপালের খাশ নিজস্ব ধোবী রাজভবনে এই কাজকর্ম করবার জন্য সদা সর্বদা মোতায়েন আছে।

বঙ্গবালার আর একটি প্রধানতম গুণ ছিল যে তিনি রাজভবনের সমস্ত কর্মচারীকে সস্নেহে ডেকে ডেকে কুশল সংবাদ ও তাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের সংবাদ নিতেন।

কখনও কখনও দেখা যেতো রাজভবনের কোন ইলেকট্রিক কর্মী বা মজদুর তাঁর সামান্যতম কাজ করলেই তিনি সস্নেহে তার দুহাত ভরে নিজস্ব ঠাণ্ডা আলমারী (ফ্রিজিডিয়ার) থেকে মিষ্টি বা সন্দেশ বের করে তাদের দিচ্ছেন।

কখনও বা সকৌতুকে সেই সব দুখী মজদুরকে বলছেন নিজের হাতে ফ্রিজীডিয়ার থেকে খাবার নিতে এবং পরক্ষণেই সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তাঁর অনুপস্থিতে সে যেন তাঁকে না বলে ওখান থেকে কিছু চুরি করে না খায়। এই কথা বলে ফেলেই তিনি দরদভরা কণ্ঠে সকলের সম্মুখেই হা হা করে হেসে উঠতেন।

খাঁটি সনাতনপন্থী বাঙালী গৃহিণী বলতে যা বোঝায় শ্রীমতী বঙ্গবালা ঠিক সেই রকম একজন সম্পূর্ণ সুরুচিশীলা ভদ্রমহিলা ছিলেন।

তাঁর ইচ্ছে ছিল যে রাজভবনের যে কেউ-ই তাঁকে দেখবে তিনি যেন সব সময়ে বঙ্গবালাকে হাত তুলে আগে-ভাগে নমস্কার করেন বা মা বলে সম্বোধন কবেন। সেই নমস্কারের প্রত্যাভিবাদন উনিও সঙ্গে সঙ্গেই করতেন।

একবার হয়েছিল কী রাজ্যপালের এ. ডি. সি. মিঃ মুখার্জীর আধুনিকা সদ্যাবিবাহিতা স্ত্রী রাজভবনের মারবেল হলে মহিলাদেব একটা সভায় হাইহিল্‌ড্‌ এ গট্‌গট্‌ করে এসে শ্রীমতী বঙ্গবালাকে না নমস্কার করেই আসন গ্রহণ করাতে তিনি খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য কথাটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে সেই এ, ডি, সি, পত্নী তৎক্ষণাৎ তার আসন থেকে উঠে এসে বঙ্গবালাকে নমস্কার করেন এবং তার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

বঙ্গবালার আর একটি গুণ ছিল যে তিনি রাজভবনের যে কোন কর্মচারীর বিবাহ বা শাদীতে উপস্থিত হতে ভালবাসতেন। অবিশ্যি যদি সাহস ভরে তাঁকে ও রাজ্যপালকে সে সব জায়গায় নিমন্ত্রণ করা হতো সাধারণ কর্মচারীদের পক্ষ থেকে।

হরেন্দ্রকুমারের মিতব্যয়ী স্বনামধন্য জীবনে পত্নী বঙ্গবালারও কম দান নেই। কারণ প্রায়ই যা দেখা যায় যে স্বামী হয়তো মিতব্যয়ী, পত্নী দ্বিগুণ খরচে। ফল অর্থাভাব। কিন্তু হরেন্দ্রকুমারের জীবনে স্ত্রী বঙ্গবালাও মিতব্যয়ী।

নিজেই কাপড়-চোপড় ধোন, ব্যারাকপুর লাটবাগানের সাধারণ তরি-তরকারী আদেশ দিয়ে আনান, রাজভবনের দামী প্যানট্রিতে মাছের ঝোল আর লাউ সুক্তো আর মোচা বড়ির ঘণ্ট হয়। স্বামীর ও তাঁর এই রকম সাদাসিধা জীবনযাত্রার

জন্যই শ্রীহরেন্দ্রকুমার বোধ হয় এত অধিক টাকা দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান করে যেতে পেরেছেন, এটা কম কথা নয়।

শ্রীমতী বঙ্গবালার শেষ জীবনের করুণ ঘটনার কথা এখানে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে।

যদিও বাঙালী মাত্রেই জানেন যে বঙ্গবালা রাজ্যপাল স্বামী হরেন্দ্রকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর (১৯৫৬) স্বামীর নিজ বাড়ী কলকাতার ডিহী এনটালিতে চলে যান। এবং একাকী দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে থাকেন। তখন এই তেজস্বিনী স্বনির্ভরশীলা বঙ্গবালা বাড়ীর পাশের রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে নিজের প্রয়োজনে কল থেকে জল তুলতেন।

এই দৃশ্য দেখে ওখানকার অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বঙ্গবালাকে সাহায্য করতে গেছেন, কিন্তু এই নির্ভীক ঋজুশীলা রমণী সকলের সাহায্যই বাতিল করে দিয়েছেন। এ সংবাদ তখনকার দিনের সংবাদপত্রে বার বার বেরিয়েছে। এমন কি তখনকার দিনে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল যে বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাণী মিসেস মহতাব নিজে স্বয়ং বঙ্গবালার কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর মোমিনপুরের রাজপ্রাসাদে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। বৃদ্ধা অপারগ অথচ তেজস্বী বঙ্গবালা সে সাহায্যও সসংকোচে প্রত্যাখান করেছিলেন।

তাঁর মুখে কেবলমাত্র এক বারই কলকাতার রাজভবনের লোকদের বিরুদ্ধে অপযশ করতে শোনা গিয়েছিল সেটা তিনি যখন তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পি-জি হসপিটাল-এ ছিলেন তখনকার ঘটনা।

বঙ্গবালা তখন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের বিধবা পত্নী। হরেন্দ্রকুমার বেশ কয়েক বছর পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন। সুতরাং ডিহী-ইটালির নিঃসঙ্গ বাসিন্দা শ্রীমতী বঙ্গবালার নাম অনেকেই তখন ভুলে গেছেন। তিনি মৃত না জীবিত তার হিসাব বাঙালীরা জানে না। তারা কেবল চিনতো জ্ঞানতপস্বী দানবীর বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারকে। এই যখন দেশের অবস্থা এবং বঙ্গবালা আর্থিক অনটনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পি-জি-হসপিটালে স্থানান্তরিত, তখন জন কয়েক কাগজের সাংবাদিক বঙ্গবালাকে রাজভবনের স্মৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

বঙ্গবালা তাতে শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, রাজভবনে থাকাকালীন তাঁর স্বামীর আমলে যারা সন্ধ্যে সকালে তাঁকে মা-মা বলে ডেকে হাঁপিয়ে উঠতো, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর তাদের আর টিকিটিও কখনো দেখা যায় নি এই বাড়িতে। এইটাই ট্রাজেডী। এইটাই সংসার। এইটাই আধুনিক মানবিক সভ্যতা। যাকে আমরা মানুষের জীবনের প্রগ্রেশ বলি। এভলুউশেন ডেমোক্রাসীর জয়যাত্রা।...

লেডী ডায়াস:—রাজ্যপাল ল্যান্সলট ডায়াস যেমন গম্ভীর মেজাজের, ভারিক্কী চালের লোক ছিলেন—ক্বচিৎ কদাচিৎ মুখে হাসির রেখা দেখা যেতো, তেমনি তাঁর পত্নী

লেডী জোয়ান ডায়াস অত্যন্ত হাসিখুশী ফুর্তিবাজ, সংবেদনশীল মহিলা ছিলেন।

স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বাংলার যতগুলি রাজ্যপাল এসেছেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন তাঁদের প্রায় নব্বই ভাগই বিপত্নীক বা অবিবাহিতা। রাজ্যপাল রাজা গোপালাচারী, রাজ্যপাল কাটজু, ধর্মভীরা প্রভৃতি যেমন বিপত্নীক ছিলেন তেমনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী প্রভৃতি প্রায় সকলেই অবিবাহিতা।

তাই এদের মধ্যে রাজভবনের বাসিন্দা হয়ে যে সব মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যপাল জায়া এই রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর তাঁদেরই কথা স্মরণে আসছে অবিরত।

লেডী ডায়াসের খুব মস্ত বড় একটা গুণ ছিল যে তিনি রাজভবনের অধস্তন চতুর্থ শ্রেণীর চাকর-বাকরদের মাঝে মাঝেই ডেকে তাদের দুঃখ অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনতেন এবং তা দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কতো যে ঝাড়ুদার, বেয়ারা, লিফটম্যান তাঁকে ধরে তাদের পুত্র-পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, দেশওয়ালী ভাইদের এই পশ্চিমবাংলার পুলিশ, রেল, রেডক্রশ ইত্যাদি দপ্তরে চাকরী পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

তাঁর আর একটা মহৎ গুণ ছিল যে নিজের ব্যবহৃত খবরের কাগজ থেকে, শিশি-বোতল, ওষুধের কৌটো, সাবানের মোড়ক, সেণ্টের শিশি, নাতিদের ভাঙ্গা চোরা-প্লাষ্টিকের খেলনা ইত্যাদি সামান্যতম জিনিসও তিনি তাঁর স্যুইটের একটা ঘরে গুদামজাত করে রেখে দিতেন। অবহেলায় ফেলে দিতেন না এবং মাঝে মাঝেই সেগুলি বিভিন্ন চার্চে পাঠিয়ে দিতেন। চার্চগুলি সেগুলি পুরাতন দামে বিক্রী করে বেশ দু' পয়সা রোজগার করতো।

এই অভ্যাসটি হয়তো তাঁর সামান্য কিন্তু এর মধ্যে তাঁর স্বভাবের অনেকখানি প্রকাশিত হতো।

এছাড়া লেডী ডায়াসের আর একটা কৃষ্টিপ্রধান চারিত্রিক গুণ ছিল।

তিনি মহৎ পুরাতন শিল্পসম্ভার, সুন্দর ছবি, পুরাতন কাজ করা, নক্সা আঁকা চিনে মাটির বাসনপত্র, কাট গ্লাস ইত্যাদি অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করতেন এবং এর একটা কালেকশানও ছিল।

তবে বিদেশী গভর্ণর জেনারেল বা গভর্ণরদের পত্নীরা যেমন এগুলি সংগ্রহ করতেন রাজভবনের জন্য, লেডী ডায়াস কিন্তু ওগুলি কিনতেন নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। তাঁর সময়ে রাজভবনের অনেক নক্সাওয়ালা কাঠের ফার্নিচার যা গুদামে উইপোকার খাদ্য হতে চলেছিল তা আবার তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ণ মর্যাদায় রাজভবনের কক্ষে কক্ষে শোভিত হয়।

দামী কুকুর পোষা প্রায় সব রাজ্যপাল বা লেডীদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

শ্রীমতী পদ্মজার তো গোটা ছয়েক এ্যালসেসিয়ান কুকুর ও একটি শ্যামদেশীয় বিড়াল ছিল—যার দাম তখনকার দিনে নাকি বেশ কয়েক শো টাকা।

এই লেডী ডায়াসের নিজের কয়েকটি লোমওয়ালা কুকুর ছিল। তাদের কোনো অসুখ হলে রাজভবনে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। গভর্ণমেণ্ট ভেটেরনারী সার্জনদের ডাকা হতো নিত্য নৈমিত্তিক তাদের ইনজেকসন দেওয়ার জন্য।

একবার তাঁর কুকুরের ইনজেকসন দেওয়া নিয়ে এক মজার কাণ্ড বলি।

তখনকার ডেপুটি সেক্রেটারীর হাত থেকে চারটি ইনজেকসনের এ্যামপুলের মধ্যে একটি পড়ে ভেঙে যায়। সুতরাং সবগুলি ইনজেকসন অসুস্থ কুকুরটিকে দেওয়া হলো না। কিন্তু ডেপুটি সেটা চেপে গেলেন। পরে তাঁর কুকুরের দেখা-শোনার চাকর রাম সিংহাসন সে খবরটা মিসেস ডায়াসকে বলে দেয়।

এতেই রাজভবনে লংকাকাণ্ড। ডেপুটি কেন লেডীকে মিথ্যা বলেছেন। গোপন সূত্রে খবর চাকরটির ডেপুটির প্রতি রাগ ছিল।

আমি রাজভবনের দীর্ঘ চাকরী জীবনের আর একটা অভিজ্ঞতার কথা জীবনেও ভুলবো না। তথাকথিত বড়লোকেরা সাধারণত কখনও নিম্নতন একটি লোকের কথা এক মুহূর্তেই বিশ্বাস করে নেন না। সেটা কোনও না কোনও সময়ে অপর কোনো লোকের কাছে যাচাই করে নেন!

লেডী ডায়াসের আর একটি স্বভাব ছিল প্রায় প্রতি সপ্তাহেই রাজভবনের সমস্ত ঘরের জিনিসপত্র, ফুলদানি, কার্পেট, ডিভান, সোফা ইত্যাদি এ ঘর থেকে ও ঘরে পালটিয়ে দেওয়া হোত যাতে রাজভবনে আগত অতিথিদের কোনো কিছুতেই একঘেয়েমি না লাগে।

তিনি ও তার মেয়ে লায়লা প্রায়ই ইডেন গার্ডেনের গাছের শুকনো ডাল দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাঠের 'কাটুম কুটুম' পর্যায়ের শিল্পসম্ভার বানাতেন ও প্রদর্শনী করে সেগুলি বিক্রীর ব্যবস্থা করতেন।

লেডী ধাওয়ান ঃ—রাজ্যপাল ধাওয়ানের পত্নী শকুন্তলা ধাওয়ান ছিলেন শান্ত শিষ্ট। কিন্তু রাজভবনে মধ্যে কেউ যদি তাঁর কথা না শুনতো তবে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন। তাই তাঁর স্বামী রাজ্যপাল ধাওয়ানকে প্রায়ই বলতে শোনা যেতো—'মানিয়ে হামারা বিবিকে অর্ডর হামারি-ই হ্যায়।

মিসেস ধাওয়ান ছিলেন অতি সংসারী। তাঁর সময়েই রাজভবনের চিরদিনের ঐতিহ্য রাজ্যপালের খানা রাজভবনের প্যানট্রি থেকে সরবরাহ করবার রেওয়াজ বন্ধ হয়। এর বাবদ প্রায় হাজার খানেক টাকা যা রাজ্যপালদের মাইনে থেকে মাসে মাসে কাটা হয়ে থাকে তা তিনি বন্ধ করে দেন।

তিনি তাঁর তিনতলার স্যুইটের পাশে বিপুল ব্যয়ে নূতন পাকশালা নির্মাণ করান—যদিও সমস্ত টাকাটা সরকারী তহবিলের।

লাটবাগান ব্যারাকপুর থেকে তখন নিয়মিত রাজভবনে যে তরিতরকারী আসতো তিনি তা দিয়ে ও কলকাতার বাজার থেকে নামমাত্র জিনিসপত্র খরিদ করে নিজের সংসার নিজেই চালাতেন। এতে তাঁকে মাসে মাসে স্বামীর মাইনে থেকে

অন্যান্য রাজ্যপালদের মতো হাজার খানেক টাকা রাজভবনে গুণগারী দিতে হতোনা।

তিনিই প্রথম নিয়ম করলেন ব্যারাকপুর লাটবাগানের তরিতরকারীর বাক্সে তালা লাগানোর ব্যবস্থা। সেগুলি রোজ ব্যারাকপুর লাটবাগান থেকে এসে সোজাসুজি তাঁর রন্ধনশালায় যাবে। ওখান থেকে সেগুলি খুলে নিজের তত্ত্বাবধানে তরিতরকারীর বিলি ব্যবস্থা করবেন। ব্যারাকপুরে মালীর কাছে একটি চাবি থাকতো ও তাঁর কাছে সেই চাবির একটি ডুপ্লিকেট চাবি থাকতো।

এই নয়া ব্যবস্থায় রাজভবনের দরিদ্র ফোর্থ ক্লাস কর্মচারীরা মনঃক্ষুন্ন হয়েছিল। তাদের ভাগ্যে পূর্বের মতো বিনি পয়সায় বা সামান্য মূল্যে আর তরিতরকারি জুটতো না।

মিসেস শকুন্তলা ধাওয়ানের আর একটি ভারী শখ ছিল।

তিনি কলকাতার স্বর্ণশিল্পীদের করা সোনার গহনা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। কলকাতার বহুবাজারের একটি নামী স্যাকরার দোকানের মালিককে তাই প্রায়ই রাজভবনে আসতে দেখা যেতো। মিসেন ধাওয়ান সেই দোকান থেকে অনেক রকমের সোনার গহনা তৈরী করিয়েছিলেন।

রাজ্যপাল ধরমভীরা বিপত্নীক ছিলেন। কিন্তু রাজভবনে তাঁর সঙ্গে থাকতেন তার ছেলে ইন্দুভীরা ও তাঁর পত্নী আর থাকতেন রাজ্যপাল ধরমভীরার অশীতিপর বৃদ্ধা মা।—তিনি সঙ্গে লাঠি নিয়ে হাঁটতেন। বৃদ্ধা মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে রাজ্যপালকে প্রায়ই দেখা যেতো।

ধরমভীরার ছেলের বউই রাজভবনে লেডী মাফিক কাজকর্ম দেখতেন। এই ছেলের বউকে রাজভবনের সকল কর্মচারীরা "বউরাণী" বলে ডাকতো। এমন কি এই বউরাণীর নাম অনুসারে রাজভবনের একটি সুইটই 'বউরাণী' স্যুইট নাম হয়ে গেছে এবং যে দক্ষিণ পূবের লিফট দিয়ে তিনি ওঠা নামা করতেন সেই লিফটের নাম আজ পর্যন্ত 'বউরাণী' লিফট নামেই খ্যাত।

এই বউরাণী নাকি কলকাতায় বিয়ের পূর্বে পড়াশোনা করেছিলেন তাই তিনি বাংলা বেশ সচ্ছন্দে বলতে ও কিছু কিছু লিখতেও পারতেন। তার সুন্দর স্বভাবে ও ব্যবহারে তিনি রাজভবনের সকলের মন জয় করে গিয়েছিলেন। কোন গেষ্ট রাজভবনে কখন এলো, কখন যাবে, তাদের কি কি খাবার দাবার দিতে হবে তা বউরাণী অতি সুচারুভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। এই বউরাণী সত্যিই রাজভবনের বউরাণীর মতনই ছিলেন।

এখানে রাজভবনের খানা টেবিল সম্বন্ধে গুটিকয় কথা বলবো। সেটাও মজার ব্যাপার।

এক একটা রাজভবনের মান্য অতিথিদের খানা টেবিলে কতো রকমের যে প্লেট সারভ করা হয় তা খুব কম লোকেরই জানা আছে। গেস্টদের খানা টেবিলের

খানা এক একটা খাওয়ার পদ শেষ হচ্ছে আর বাবুর্চি খিদমৎগার বেয়ারা সেই প্লেট নিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার নতুন প্লেটে নতুন খানা দেওয়া হচ্ছে। পুডিং যে প্লেটে দেওয়া হবে, ফ্রাইড রাইস-এর জন্য অন্য প্লেট, আবার চপ কাটলেট যে প্লেটে দেওয়া হবে, মাংসের দো-পেঁয়াজী অন্য প্লেটে, মিষ্টি যে প্লেটে দেওয়া হবে, দই এর জন্য হয়তো অন্য রকমের প্লেট অর্থাৎ ফুল প্লেট, হাফ প্লেট কোয়ার্টার প্লেট, মিনি প্লেট, জাফরাণী রং-এর প্লেট ইত্যাদি।

বউরাণীর কিন্তু এ সব বিষয় নখদর্পণে ছিল।

সেই ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাজভবনের চলা বসায়, খাওয়া দাওয়ায়, সাজ-সজ্জায় সেই বৃটিশ আমলের আদব কায়দা চলে আসছে। রাজভবন এখনও স্বাধীন ভারতের খাঁটি ভারতীয় হয়ে উঠতে পারে নি। যদিও এখানে বলা প্রয়োজন যে কলকাতার রাজভবনে বিভিন্ন পৃথিবীর প্রান্ত থেকে যে সব মেহেমান ব্যক্তি বা রাজপুরুষ আসেন তাদের স্বদেশীয় রুচির খানা-দানার জোগাড় করতে হলে কলকাতার রাজভবনে পৃথিবীর একটা মিনি কসমোপলিটন হোটেল বানাতে হবে। তা সত্যিই সম্ভব নয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার শুভানুধ্যায়ী অনেক বন্ধু বান্ধবের অভিযোগ এই, ভারতবর্ষের রাজভবনগুলিতে ইংলিশ খানা ও কায়দা কানুন পালটিয়ে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-পূর্ণ আবহাওয়ার বাতাবরণ উন্মীলন করা হোক— তবে কথা আছে আপ রুচী খানা পর রুচি পরনা।

রাজ্যপাল পদ্মজা :—এখন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার কথায় আসা যাক্।

কলকাতার রাজভবনে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত রাজ্যপাল এসেছেন তার মধ্যে শ্রীমতী পদ্মজার পদার্পণ একটা স্মরণীয় ঘটনা।

তিনি যেমন বাংলার এই রাজভবনটি একদিকে আধুনিক সজ্জায় সাজিয়েছিলেন তেমনি এই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজভবনটির অনেক ঐতিহ্যপূর্ণ পুরানো ফার্ণিচার, অয়েল পেণ্টিং, স্কেচিং, স্ট্যাচু ইত্যাদি এই রাজভবন থেকে বিদায় দিয়ে ছিলেন। নিলামে বিক্রী করে নামমাত্র দামে বা খয়রাতি ভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে।

এর মধ্যে কলকাতার অনেক দুমূল্য স্কেচিং ছবি ফাইন আর্ট সোসাইটিতে শ্রীমতী লেডী রাণুর তত্ত্বাবধানে এখনও শোভা পাচ্ছে। তবে আনন্দের কথা ছবিগুলি যে কলকাতার রাজভবন থেকে পাওয়া গেছে তা লেডী রাণু ছবির নিচে লিখে দিতে ভোলেন নি।

এ ছাড়া বৃটিশ আমলের অনেক অমূল্য অয়েল পেণ্টিং, অনেক অমূল্য স্ট্যাচু শ্রীমতী পদ্মজা কলকাতার এই ঐতিহাসিক রাজভবনের চত্বর থেকে রাজভবনের অন্ধকারের অতল গর্ভে ফেলে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মূল্যবোধ তাঁর মধ্যে যে কতো কম ছিল, যদিও তাঁর সৌন্দর্য্য বোধ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই,—তা দেশের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা নিরূপণ করবেন।

শ্রীমতী পদ্মজা বিবাহিতা ছিলেন না। সুতরাং তাঁর ছেলে বা ছেলের বউ তাঁর হয়ে এই রাজভবনে তদারকি করতে আসেন নি। কিন্তু সে জায়গা পুষিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অতি অনুগত এক দিল্লীর বান্ধবী মিসেস ব্যাটরা। এই মিসেস ব্যাটরা শ্রীমতী পদ্মজার খালি বান্ধবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অর্ধেক পদ্মজা। তার কথাবার্তায়, মেজাজের চাল চলনে রাজভবনের সকলে তটস্থ থাকতো।

পদ্মজা পূর্বেই রাজভবনে সব কর্মচারীকে বলে দিয়েছিলেন যে মিসেস ব্যাটরার আদেশ যেন সকলে মেনে চলে রাজভবনে। তাই মিসেস ব্যাটরা রাজভবনের বাগান সাজানো থেকে সমস্ত রাজভবন সাজাবার ভার পেয়েছিলেন। শ্রীমতী ব্যাটরার তিরীক্ষি মেজাজে অতিষ্ঠ হয়ে রাজভবনের বাগানের একজন কর্মচারী তার প্রতিবাদ করলে শ্রীমতী পদ্মজার আদেশে সেই কর্মচারী মিঃ পি. সি. সাহার চাকরী যেতে বসেছিল। অতি কষ্টে রাজ্যপালকে অনুনয় বিনয় করে সেই কর্মচারীটির কাজের জায়গা রাজভবনের অন্যত্র করানো হয়।

শ্রীমতী পদ্মজার আর একটি স্বভাব ছিল, তিনি তাঁর পোষা কুকুর বেড়ালকে তাদের সখের দেওয়া নাম ছাড়া অন্য নামে কেউ ডাকলে ক্ষেপে উঠতেন। এই নিয়ে রাজভবনে কতো নামী দামী গেষ্টকে শ্রীমতী পদ্মজার সামনে কতো অপ্রস্তুতে পড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার কুকুরকে কুকুর বা 'ডগ' বললে শ্রীমতী অত্যন্ত ক্ষেপে উঠতেন। বলতেন ওদের সুন্দর নাম আগে জেনে নিন পরে ওদের আদর করবেন। গেষ্টদের নিত্য খাওয়ার মেনু শ্রীমতী পদ্মজা নিজেই তদারকি করতেন।

কোন টেবিলে কোন মেনু দিলে কোন অতিথি কতটা সন্তুষ্ট হবেন তা পদ্মজার নখাগ্রে জানা ছিল। ভেজিটেবল চপেব প্লেটে কোন কোন স্যালাড কী রকম ভাবে সাজাতে হবে সে যেন একটি আর্ট শ্রীমতীর কাছে। তাঁর উদ্ভাবিত পান পাকৌড়ি রাজভবনের এখনও চালু স্ন্যাক্স্। মশলা ছাড়া খিলি পান বেসনে ভাজা।

মিসেস লাহিড়ী :—এর পর আসা যাক রাজ্যপাল সুরজিৎ লাহিড়ীর কথায়। তিনি এই রাজভবনের বেশ কিছুদিন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর সময়ে দেখেছি খাঁটি বাঙালীর অন্দরমহল ও বাহিরমহলে যেমন ফারাক থাকে রাজভবনেও সেই রকম অন্দর মহল ও বাহির মহল ছিল বলে মনে হতো।

শ্রীমতী লাহিড়ীকে খুব কদাচিৎ রাজভবনের কর্মচারী স্বচক্ষে দেখতে পেতেন। তিনি বাঙালীর ঘরের স্নেহশীলা মায়ের মত চওড়া পাড়ের শাড়ী পরে কখনও সখনও রাজভবনের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। তাঁর মুখে লেগে থাকতো সলজ্জ মধুর ভুবন ভোলানো হাসি বাঙালীর স্নেহশীলা মায়েদের মতো।

দেখা গেছে যখন রাজভবনের কর্মচারীদের ডেকে রাজ্যপাল শ্রীসুরজিৎ

লাহিড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন তখন শ্রীমতী লাহিড়ী সলজ্জে সকলের পাশে গিয়ে তাদের আরও কিছু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা রাজভবনের ঘড়ি বাবু গোপী মোহন খামারুকে চৌদ্দটা সন্দেশ খাওয়ানোর পরেও আরও দশটি খাওয়ানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ। তাঁর সে দৃশ্য এখন আমার মনে পড়ে, রাজভবনের ধোবী শ্রীমতী লাহিড়ীর কাছে কাপড় আনতে গেলে শ্রীমতী তার সঙ্গে ঘর কন্নার কথা তাদের ছেলে মেয়ের কথা ঘণ্টা খানেক ধরে বলতেন।

শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীঃ—এর পর আসি শ্রীমতী হরেন্দ্রকুমার মুখাজীর কথায়। তাঁর নাম আজ বাংলাদেশে কে না জানে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে না স্মরণ করেন। এই শ্রীমতী বঙ্গবালা যেন নামের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বঙ্গবালা যেন বাংলাদেশের স্নেহ মমতায়, অভিমান সমবেদনায় সহনশীলতায় ও সৌহার্দ্যে গড়াপেটা একটি সম্পূর্ণ মহিলা।

কলকাতার রাজভবনে সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন হরেন্দ্রকুমারের দান অসামান্য তেমন এই লেডী লাট বঙ্গবালার গুণের সমবেদনার ইতিহাস চিরস্মরণীয়।

রাজভবনের কোনো কর্মচারী যে কোনো দোষ করলেও বঙ্গবালার কাছে 'মা' ডাকে গেলে সে দোষ তখুনি মাফ হয়ে যেতো। বঙ্গবালা সহনশীলতার যেন প্রতিমূর্তি। দেখা যেতো তিনি সব সময়ে লাল চওড়া পেড়ে গরদের শাড়ী পরে মাথায় ক্লীপ আটকানো ঘোমটা টেনে রাজভবনের প্যানট্রি থেকে খাস দপ্তরগুলি ঘুরে ঘুরে পুংখানুপুংখ রূপে দেখে বেড়াতেন।

যে কেউ কর্মচারী তাঁকে দেখলেই 'মা' বলে সম্বোধন করলেঁ তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার সংসারের সব কিছুর খবরা খবর নিতেন।

কেন জানিনা তৎকালীন রাজভবনের প্রায় ৪০০।৫০০ খাশ কর্মচারী শ্রীমতী বঙ্গবালাকে নিজেদের মায়ের সমপর্য্যায়ে ফেলে ছিলেন। সব কিছু সুখ দুঃখ সবাই তার কাছে অকপটে বলতেন। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের কাছে অন্দর মহলের যে সব রিপোর্ট যেতো তিনি যতটা পারতেন স্ত্রীর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ সেক্রেটারীদের দিয়ে সে সব আর্জির ফয়শালা করে দিতেন।

শ্রীমতী বঙ্গবালার আর একটি গুণ বা দোষ যাই বলা হোক না কেন তাঁর চরিত্রে প্রকট ছিল। সেটা হচ্ছে তিনি অত্যন্ত অভিমানী ও আত্মশ্রদ্ধাশীলা মহিলা ছিলেন। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের অকস্মাৎ ১৯৫৬ সালে মৃত্যুতে বঙ্গবালা প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি রাজভবনে রাজ্যপালের স্যুইটে এরপর মাস দুয়েক একাকী নিরিবিলিতে কাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন যখন তিনি বুঝলেন আধুনিক সভ্যতায় লোকের মুখের উপরের ব্যবহারটাই সব—মনে থাকে হলাহল যার অভিব্যক্তি মানুষ সুযোগ পেলেই প্রকাশ করে। আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষের এই স্বভাব তখন তিনি রাজভবনে হাতে নাতে টের পেয়েছিলেন।

বঙ্গবালা তাঁর গভীরতম বিপদের দিনে হতবাক্ হয়ে এই রাজভবনে দেখতে পেলেন যে সকল উচ্চপদস্থ রাজভবনের কর্মচারী তাঁর স্বামী হরেন্দ্রকুমারের জীবতকালে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে জ্ঞান হারাতো তারাই বঙ্গবালার বিপদের দিনে কোথায় যেন উবে গেলো। ক্বচিৎ কদাচিৎ বঙ্গবালা তাদের সামনে পড়লে তারা হাত তুলে নমস্কার জানাতেন। কখনও একবারের জন্যও তারা কেউ ভুলেও এই সম্মানীয় বৃদ্ধার খবরা-খবর নিতেন না। এমনকি এই সকল চতুর কর্মচারীরা হয়তো বুঝে ফেলেছিলেন যে যখন স্বয়ং বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজাই শ্রীমতীর বঙ্গবালার খবরা-খবর নেন না তখন হয়তো আগ বাড়িয়ে বঙ্গবালার খবর নিতে গেলে শ্রীমতী পদ্মজা চটে যাবেন।

তারা জানতেন এখন তো তাদের শ্রীমতী পদ্মজার কাছে চাকরী করতে হবে। সুতরাং যখন যেমন তখন তেমন—এটাই অতি সংসারী চতুর লোকদের স্বভাব। চক্ষুলজ্জা, সাধারণ ভদ্রতা এগুলি দুর্বলদের। তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা কেন জানিনা, বঙ্গবালার কাছে তাঁর স্যুইটে মাত্র বার দুয়েক দেখা করেছিলেন রাজভবনে তাঁর অস্থায়ী সুইট থেকে এসে।

এখানে বঙ্গবালা সম্বন্ধে আরও দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না।

বঙ্গবালা কখনও কারও কাছে শত বিপদেও সাহায্য নিতেন না। চারিত্রিক এই ঋজুতা বঙ্গবালাকে হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর এমন এক অস্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছিল যার জন্য আজ সারা ভারতবাসী, সবিশেষে বাঙালীরা দুঃখিত, লজ্জিত। এ কলঙ্ক বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথায় ঘটে নি।

রামায়ণে রাজনন্দিনী সীতাকে হয়তো দেখা গেছে পঞ্চবটী বনে পর্ণ কুটীর দ্বারে একাকী ম্লান মুখে রামচন্দ্রের আগমণের পথের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন কিন্তু সদ্য প্রয়াত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের পত্নী বঙ্গবালার চিত্র আরও করুণ, আরও বেদনাদায়ক।

হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর ডিহি-এনটালির শ্বশুরভিটেতে বঙ্গবালাকে দেখা যেতো নিজ হাতে রাস্তার কল থেকে বালতি ভর্তি জল তুলছেন, না হয় শ্বশুর-ভিটেতে স্বহস্তে দেওয়ালে দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়ে ফিরছেন। অবাক পথচারীরা রাস্তার দু'ধারে অবাক নয়নে এ দৃশ্য দেখেছে আর আক্ষেপে ফেটে পড়েছে—সর্বস্ব পরার্থে ত্যাগী রাজ্যপাল হরেন মুখার্জীর বিধবা পত্নীর যদি ভবিষ্যৎ তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের কর্ণধার জওহরলাল নেহেরুর সাধের ভারতবর্ষে এইরূপ দশা হয় তবে আমাদের মতো ঘুঁটে কুঁড়োনীর ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ভরা। সাশ্রুপূর্ণ চোখে অনেক পথচারী এগিয়ে এসেছেন বঙ্গবালাকে সাহায্য করতে—এ কার্য থেকে বিরত করতে। কিন্তু অভিমানী বঙ্গবালা কারও কথা শোনেন নি।

আর একটা সামান্য ঘটনা দিয়ে এই অসামান্যা শ্রদ্ধানীয়া রাজ্যপাল জায়া শ্রীমতী বঙ্গবালার কথা শেষ করবো।

তখন বঙ্গবালা এনটালির বাড়ীতে উঠে এসেছেন। ১৯৫৬ সাল। হরেন্দ্র মুখার্জী এই কিছুদিন হলো মারা গেছেন। হঠাৎ কাগজে কাগজে খবর বেরুলে বঙ্গবালা অসুস্থ হয়ে পি. জি. হসপিটালে রয়েছেন। তিনি সেখানে সংবাদ পত্রের কাছে সখেদে উক্তি করেছেন রাজভবনে থাকবার কালে যাঁরা তাঁকে মা-মা বলতে আত্মহারা হয়ে যেতেন এখন এই তাঁর দীর্ঘ দুর্দিনের দিনে তাদের কারও মুখ একবারও দেখা যায় না তাঁর সামনে।

চোখে আঙুল দেওয়া খবরের কাগজের এই খবরের পর রাজভবনের দু'চারজন কর্মচারীকে আমি জনান্তিকে বলতে শুনেছি—যতো সব পাগলের প্রলাপ। তাকে হাসপাতালে দেখা করতে যাই আর টুক করে সেই খবরটা কেউ বড়কর্তার কানে লাগিয়ে দিক।—আর আমি ফ্যাসাদে পড়ি। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। গদী গেলে তার আবার মূল্য কী।—রামচন্দ্রকে স্ত্রীর হাত ধরে পায়ে হেঁটে অযোধ্যা শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। পঞ্চবটীতে তো তাদের সব খালি পা। আমাদের দশাও তাই হোক আর কি? চাকরী গেলে স্ত্রী পুত্র নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। আবার আসি পদ্মজার কথায়।

অত্যন্ত সৌখীন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার নিজের কতগুলি বাতিক ছিল। যেমন যতদিন তিনি কলকাতার রাজভবনে কাটিয়ে গেছেন তাঁর হুকুম ছিল, যতো ইলেকট্রিক "পুশ বেল" আছে স্যুইটে স্যুইটে সেগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কোন ময়লা যেন লেগে না থাকে পুশ বেলে। পুশ বেলে কেউ কী সাবান দেয়?

শ্রীমতী পদ্মজার এতো জুতো ও স্লিপার ছিল যে সেগুলি রাখবার জন্য রাজভবনে নূতন একটা মেহগিনী কাঠের বড় আলমারি করতে হয়েছিল। এবং আলমারিতে প্রত্যেক থাকে থাকে ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করতে হয়েছিল। কারণ যখন রাজ্যপাল পদ্মজা বাইরে যাবেন তিনি যেন শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে জুতো পায়ে দিতে পারেন।

এই প্রসংগে বলা হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না যে শ্রীমতী পদ্মজার এতো শাড়ী সায়া, অন্তর্বাস, জুতো, রুজ, লিপষ্টিক, নানা রকমের আয়না ইত্যাদি ছিল যে কলকাতার রাজভবনের সমস্ত বেয়ারা বাবুর্চিরা সময় সময় হাসতে হাসতে বলতো —এ কামরা রাজভবন কা কমলালয় ঔর হোয়াইট লেড্‌ল হ্যায়। অর্থাৎ কলকাতার বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স কমলালয় বা হোয়াইট লেডল এর দোকান।

শ্রীমতী পদ্মজার সময়ে কলকাতার রাজভবনে এটিকেট বা ভদ্রতার ছড়াছড়ি চলতো। যেহেতু রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা ভারতের এক নম্বর উচ্চবংশের মেয়ে— মা হচ্ছেন ভারতের স্বনামখ্যাতা বাগ্মী ও রাজনৈতিক নেত্রী সরোজনী নাইডু এবং বাড়ীতে ছেলেবেলায় ইংরেজ গভর্ণেস রেখে দুই বোন ও একমাত্র ভাই —অর্থাৎ শ্রীমতী পদ্মজা, শ্রীমতী লীলামণি ও ভাই ডাঃ জয়সূর্য লেখাপড়া করেছে সুতরাং শ্রীমতী

পদ্মজার চলনে বলনে ও ব্যবহারে খাঁটি ইংরেজের কৌলিন্য ও ভারতীয় সহৃদয়তার প্রতিধ্বনি মিলতো।

এই প্রসংগে মনে পড়ে রাজভবনে তাঁর দশ বছরের রাজ্যপাল জীবনে এমন একজন কর্মচারীকেও পাওয়া যাবে না যে বলতে পারে যে শ্রীমতী পদ্মজা তার সঙ্গে কোনোদিন অশালীন ব্যবহার করেছেন, উপরন্তু দেখা গেছে কলকাতার রাজভবনের ধোপা, মালী, নাপিত, বেয়ারা, বাবুর্চি, মজদুর ইত্যাদির সঙ্গে রাজ্যপাল সব সময়ে তাদের পরিবারের সুখ সুবিধার কথা আলোচনা করতেন।

এবং এটা অত্যন্ত সুন্দর লাগতো আমাদের কাছে যে তিনি কাউকেই তুম বলে তাচ্ছিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না। সকলেই তার কাছে আপ ছিল—আপ কহিয়ে, আপ বলিয়ে, আপ তসরিফ রাখিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বলি রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার রাজভবনে একটি হুকুমনামার ঘটনা।

রাজভবনে যখন ব্যানকোয়েট হলে খানাপিনা বসতো তখন ব্যানকোয়েট হলের সংলগ্ন ইয়েলো ড্রইং রুম যেখানে আমন্ত্রিত অতিথিরা রাজভবনের বিশাল সুন্দর ষ্টেয়ার কেস পেরিয়ে প্রথমে এসে বসে গল্প গুজব করেন সেখানকার ডিভান, সোফা, চেয়ারগুলিকে ভোজসভা চলাকালীন তড়িঘড়ি ভোজসভার ঘরের দিকে মুখ করে দেওয়া হতো যাতে অতিথিরা ভোজসভা সেরে সটান অতি আয়াসে ডিভানে-চেয়ারে মুখোমুখি করে বসতে পারেন।

শ্রীমতী পদ্মজার ও তাঁর সহোদর বোন লীলামণি নাইডু যিনি পদ্মজার সঙ্গে একত্রে কলকাতার রাজভবনেই থাকতেন, ও এই রাজভবনেই মারা যান—তাঁরা রাজভবনের বেয়ারা বাবুর্চি অফদার, ধোবী ইত্যাদি রাজভবনের কোনো কর্মচারী তাঁদের সামান্যতম কোন কাজ করে দিলেই হাসিমুখে এমন মিষ্ট ব্যবহারে কিছু টাকা বকশিস দিতেন যাতে দাতা বা গ্রহিতার মধ্যে কোনো সংকোচে ফারাক না থাকে। দাতা যেন না ভাবে আমি শ্রেষ্ঠ,—আমি দান করছি আর গ্রহীতাও যেন না মনে করে আমি অধম সাবর্ডিনেট তাই সরকারী তলবের উপরও লেডী সাহেবের কাছ থেকে বকশিস নিচ্ছি—এটাই আভিজাত্য। এটাই বংশ মর্যাদা।

কলকাতা রাজভবনে লাটগিন্নীদের দাপটে লিখতে গেলে মাঝে মাঝেই আনুসংগিক ভাবে লেডীদের কোনো নিকট আত্মীয়া বা কোন কোন অতি আপন স্নেহভাজন প্রিয় আত্মীয় বা সখীদের কথা এসে পড়ে।

যেমন মিঃ ডায়াস যখন কলকাতার রাজভবনে দীর্ঘদিন রাজ্যপাল ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্বাশুড়ী মিসেস ভ্যাস, যিনি প্রাক্তন আই. সি. এস ভ্যাস এর স্ত্রী, তিনিও তাঁর মেয়ে মিসেস ডায়াসের সঙ্গে রাজভবনে থাকতেন। মিসেস ভ্যাস, কেন জানিনা হয়তো বা অতি বৃদ্ধা হয়েছিলেন বলে সদা সর্বদা অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের ছিলেন। প্রধানতঃ যখন রাজ্যপাল ডায়াস রাজভবনের বাইরে কোনো ট্যুরে যেতেন তখন শাশুড়ী-এ খিটখিট দাপটে অত্যন্ত বাড়তো। এমন মনে হতো রাজভবনে যখন জামাই মেয়ে নেই এখন আমি এর অধিশ্বরী।

একবার হলো কি তিনি রাজভবনের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট এর সুপারভাইজার মিঃ জহরলাল ব্যানার্জীকে ডেকে হম্বিতম্বি করে বললেন যে তাঁর ঘরের এয়ারকনডিসানার ঠিক মতো ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে না। ঠাণ্ডার বদলে গরম বাতাস বেরুচ্ছে।

রাজভবনের আসল যে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার মিঃ ঘোষ তিনি মিসেস ভ্যাস-এর পাগলামির ভয়ে সুপারভাইজার মিঃ ব্যানার্জীকে কাজটা দেখবার জন্য পাঠালেন। মিঃ ব্যানার্জী মিসেস ভ্যাস এর ঘরে ভয়ে ভয়ে ঢুকে এয়ার কনডিসানার পরীক্ষা করে দেখলেন সব ঠিক ঠাক আছে। কিন্তু মিসেস ভ্যাস তা একেবারে মানতে রাজী নন। তিনি হাত পা ছুঁড়ে এয়ার কনডিসানারের কাছে ব্যানার্জীকে টেনে নিয়ে দেখালেন গরম বাতাস বেরুচ্ছে কি না ?

মিঃ ব্যানার্জী অত্যন্ত হাসিখুশী, আমুদে লোক। দক্ষিণ কলকাতার বনিয়াদী বংশের ছেলে। স্মার্ট। তিনি বেগতিক দেখে মিসেস ভ্যাসকে বললেন, ইয়েস ম্যাম, ইট ইজ নাইটিন টোয়েনটি—অর্থাং উনিশ বিশ ফারাক, বলেই ঝটাত করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে মিসেস ভ্যাস তো এই অদ্ভুত ইংরেজির কিছু বুঝতে না পেরে সটান তৎকালীন লাটের সেক্রেটারী মিঃ অরুণ মুখার্জীকে ফোনে সব কথা বললেন প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে।

দুদিন বাদে লাট ডায়াস তাঁর সেক্রেটারী মিঃ মুখার্জীকে ডেকে হাসতে হাসতে বললেন, রাজভবন স্টেটের ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্টের সুপারভাইজারটি কে হে ? বেশ তো রসিক ছেলে। তবে তাকে একটু ইংরেজি শিখতে বোলো। স্মার্ট। জীবনে অবশ্যই উন্নতি করবে।

সেক্রেটারী মিঃ মুখার্জী লাট ডায়াসকে মৃদু হাস্যে বললেন হ্যাঁ স্যার, ছেলেটি এয়ার কনডিসানরের কাজে ভীষণ এক্সপার্ট। কিন্তু বেশীদূর লেখাপড়া করে নি। তাই সিচুয়েশন সেভ করতে উনিশ বিশ-এর ইংরেজী নাইনটিন টোয়েনটি বলে ফেলেছে। সে বলেছে এয়ার কনডিসানার ঠিকই ঠাণ্ডা দিচ্ছে। তবে উনিশ বিশ ফারাক।

তবে স্যার তাকে আমি ডেকে খুব ধমকিয়ে দিয়েছি।

দেশ স্বাধীন হবার পর কলকাতার লাটভবনে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বা হচ্ছে। যেমন মেন বিলডিং-এব মাথা থেকে courts of arm এর বিশাল লোহার স্মারক চিহ্ন সরিয়ে সেখানে অশোক স্তম্ভ বসানো হয়েছে, রাজভবনগুলির মাথা থেকে বৃটিশের ইউনিয়ান জ্যাক হটিয়ে দিয়ে প্রথমে রাজ্যপালের নিজস্ব গৈরিক পতাকা ও পরে ষাটের দশক থেকে সেই পতাকা হটিয়ে চক্র মার্কা জাতীয় পতাকা ইত্যাদির রদ বদল করা হয়েছে—যার ঠিক প্রয়োজন ছিল স্বাধীনোত্তর যুগে।

কিন্তু সব চেয়ে বদল বা বিশৃংখলা এসেছে লাটসাহেবের প্যানট্রিখানায়—বা রান্নাঘরে।

বৃটিশ আমলে লাটের লেডীই এ দিকটা পারত পক্ষে দেখতো। কোন গেস্ট কী খাবেন। কে ভেজিটেরিয়ান বা কে নন-ভেজ। কে খাবার পর কফি খাবে বা চা খাবে আগে থেকে তিনি তার বন্দোবস্ত করে দিতেন।

আর সব চেয়ে আঁটোসাঁটো বন্দোবস্ত ছিল বৃটিশ আমলে খাবার টেবিলে ঘণ্টা বাজিয়ে দুপুরের লাঞ্চ ঠিক ঠিক একটার সময় ও রাত্রের ডিনার ঠিক আটটার সময় বসতোই বসতো।

লাট যখন খাবার টেবিলে বসতেন তখন দিনে রাতে লাটের নিজস্ব ব্যান্ডপার্টি তাঁর খাবার তালে তালে ব্যান্ডের ঐক্যতান বাজাতো। এর পর লাটবাড়ীতে হাজির হলে কোনো গেস্ট কোনো লাঞ্চ বা ডিনার পেতেন না। কারণ তখনকার লেডী সাহেবদের অলিখিত হুকুম ছিল যে চাকর-বাকর, বাবুর্চি, খানসামা, প্যানট্রিম্যান, অফদার সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে সকলকে ছুটি নিতে হবে।

এখন দেশ স্বাধীন হবার পর কিন্তু তার একেবারে উলটো অবস্থা।

এখন রাজভবনে ঠাকুর, চাকর, লিফটম্যানকে গেস্টদের জন্য হা পিত্যেশ করে প্রায় দিন রাত খাবার নিয়ে বসে থাকতে হয়। কারণ অতিথিরা কলকাতা ঘুরতে বেরিয়েছেন—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মোলাকাত করতে বেরিয়েছেন। চাকর-বাকর বসে থাকে তীর্থের কাকের মতো তাদের জন্য।

তা ছাড়া যখন সদলবলে তারা ফিরবেন তখন হম্বিতম্ব সুরু হবে—এ খাবোনা ও খাবোনা। এতে নিমক বেশী, এতে খাট্টা বেশী। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

দিল্লী থেকে তো মাঝে মাঝেই খুব বড় ভি. আই. পি. হলে তাঁর কলকাতায় আসবার সপ্তাখানেক পূর্বে মেনু চার্ট আসে বা নির্দেশ আসে। এই ভি. আই. পি. ও তাঁর পার্টির জন্য এই এই রকম খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রেসিডেন্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদের আহার্য্যে যেন ডালডা না দেওয়া হয়। অমুক ভি. আই. পি. কড়া ঝাল পছন্দ করনে না। ইত্যাদি।

আবার যখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য ঐ রকম সম-পর্য্যায়ের কোনো ভি. আই. পি. কলকাতার রাজভবনে ওঠেন তখন ওদের সেক্রেটারীর কাছ থেকেও সময় সময় জেনে নেওয়া হয় ওরা লাঞ্চে ভেজ খাবেন না, নন ভেজ খাবেন অর্থাৎ আমিষ না নিরামিষ ও রাত্রের ডিনারে ভেজ না নন-ভেজ।

তখন রাজভবনের পাকশালার পুরানো বাবুর্চিরা বৃটিশ আমলের জরাজীর্ণ প্রিন্টেড মেনু চার্ট দেখে সেই মতো রান্নাবান্না তৈরী করেন।

এখানে যদিও বলা দরকার যে বৃটিশ আমলেও অনেক খাস ইংরেজ রাজভবনে উঠে কেবলমাত্র এ দেশীয় নিরামিশ আহারই করে গেছেন। তারও নজীর আছে।

এই রোজ নামতার অনেক জায়গায় অনেকবার বলেছি যে কলকাতার রাজভবন

এটাও যেমন সকল মানুষের কাছে আকর্ষণীয় জিনিস তেমনি এই রাজভবনের প্যানাট্রিখানা বা পাকশালা এও একটা দ্রষ্টব্যের বস্তু। এই প্যানাট্রিখানায় কত বার কতো মজার কাণ্ড কারখানা হয় বা বিগত দিনে হয়েছে তার ইতিহাসও বেশ উপভোগ্য।

আগেই বলেছি শ্রীমতী পদ্মজা তেসরা নভেম্বর উনিশশো ছাপান্ন সালে বাংলার রাজ্যপাল হয়ে এসে সেই ভরা দুপুরে রাজভবনে পা দিয়েই প্রথমেই রাজভবনের প্যানাট্রিখানায় ঢুকেছিলেন সেখানকার ব্যবস্থাদি দেখতে। এবং তখন সেই মুহূর্তে সেখানে বড় বড় ফ্রিজের পাশে যদৃচ্ছভাবে আরশোলার ঘোরাফেরা দেখে তিনি প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্তে রাজভবনে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। রাজভবনের সেক্রেটারী থেকে ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত প্রথম দিনেই এর সুরাহার জন্য ঘোড়দৌড় করতে হয়েছিল।

এইবার শ্রীমতী পদ্মজার এই প্যানাট্রিখানার উপর কতো তীক্ষ্ন নজর ছিল তার দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

সবাই হয়তো জানেন না, তাঁর খুব অন্তরঙ্গ ছাড়া, শ্রীমতী পদ্মজা অত্যন্ত অতিথি বৎসলা ছিলেন এবং নিজে অনেক রকম খাবার দাবার এই রাজভবনের প্যানাট্রিতে আবিষ্কৃত করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজকাল রাজভবনের খানা টেবিলে বা চায়ের টেবিলে যে পান-পকৌড়ি দেওয়া হয় সেটা শ্রীমতী পদ্মজার নিজের বুদ্ধির সৃষ্টি—খিলিপান চূর্ণ মশলা ছাড়া ব্যাসনে চুবিয়ে খাঁটি সরিষার তেলে ভাজা।

এ ছাড়া আছে নানা রকম স্যালাড দিয়ে চপ কাটলেটের প্লেট-এ মন্দির মসজিদের নানা রকম অপরূপ নক্সার বাহার। চপ কাটলেট খাবো না বিরাট প্লেটে তাজমহল বা কুতুবমিনার দেখবো—সে এক অপরূপ অনুভূতি।

স্মোক হিলশা যদিও একটা প্রাচীন খাবার তবু শ্রীমতী পদ্মজা এর একটা নতুন রূপ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত রসনা তৃপ্তিকর।

এমনকি লর্ড কেসী সপত্নীক অস্ট্রেলিয়া থেকে রাজ্যাভিষেকে নেপাল যাবার পথে বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজাকে আগে ভাগে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যেন দমদমে দয়া করে তাঁর লাঞ্চ বাংলার গোবিন্দভোগ সরু চাল ও স্মোক হিলসা সহযোগে রাজভবন থেকে পাঠিয়ে দেন। পদ্মজা প্রাক্তন গভর্ণর লর্ড কেসী ও মিসেস কেসীর এই অনুরোধ রেখেছিলেন। তাঁদের লাঞ্চে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে স্মোক হিলসা ও গোবিন্দ ভোগ অন্ন পাঠানো হয়েছিল।

পাশ্চাত্য দেশে রন্ধনশিল্প বা রেসিপীর বই-এর খুব চাহিদা।

ভারতবর্ষের রন্ধন শিল্পের নানা রকম বই-এ শ্রীমতী পদ্মজার উদ্ভাবিত বহু খাদ্যের রেসিপী রাখা যেতে পারে। নিশ্চয় সেগুলি জনপ্রিয় হবে।

যাক যা বলছিলাম। শ্রীমতী পদ্মজা একদিন নিজের স্যুইটে খেতে বসেছেন। পাশে বসে খাচ্ছেন নিজের ছোট বোন লীলামণি নাইডু। হঠাৎ পদ্মজার

খাবারের মধ্যে কার একটা মাথার চুল পাওয়া গেলো। পদ্মজা তক্ষুনি প্যানট্রির এ্যাসিসটেন্ট কম্পট্রোলারকে ডেকে পাঠালেন। কড়া হুকুম দিলেন যে, এবার থেকে প্যানট্রির সমস্ত কর্মচারীকে মাথায় গান্ধী টুপী বা অন্য কোনো রকম টুপী পরে প্যানট্রিতে কাজ বা ঘোরাফেরা করতে হবে।

এমন কী সেক্রেটারী, ডেপুটি, এ্যাসিসটেন্ট কম্পট্রোলার বা ঐ রকম যে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি কোনো কারণে প্যানট্রিতে প্রবেশ করে তবে তাঁকেও মাথায় টুপী দিয়ে ঢুকতে হবে।

যদিও রাজভবনের সেক্রেটারী বা ঐ জাতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাজভবনের রন্ধনশালায় কালে ভদ্রে এক আধবার ঢোকেন। তাও আবার কোনো ভি. আই. পি-দের খাবার তদারকীর জন্য। পদ্মজার এই কড়া নির্দেশে তাদের মধ্যে মহা অসন্তোষ দেখা গেলো।

মহিলা লাট শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর মেজাজের বর্ণনা এই কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল বই-এ অনেক জায়গায় নানা ভাবে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত পর্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি।

·সংবেদনশীল, স্নেহময়ী, করুণহৃদয়া শ্রীমতী পদ্মজাকে যেমন অনেক সময় দেখেছি অত্যন্ত শান্ত স্বভাব ও ধীর স্থির আবার অনেক সময়ে দেখেছি তিনি একটুতেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে রণ মূর্তি ধারণ করতেন। তবে সে রাগের সময় কখনও দেখিনি তিনি শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। একবার হলো কী বি. ই. পাস ইঞ্জিনিয়ার আর. বোসকে পদ্মজা বললেন কোন কলেজ থেকে পাশ করেছেন। মশারীতে যে আইরন ঠিক হয়নি, ওটা কুঁচকে আছে দেখতে পান নি।

ইঞ্জিনিয়ার রুখে দাঁড়ালো—কলেজে আমাকে ওসব পড়তে হয়নি। আর যায় কোথায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই হতভাগ্য ইঞ্জিনিয়ারের অন্যত্র বদলি।

কথায় বলে, মেজাজ ও ব্যবহারে লাট। শ্রীমতী পদ্মজার ব্যবহারে লাটের আমিরী চাল পরিলক্ষিত হলেও তার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত শালীন ছিল। শিক্ষিত লোকদের নাকি এ রকমই হয়। যদিও ইদানীং কালের কথা স্বতন্ত্র। এখন দেখা যায় বিদ্যা দদাতি বিনয়ম নয়—গাছে ফল ধরলে গাছ মাথা নীচু করে থাকে—এটা এখন বাতিল। এখন বিদ্যা দদাতি স্পর্ধা।

এবার একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো চৌষট্টি সালের শীতকালের এক দুপুরে। স্থান ব্যারাকপুরের লাটবাগানের ফ্ল্যাগ ষ্টাফ হাউস। মাস বোধ হয় নভেম্বর বা ডিসেম্বর হবে। সেদিন ছিল গান্ধীঘাটের পাশে যে 'জহর কুঞ্জ' আছে তারই সম্বন্ধে ফ্ল্যাগষ্টাফের বারান্দায় বিভিন্ন সরকারী বড় বড় আমলাদের সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার আলোচনার বিষয়—কেমন করে, "জহর কুঞ্জ" কে সুন্দরভাবে রূপদান করতে পারা যায় তারই আলোচনা। তার সঙ্গে আছে দুপুরের লাঞ্চ।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের উত্তরে যে এখনকার বিখ্যাত 'জহর কুঞ্জ' পত্র পুষ্পে সুশোভিত আছে তা অনেকটা রাজ্যপাল পদ্মজার প্রচেষ্টায় ও আকা-ঙ্খায় দিল্লীর শ্রীনেহেরুর সমাধির পাশের শান্তিবনের অনুকরণেকরা হয়েছিল। এখন যেখানে জহরকুঞ্জ, গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের প্রস্ফুটিত মেলার বাহার পূর্বে সেখানে ছিল ফাঁকা মাঠ। মাঠ হয়তো ঠিক হবে না, বলা চলে গঙ্গার পলিমাটির শ্যামল বিস্তীর্ণ চওড়া জায়গা। সেখানে মাঝে মাঝেই গঙ্গার জোয়ারের জল চাঁদনী রাতে ছল ছল খেলা করতো কল্লোলে।

আগের থেকেই কথা ছিল এবং লাট শ্রীমতী পদ্মজাও হুকুম দিয়েছিলেন যে দুপুরের তাঁর ও অন্যান্য সরকারী আমলাদের যাঁরা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা যেন কলকাতার রাজভবন থেকে প্যাকেটে ভর্তি করে নিয়ে আসা হয়।

তিনি এই প্রসংগে রাজভবনের তদানীন্তন ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সেনকে বিশদ ভাবে এ সবের বিলি ব্যবস্থা বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কলকাতা মাঠের ফুটবল খেলার নেশায় মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবলার এই ডেপুটি সেক্রেটারী বেমালুম সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন খবরটা রাজভবনের প্যানট্রিতে পৌঁছে পাঠাতে। তাই যা হবার সেই অঘটন হয়েছিল। যথারীতি প্যানট্রি খানাতে সেদিন অতি ভোরে রাজভবনের ট্রাক বোঝাই হয়ে রান্নাবান্নার নানা জিনিস সমেত সেই ট্রাক ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাগস্টাফে চলে এসেছিল। ট্রাকে কাঁটা চামচ থেকে চায়ের কাপ বিভিন্ন ধরণের খাবার প্লেট, ম্যায় নানা রকমের ন্যাপকিন পর্য্যন্ত আনা হয়েছিল। কেবল সুদৃশ্য খাবারের প্যাকেট বেমালুম বাদ। প্যানট্রিম্যানরা আগে থেকে তো জানে না। খবর পায় নি।

শ্রীমতী পদ্মজার সঙ্গে জহরকুঞ্জ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর ফ্ল্যাগস্টাফের পূর্বদিকের প্রশস্ত বারান্দায় টেবিল চেয়ারে প্রায় চল্লিশ জন অফিসার ও বড় বড় আমলাদের সঙ্গে রাজ্যপালের খাবারের প্লেটে সাজানো হলো।

ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সেন ও তদানীন্তন এডিসি ক্যাপ্টেন পন্থ সব তদারক করতে লাগলেন।

এবার ডাকা হলো রাজ্যপাল ও অতিথিদের। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি কটকট করে ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সেনের দিকে দু'একবার তাকিয়ে নিজের নির্দিষ্ট খাবার চেয়ারে বসলেন। কিন্তু একটু পরেই অতিথিদের কাছে নিজের দৈহিক অসুস্থতার ভাণ করে চেয়ার ছেড়ে সটান ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসের নিজের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সবাই হতভম্ব। এইতো কিছুক্ষণ আগেও রাজ্যপাল কেমন হেসে হেসে সকলের সঙ্গে নানা বিষয়ে কতো কথাবার্তা বলছিলেন। কতো আলোচনা হলো।

তখন তো ওনার শরীর অসুস্থ ছিল না। কিন্তু এ কি হলো ? কেউ কিছু বুঝতে পারছেন না।

এডিসি ক্যাপ্টেন মিঃ পন্থ ও ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সেন অতিথিদের খাওয়া চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। অতিথিরা সকলে অগত্যা খেয়ে যেতে লাগলো মুখ চাওয়া চায়ি করে। এদিকে এডিসি পন্থ একবার মিঃ সেনের মুখের দিকে তাকান, আবার মিঃ সেন এডিসির মুখের দিকে তাকান। নির্বাক। নিস্পন্দ। দুজনই কিছু ঠাহর করে উঠতে পারছেন না ব্যাপারটা কী, কেন রাজ্যপালের এই গোসা।

অগত্যা শ্রীমতী পদ্মজার খাস পেয়ারের বেয়ারা মহম্মদ সাকীমকে রাজ্যপালের কক্ষে পাঠানো হলো এক গ্লাস ঠান্ডা সরবত দিয়ে। হয়তো বা রাজ্যপালের শরীর গঙ্গারধারের চড়া রৌদ্রের তেজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঠান্ডা সরবৎ পেটে পড়লে দেহের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

সাকীম কাঁচুমাচু মুখে কাঁপতে কাঁপতে রাজ্যপালের কক্ষ থেকে সরবতের গেলাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো—না লেডী সাহেব সরবৎ স্পর্শ করলেন না। আমাকে কিছু বললেনও না।

এডিসি পন্থ নিজের হাতের ছোট্ট বেতের ডান্ডাটি (Magic Wand) বার দুই নিজের মনেই ঘুরিয়ে হঠাৎ রান্নাঘরে দৌড়িয়ে এসে এক কাপ গরম কফি নিয়ে সোজা পদ্মজার বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়লো রাজ্যপাল যে নেহেরুর মতো হট কফি অত্যন্ত ভালবাসতেন।

কিন্তু পদ্মজা হট কফিও খেলেন না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এডিসি পন্থ আরক্ত মুখে কফির পেয়ালা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।—মুখ কাঁচুমাচু।

এদিকে বারান্দায় অতিথিদের খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়েছে।

ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সেন এতক্ষণ অতিথিদের খাওয়ার তদারক করছিলেন। তিনি ফাঁক বুঝে ক্যাপ্টেন পন্থকে খাওয়ার তদারকির ভার দিয়ে নিজে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখের ভাব করে রাজ্যপালের কক্ষের দরজার আশে পাশে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন। যদি রাজ্যপালের চোখে পড়েন। কিন্তু সে সব কিছুই হলো না। তিনি মুখ গম্ভীর করে বেহারাদের অযথা বকাবকি সুরু করলেন।

তাঁর গলার স্বরটা হয়তো বা একটু চড়াই হয়েছিল। রান্নাঘর থেকে মিঃ সেনের সে ধমকানির আওয়াজ শ্রীমতী পদ্মজার কানে গেলো। তিনি বিছানা ছেড়ে কক্ষের বাইরে এসে অপেক্ষমান অফিসারদের বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে ঘরের মধ্যে ডেকে মিঃ সেনকে কড়াভাবে হুকুম দিলেন এক্ষুণি কলকাতায় তাঁর ফেরার ব্যবস্থা করতে।

রাজ্যপালের সুন্দর এয়ার কনডিসনড বুইক এ্যামপেলা গাড়ী তৎক্ষণাৎ ফ্ল্যাগষ্টাফের সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো। শ্রীমতী পদ্মজা চাকর বেয়ারাদের ডেকে হেসে দু'চারটি কথা বলে সটান গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। পদ্মজার অনাহার

ক্লিষ্ট মুখে সে হাসি বেশ ম্লান দেখালো। চলন্তমান গাড়ীর পেছনে ছুটতে ছুটতে এসে বেতের ব্যাটন হাতে ক্যাপ্টেন পন্থ রাজ্যপালের গাড়ীর চালক সীতারাম সিং এর পাশে বসলেন। গাড়ী ব্যারাকপুর লাটবাগানের পূর্ব গেট দিয়ে কলকাতার মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ডেপুটি মিঃ সেন তখন খানা টেবিলে বসে বিভিন্ন রসাল খাবার খেতে খেতে চাকর বেয়ারাদের হাসি হাসি মুখে রাজভবনের বিভিন্ন রাজ্যপালদের বিচিত্র কতো মেজাজের গল্পসল্প করতে লাগলেন। বার দুই হেড কুক মিঃ বড়ুয়াকে ডেকে আজকের বিভিন্ন রান্নার তারিফ করতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে থেমে থেমে তিনি কী যেন চিন্তা করেন, আবার খান। হঠাৎ একবার মুখ ফসকিয়ে চাকর, বেয়ারা, হেড কুকের মাঝখানেই বলে ফেললেন — অনেক লাট পার করলাম। কিন্তু এই লাটের মেজাজ বোঝাই ভার। হবেনা কেন এ লাট স্বয়ং লেডী তো, মেজাজেও লেডী—বলেই সংস্কৃত আওড়ালেন স্ত্রীনাং চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।

ডেপুটির মুখে এই রসের কথা শুনে হেড কুক দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে রান্নাঘরে থেকে একটা বড় গোছের চিংড়ী মাছের মালাইকারী এনে মিঃ সেনের পাতে দিল। মিঃ সেন বিশাল গলদা চিংড়ীটাকে এক কামড় দিয়েই হঠাৎ লাফ দিয়ে কাউকে কোনো কথা না বলে কোনো দিকে না তাকিয়েই সোজা রাজভবনের অপেক্ষমান একটা গাড়ীতে উঠে ধমকের সুরে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন—ঠাকুর সিং শীঘ্র কলকাতায় আমাকে পৌছে দাও। দেখ রাজ্যপালের আগেই যেন আমি রাজভবনে পৌঁছুতে পারি।

মিঃ সেনের এতক্ষণে মনে পড়ে গেছে যে তাঁর মনের ভুলের জন্যেই যে সুদৃশ্য প্যাকেট করে মাননীয় অতিথিদের খাবার সরবরাহ করা হয়নি। সেই জন্যেই তো পদ্মজার আজকের যতো রাগ। তাঁকে যে এক্ষুণি রাজ্যপাল পদ্মজার কাছে নিজের ভুলোমনের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে।

আজও তিনি দুবছরের একস্টেনসনে আছেন পদ্মজার দয়ায় আরও যে বছর দুই একস্টেনসন তার দরকার—তাঁর দুটি মেয়েই যে এখনো অবিবাহিত, মাথা গুজবার আস্তানাও যে এখনো তাঁর বাকী।

সেদিন তারিখটা হবে ৯ই সেপ্টেম্বর উনিশশো সাতান্ন সাল।

রাজ্যপাল ডায়াস ও লেডী ডায়াস রাজভবনের কর্মচারীদের উপর মহাখাপ্পা। কারণ কী না রাজ্যপালের বিবাহিত মেয়ে মিসেস রাও এর হাতে ইলেকট্রিক শক লেগেছে রাজভবনের নিজের স্যুইটের এয়ার কনডিসানারের সুইচ অন করতে গিয়ে।

প্রাক্তন আই-সি-এস রাজ্যপাল মিঃ ডায়াস এ ব্যাপারে বিলক্ষণ বিরক্ত, কিন্তু তাঁর চেয়েও মহাখাপ্পা লেডী ডায়াস। তিনি নিজের প্যাডের কাগজ টেনে

রাজভবনের ইলেকট্রিক ইনজিনিয়ারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠালেন। এ ব্যাপারে হৈ হৈ ব্যাপার সারা রাজভবনে।

শক যদিও সামান্য লেগেছে কিন্তু কেন লাগবে? রাজ্যপালের এস্টেটে এতো লোকজন কী জন্য রাখা হয়েছে। মহা হৈ চৈ।

লেডী ডায়াসের মুখ গম্ভীর। খাস রাজভবনের প্রায় উননব্বইটি ঘরের ১৪০০ বাতি, ৪৬টি এয়ার কনডিসানার ১৭টি গীজার এর প্রতিটি সুইচ খুলে খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বলা হলো। এবং এর রিপোর্টটও লেডীকে পাঠাতে বলা হলো অতি শীঘ্র।

পরে অবশ্য লেডীর চিঠির কী সদুত্তর গিয়েছিল তা জানা যায় নি তবে কলকাতার রাজভবন কিছুদিন সেই ইলেকট্রিক শকের অজানিত আতঙ্কে ঝিমিয়ে ছিল তা বেশ বোঝা যেতো।

লাটগিন্নী মিসেস ধাওয়ান ওরফে শকুন্তলা ধাওয়ান সম্বন্ধে আগে কিছু কিছু বলেছি। এবার সবিস্তারে বলি।

মিসেস ধাওয়ানই বোধহয় তাবৎ ইংরেজ ও দেশী লাটগিন্নীদের মধ্যে অধিক মিতব্যয়ী ছিলেন—অবশ্য নিজের খরচের বেলায়। এটাই আমার চোখে ধরা পড়েছে। তার কতকগুলি কারণ বলি।

▲ প্রথম হচ্ছে আমি আমার দীর্ঘদিনের রাজভবনের চাকরী জীবনে কখনও কোনো লাটকে দেখিনি কলকাতার রাজভবনের চিরাচরিত প্রথার অন্যথা করে নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নিজেদের নবনির্মিত কিচেনে সম্পন্ন করেছেন।

কলকাতার রাজভবনে এই রকম অলিখিত প্রথা চালু আছে সেই বৃটিশ আমল থেকে যে রাজ্যপাল বা বৃটিশ জমানার গভর্ণর বা ১৯১১ সালের পূর্বে সকল গভর্ণর জেনারেলরা নিজের ফ্যামিলির আহার্যের খরচ বাবদ কিছু টাকা নিজের মাইনে থেকে কেটে রাজভবনে জমা দিতেন প্রতিমাসে এবং সেই খরচ থেকেই নিজের ও তাঁর ফ্যামিলীর খাওয়ার খরচ চলে।

কিন্তু মিসেস ধাওয়ান নিয়ম করলেন তিনি খাওয়া বাবদ রাজভবনে কিছু খরচ জমা দেবেন না এবং তাঁর পাকশালা তাঁর স্যুইটের কাছে করিয়ে নিলেন। খালি খাওয়ার খরচই এতে কমলো না, অধিকন্তু চিরদিনের প্রথানুযায়ী ব্যারাকপুরের লাটবাগান থেকে যে সকল সব্জী এতাবৎকাল রাজভবনের ষ্টোরে এসে জমা হতো এবং রাজভবনের গরীব কর্মচারীদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বিলি হতো (অবিশ্যি রাজভবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা বাঁচতো) তা এখন থেকে মিসেস ধাওয়ানের আদেশে নির্মিত প. শালায় সব্জি-শুদ্ধ বাক্সগুলি তালাবন্দী অবস্থায় সর্ব প্রথম আসতে লাগলো। উনি অবশ্য তার থেকে তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনাজ রাজভবনের প্যানট্রিও দুচারজন তাঁর অনুগত কর্মচারীদের ভেতর বিলি করতেন।

মিসেস ধাওয়ান প্রায়ই রাজভবনের গার্ডেন সুপারিনটেনডেন্টকে ডেকে বলতেন ব্যারাকপুরের লাটবাগানে তেমন কিছুই হয় না। তাঁর এলাহাবাদের বাড়ীতে যে ছোট্ট কিচেন গার্ডেন আছে, তাতে প্রচুর আনাজ উৎপন্ন হয় তাঁর প্রত্যক্ষ সুপারভাইজে।

যদিও ব্যারাকপুরের লাটবাগান থেকে যা আনাজ কলকাতার রাজভবনে আসতো তা বেশ এলাহি। এখানে ঐ সব আনাজের একদিনের হিসেব মাত্র দেওয়া হলো। দিন ২৮শে মে ১৯৭১।

পাকা আম	=২৫০টি
কাঁঠাল	=১টি
নারকেল	=২টি
ডাব	=২টি
শাক	=১৩০০ গ্রাম
ভেণ্ডি	=১২০০ গ্রাম
মটরশুঁটি	=১৩০০ গ্রাম
লাল শাক	=৬০০ গ্রাম
পাতিলেবু	=৫০টা
কাঁচালংকা	=১৫০ গ্রাম
কাঁকুর	=১ কেজি
মেহেদি শাক	=৭ বান্ডিল
সফেদা	=৪০টি
পাকাকলা	=৩৪টি
করলা	=৫০০ গ্রাম

ভারতবর্ষের লোকেরা সমাজতান্ত্রিক দেশের লোক। তাই আবার রাজভবনের এই সব খেটে খাওয়া মজদুর। তার উপর আবার ১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক ইউ. এফ-ফ্রন্ট-এর রাজত্ব চলছে। সুতরাং মিসেস ধাওয়ানের এই রকম আঁটোসাঁটো ব্যবস্থায় অসহায় মজদুরেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলো—লেডী লাট মিসেস ধাওয়ান তো সরকারী কর্মচারী নন। তাঁর হুকুম মানি না, মানবো না। আর উনি সব কাজে "লেট লতিফ" তাঁর স্বামী রাজ্যপাল ধাওয়ানকে কেন একটু টাইম সম্বন্ধে সজাগ করে দিচ্ছেন না তাঁর কানের কাছে পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে।

"লেট লতিফ" যদিও রাজভবনের মজদুরদের কথা নয়। ওদের উষ্মা হচ্ছে, "ঢিলা আদমী" ধাওয়ানজী। সত্যি দেখা গেছে ধাওয়ানজী রাজভবনের কোন অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের দশ পনেরো মিনিট পরে ছাড়া আগে উপস্থিত হননি।

মিসেস ধাওয়ানের বড় ছেলের বউ ছিল বিদেশিনী। ইংলিশ না আমেরিকান তা জানি না। বোধ হয় আমেরিকান। মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী পরিহিতা

এই সুশ্রী বিদেশিনী ধাওয়ানকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী। তার ছোট্ট বাচ্চাটিও ততোধিক সুন্দর; এঁদের প্রায়ই দেখা যেতো এলাহাবাদের বাড়ী থেকে কলকাতার রাজভবনে বেড়াতে আসতেন। আর মিসেস ধাওয়ান নাতিকে নিয়ে রাজভবনের তিনতলার বল রুমে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করতেন। কিছুতেই যেন ক্লান্তি নেই তাঁর।

ধাওয়ানের পর রাজ্যপাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এলেন মিঃ ডায়াস।

আর্থার ল্যান্সলট ডায়াস। তিনি প্রাক্তন আই. সি. এস। তাঁর কথাও আগে বলেছি। তাঁর পত্নীও অত্যন্ত বিদুষী ও বৃটিশ জমানার প্রাক্তন আই. সি. এস. মিঃ ভ্যাসের কন্যা।

মিসেস ডায়াস কলকাতার রাজভবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। এই সহৃদয়া সুশিক্ষিতা মহিলা অত্যন্ত মার্জিত রুচির রমণী ছিলেন। তাঁর সব সময়ের লক্ষ্য, রাজভবনের কর্মচারীদের মধ্যে প্রধানতঃ যারা অল্প মাইনের কর্মচারী, তাদের সকলের সুখ সুবিধা দেখা।

রাজভবনের কোন কর্মচারীর আপদ বিপদ হলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে দৌড়ে যেতেন। এঁর পূর্বে রাজভবনে অনেক কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় অকালে মারা গেছেন। তাদের পরিবারের কোনো কিছু সুরাহা হয় নি, কিন্তু মিসেস ডায়াস এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে রাজভবনের কোনো কর্মচারী অকালে মারা গেলে তার জীবিত কোনো উপযুক্ত সন্তান বা বিধবা স্ত্রীকে সামর্থ্য ও শিক্ষা অনুযায়ী রাজভবনে তার চাকরীর বন্দোবস্ত চালু করলেন। এতে অনেকের উপকার হলো।

পদ্মজার আমল :—একবার হয়েছে কী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নিজের লিফটে নামতে নামতে দেখলেন লিফটের মধ্যে লিফটের গায়ে নানা জায়গার কতকগুলি আঁচড়ানো দাগ। সেগুলি দেখতে বিশ্রী।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা লিফটম্যান অলোক রাউথকে লিফটের আঁচড়গুলির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল—ম্যাম, তোমার কুকুর ওগুলি করেছে। এই কথা যেই না শোনা শ্রীমতী পদ্মজা রেগে আগুন। তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনার সুরে লিফটম্যান অলোককে শ্রীমতী পদ্মজা বললেন—আপনি আমার কুকুরদের নাম জানেন না? কুত্তা, কুত্তা বলছেন। এখানে বলাদরকার শ্রীমতী পদ্মজা কখনও কোনো কর্মচারীকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন না। সব সময়ে আপনি।

এর পর পদ্মজা ঘুরে দাঁড়িয়ে নজর এ. ডি. সি কে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—এই লিফটম্যান অলোক রাউথকে এক্ষুণি তাঁর খাস লিফট থেকে অন্য লিফটে বদলি করতে।

এর পর মিনিট কুড়ির মধ্যেই অলোক রাজভবনের অন্য লিফটে বদলি হলো। কারণ অলোক কুকুরকে কুকুর বলেছে। নাম ধরে ডাকেনি।

অলোকের প্রটোকোল বা ডেকোরামের অভাব হয়েছে রাজভবনের কিছু বৃদ্ধ কর্মচারী মতামত দিল, আর কিছু ঝানু কর্মচারী হা হা করে হেসে বললো—

বোঝেন না আমাগো বউরে আমরা কই বউ। আর তেঁনারা কন ওয়াইফ। এই যা ব্যাস-কম্‌।

কলকাতার রাজভবন একটা বিচিত্র জায়গা। এখানে যেমন আছে রাজ্যপাল টি. এন. সিং-এর আমলের ইজ্রায়েলী ছাগলের ঘর, সেই সব ছাগল চরাবার রাখাল, উর্দিপরা লিফটম্যান, রাজমিস্ত্রী, কামার, প্যানিট্রিম্যান, বেয়ারা, বাবুর্চি, জমাদার, মেথর, অফদার, বাটলার, ধোবী, ড্রাইভার, নাপিত ইত্যাদি তেমনি রাজভবনে আছে অত্যাধুনিক নানা প্রকারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

যেমন বিশ্বের সংবাদ তাড়াতাড়ি পাবার জন্য টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোনের হট লাইন, টেলিফোন বুথ, মজার সুখে ধারা স্নান করার জন্য টেলিফোন সাওয়ার, বিডেড কমোড, ডানলোপিলোর দশ ইঞ্চি পুরু গদি, এয়ার কনডিশনার, সুন্দর পশমের কার্পেট, অত্যাধুনিক মটর গাড়ী, টেলিভিশন, নানা রকমের রেডিও; স্পিকোফোন ইত্যাদি।

কলকাতার রাজভবনেই প্রথম "স্পিকোফোন" আসে।

বৃটিশ আমলে শুনেছি গভর্ণর জন হারবার্টের পত্নী মিসেস হারবার্টের লাটবাড়ীতে বেশ দাপট ছিল। রাজভবনের বৃদ্ধ কর্মচারীরা বলেছে যে মিসেস হারবার্টই নাকি তখন হুকুমদারিতে রাজভবনে গভর্ণর ছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে তাঁর চাল চলনে, হুকুম হাঁকানিতে তাই মনে হতো। মিসেস হারবার্টকে কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিনি। তবে মিসেস ধাওয়ানকে দেখেছি বেশ কাছে থেকেই সেটা বলা চলে। এঁকে দেখে এবং এঁর হাঁকডাক শুনে আমার মনে হয়েছে যে রাজ্যপাল মিঃ ধাওয়ান স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে কিছু নন। প্রকৃত পক্ষে ঘটনা তাই।

কারণ রাজ্যপাল মিঃ ধাওয়ানকে প্রায়ই বলতে শোনা যেতো রাজভবনের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে, মানিয়ে হামারা বিবিকা হুকুম হামরা অর্ডার হ্যায়। এতবড় সপ্রশংস সার্টিফিকেট কোন স্বামীর কাছ থেকে কোনো ভদ্রমহিলা আদায় করতে পারলে তার দাপটের পরিমাণটা অনায়াসেই অনুমান করতে পারা যায়। আবার সে যদি কোনো রাজ্যপালের পক্ষ থেকে এই স্বাধীন ভারতে তার গৃহিনীকে দেওয়া সার্টিফিকেট হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলে রাখি। রাজভবনের তাবৎ সেক্রেটারী থেকে নিম্নতর ঝাড়ুদার পর্যন্ত রাজ্যপালের লিখিত প্রশংসা সার্টিফিকেট দশ বছর কুড়ি বছর ও ত্রিশ বছর রাজভবনে বিশ্বস্ত চাকরী করবার জন্য পেয়ে থাকেন। বৃটিশ শাসনে এই সার্টিফিকেটের সঙ্গে আরও থাকতো একটি সুদৃশ্য সোনার বা রুপোর মেডেল। এখন মেডেল থাকে না শুধু সার্টিফিকেটই দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে এসব লেখা থাকে না মানিয়ে হামারা বিবিকা হুকুম হামারা অর্ডার হ্যায়। অবিশ্যি তা থাকবার কথাও নয়। এটা কথার কথা।

মিসেস ধাওয়ান নিজে গিয়ে নিউ মার্কেট থেকে রাজভবনের যাবতীয় পর্দার কাপড় চোপড় কিনে আনতেন। সঙ্গে যদিও দু'একজন রাজভবনের টেলার বা

কর্মচারী থাকতো। পর্দার কাপড় নিয়ে এসে গজ মেপে তিনি তা টেলারদের হাতে দিতেন। বাদ বাকী কাপড় নিজের গুদামে তালাবন্ধ করে রেখে দিতেন।

রাজভবনে কে কোথায় কিসে ফাঁকি দিচ্ছে, কোথায় তাঁর সন্দেহ হচ্ছে চুরির, কোন মজদুর কাজ করছেন কিনা তা তিনি নিজে সরেজমিনে দেখাশুনা করতেন।

একবার হলো কী তিনি তাঁর স্যুইট থেকে দেখতে পেলেন যে সকালে যে সকল বাগানের মজদুর রাজভবনের বিস্তীর্ণ বাগানে কাজ করতে আসে তারা ঠিক ঠিক সময়ে আসে না।

তিনি তখনই একটা পুজো করবার হাতেনাড়া ঘণ্টা আঠারো টাকা ছাব্বিশ পয়সা দিয়ে কিনে ফেললেন এবং বাগানের মজদুরদের সকালে কাজে যোগদানের সময় ও বেলা বারোটায় টিফিনের সময় সেই ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটি দেওয়ার নির্দেশ হলো গার্ডেন সুপারিনটেনডেণ্টের উপর। ঘণ্টার পরে কেউ কাজে হাজির হলে তাকে সেই দিনের মতো অনুপস্থিত করা হতো বা হাফছুটি সে দু'চার মিনিট দেরী হলেও।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর আমলের শেষের দিকে সম্ভবত ১৯৬৬।১৯৬৭ সালে বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের আমল। বিধানসভায় তখন অত্যন্ত হৈ হট্টগোল আরম্ভ হয়েছে। শ্রীমতী পদ্মজা হুকুম দিলেন তিনি নিজে রাজভবনের স্যুইটে বসে বিধানসভার সমস্ত কার্যাবলী নিজে স্বকর্ণে শুনবেন। যদিও বলে রাখি প্রত্যহ রাজ্যপালের পড়বার জন্য ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী মিলিয়ে গড়ে ১৫।১৬ খানা দৈনিক সংবাদ পত্র রোজ কেনা হয়।

রাজভবনে শ্রীমতী পদ্মজার নিজের স্যুইটের সিটিং রুমে ও তাঁর সেক্রেটারীর অফিসে 'স্পিকোফোন' বসানো হলো। এই স্পিকোফোনের লাইন বসাতে বিধানসভা থেকে রাজভবন-এ লাইন টেনে আনতে অনেক বেগ ও কষ্ট পেতে হয়েছিল।

শ্রীমতী পদ্মজা প্রায়ই নিজের সিটিং রুমে বসে তখনকার এম. এল. এ-দের বিধানসভার নানা কার্যাবলীর উত্তপ্ত বক্তৃতা শুনতেন, আর মনে মনে হাসতেন—সত্যই আমাদের দেশের তথাকথিত ডেমোক্রেসীর কী হাল হয়েছে। জোর যার মুল্লুক তার। গায়ের জোরে, বুদ্ধির কূটনৈতিক চালে ভোট জোগাড় কর আর বিধানসভায় এসে গলা ফাটাও।

কিন্তু তাঁর মত ছিল ভেতরে ভেতরে সরকারী পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের এম, এল, এদের মধ্যে ভীষণ ভাব, আর উপরে লোক দেখানো ঝগড়া। সবাই নিজের বা পরিবারের আখের গুছাচ্ছেন—দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে তা কেউ দেখছে না। ক'জন দেশকে ভালোবাসে তা হাতের আঙুলে গোনা যায়।

কলকাতার এই প্রায় দুশো বছরের পুরাতন রাজভবনের অনেক সুন্দর সুন্দর দুষ্প্রাপ্য সৌখিন জিনিসের মহা সমারোহ রয়েছে—যা হয়তো পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেখতে পাওয়া যাবে না। যদিও তার কারণও আছে। কেননা সৌন্দর্য প্রিয় ইংরেজ জাত সারা পৃথিবীতে সুদীর্ঘ বছর রাজত্ব চালিয়ে তখনকার দিনে

নিজের প্রিয় শহর লণ্ডনকে সুষমামণ্ডিত করেছিলেন তারপর দ্বিতীয়া প্রেয়সীর পর্যায়ে ফেলেছিলেন এই সুন্দরী কলকাতাকে।

বলা বাহুল্য আর এই কলকাতাই ছিল ১৯১১ সালের পূর্ব পর্যন্ত সারা ভারতের রাজধানী।

এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে স্বাধীন ভারতের বাংলার রাজ্যপাল হয়ে সে সব গুণী জ্ঞানী মনীষীরা এসেছেন তার মধ্যে পদ্মজাই নিজের স্বীয় প্রতিভার বলে এই কলকাতার রাজভবনকে শিল্পকলায় অনেক কিছু উপহার দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে একমাত্র তাঁরই নিজস্ব অনেক শিল্পকলার নিদর্শন এখনও কলকাতার রাজভবনে শোভা পাচ্ছে। তিনি এখান থেকে দিল্লী চলে যাবার সময় সেগুলি সযত্নে কলকাতার রাজভবনকে দান করে দিয়ে গেছেন। নিয়ে যাননি।

এখানে তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবিত বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছি।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা একবার নেপালের রাজার নিমন্ত্রণে কোনো একটা বিয়েতে নেপালে যান। সেখানে নেপালের তৎকালীন রাজা মহেন্দ্র শ্রীমতী পদ্মজাকে অনেক কিছু উপহারের সঙ্গে দুটি বড় বড় পিতলের শিঙ্গা উপহার দিয়েছিলেন।

কলকাতার রাজভবনে ফিরে এসেই পদ্মজা নাইডু হুকুম দিলে — শিঙ্গা দুটো কলকাতার রাজভবনে কেউ ফুঁকবে না। ও দুটি দিয়ে টেবিল স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প করা হোক এবং রাজভবনের স্যুইটের পাটরাণী প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে ও দুটো রাখা হোক।

আজও কেউ কলকাতার রাজভবনে এলে এই দু'টি সুন্দর বিশাল স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প দেখতে পাবেন প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইটে।

পদ্মজা রাজভবনের অতিথিদের খাবার সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সজাগ ছিলেন। তিনি যদিও রাজ্যপাল এবং তাঁর কর্মব্যস্ততা খানা কামরায় অনেক কিছু কাজ নিজে স্বচক্ষে মাঝে মাঝে দেখা শোনা করতেন খোঁজখবর নিতেন।

রাজভবনের অত্যাধুনিক প্রচলিত পান-পাকৌড়ি শ্রীমতী পদ্মজার একটা অভিনব সংযোজন। খাবার টেবিলে চূণ ও মশলা ছাড়া খিলি পান ডালের বেসনে ভেজে চিলি সস্ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করলে অত্যন্ত উপাদেয় লাগে এটা হয়তো শ্রীমতী পদ্মজা মনে মনে উদ্ভাবন করেছিলেন।

আর একটি খাবারের সংযোজন তাঁর। নানা রং-এর কাঁচা ভেজিটেবলের তৈরী স্যালাড নানা রকম সুন্দর সুন্দর মন্দির মসজিদের রূপে চীনা মাটির বড় বড় প্লেটে সাজিয়ে তার মধ্যে চপ কাটলেট আধশোয়া অবস্থায় রাখা। তার মধ্যে সুরভিত তীক্ষ্ণ হলদে মাসটার্ড এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তা দেখে যেন

মনে হতো সদ্য প্রস্ফুটিত সুন্দর সুন্দর আধ ফোঁটা সূর্যমুখী ফুল। যদিও এর বর্ণনা আগে দিয়েছি।

রাজভবনের লিলি পণ্ডে সুদূর নেপাল থেকে বয়ে আনা একটা সুন্দর নেপালী পুতুল যার মুখ দিয়ে অবিরত ঝরণাধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সকাল সন্ধ্যে রাত্রে দুপুরে, সেটাও শ্রীমতী পদ্মজার একটি নতুন সংযোজন এই কলকাতার রাজভবনে।

একবার শ্রীমতী পদ্মজার ইচ্ছে হলো তাঁর এয়ারকনডিশন করা রাজভবনের বেড রুমের সমস্ত দরজা জানলা এমন একটি সুইচ বোর্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকবে যে তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েই সেই নির্দিষ্ট বোতাম টিপলেই আপনি থেকে তাঁর ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে যাবে। তাঁকে আর তাঁর বেয়ারা চাপরাশীকে হুকুম করতে হবে না মাঝে মাঝে নির্মল বাতাসের জন্য তাঁর স্যুইটের শোবার ঘরের দরজা জানালা খুলে দিতে—কারণ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা পায়ে বাতের ব্যামোয় মাঝে মধ্যে অত্যন্ত কাহিল হতেন। সুতরাং তাঁর ডাক্তারের মত ছিল শুদ্ধ বায়ু ও রোদ লাগানো তাঁর দেহে। এয়ারকনডিশন বেশী ব্যবহার না করা।

কিন্তু এর যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য শেষ পর্যন্ত শ্রীমতীর এ অভিলাষ পূর্ণ হয় নি।

বর্ষীয়ান রাজ্যপাল টি. এন. সিং-এর পত্নী শ্রীমতী সুশীলা সিং খাঁটি দেহাতী ধর্মভীরু সরলা প্রকৃতির বর্ষীয়ান মহিলা ছিলেন।

এই শ্রীমতী সিং-কে কলকাতার রাজভবনে বার কয়েক দেখেছি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়তে। যেমন রাজভবনে আয়োজিত একটি মহিলা সভায় হিন্দীতে লেখা একটি ভাষণ তিনি দু চার লাইন পড়েই নমস্তে বলে বসে পড়লেন।

তাঁকে দেখেছি তাঁর রাজভবনের ঠাকুর ঘরে রাখা বেনারস থেকে বয়ে আনা তুলসী গাছ রৌদ্রের অভাবে শুকিয়ে গেলে কী রকম অস্বস্তি বোধ করতেন। যেন মনে হতো তিনি কিছু একটা অশুভের লক্ষণ আঁচ করছেন।

প্রতিদিন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এর শয়ন কামরা থেকে অফিসে রওনা হবার মুহূর্তে লেডী লাট সুশীলা সিং পূর্ণ কুম্ভ গঙ্গা জল দুয়ারে রেখে দিতেন যাতে লাটের যাত্রা শুভ হয়।

লেডী এমন ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন যে রাজ্যপাল একবার রুটিন মাফিক সদলবলে এপ্রিল মাসে দার্জিলিং যাচ্ছেন তিন সপ্তাহের জন্য কলকাতা থেকে, লেডী যাবার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে বলে বসলেন স্বামী ত্রিভুবন নারায়ণকে যে আমরা তো এই প্রচণ্ড গরমের দিনে দার্জিলিং যাচ্ছি গরমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিন্তু আমার ঠাকুর কৃষ্ণজী যে এখানে গরমে বহুত কষ্ট পাবেন। তার কী ব্যবস্থা হবে।

সুতরাং তৎক্ষণাৎ লাটের হুকুমে লেডীর দোতলার ঠাকুর ঘরে রুম কুলার বসানো হলো।

লেডী ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এমনিতে যাকে বলে সরল-হৃদয়া, ধর্মভীরু গ্রামীণ লেখাপড়া অনভিজ্ঞা মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরটা সদা সর্বদা স্নেহ বাৎসল্যে পূর্ণ থাকতো। রাজভবনের গুটিকয় বিশিষ্ট সম্মানীয় কর্মচারীর মধ্যে আমাকেও প্রতি সপ্তাহে এক দু'বার লাটের খাস স্যুইটে যেতে হতো।

তখন দেখেছি রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী লেডী লাট ও তাঁর পুত্র বধূরা আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন আভিজাত্যের বা সম্মানের কোন ফারাক না রেখে। এঁদের পরিবারের সকলেই অত্যন্ত সাদা মাটা স্নেহশীল ও অতিথিপরায়ণ।

কিন্তু পরিবেশ মানুষকে যে কতটা আত্মস্থ করে, কতটা বেহিসেবী করে তার একটি সুন্দর ঘটনা এখানে লিখছি।

লেডী লাট প্রথম যখন বেনারস থেকে কলকাতার রাজভবনে এলেন তিনি প্রায়ই আমাকে অনুযোগ করতেন—এ কী বিপদ বল তো। আগে যখন তোমাদের লাট, লাট ছিলেন না তখন কালীঘাটের মন্দিরে, বেলুড়মঠে যখন ইচ্ছে পুজো দিতে গেছি কলকাতায় এলে। কিন্তু এখন আমি একা পুজো দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ী যাবে, সঙ্গে এ. ডি. সি. যাবে, পাইলট যাবে। একি ঝামেলা বলতো? ঠাকুর দর্শনে যাবো এসব কেন? কৃষ্ণজী কি মনে করবেন?

আমি হেসে বলেছি—মাতাজী, এটাই নিয়ম রাজভবনের।

কিন্তু কিছুদিন পরে আমি একদিন অবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম লেডী লাট খাস বেয়ারাকে ডেকে বলছেন—রামসিংহাসন এ. ডি. সি কে বোলাও হ্যাম বাহার যাহেঙ্গে হামারা সাথ উনকো চলনে হোগা।

পাশেই বড় পুত্রবধূ ছিলু। লেডী লাট ত্রিভুবন নারায়ণ সিং চলে গেলে তিনি বললেন—দেখিয়ে মাষ্টারজী, আগে শাশুড়ী বলতেন, এ ডি সি কী হবে, বড় ঝামেলা। এখন দু'পা গেলেও এ ডি সিকে ডাকিয়ে নেন। একেই বলে আপনাদের বাংলার ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হওয়া। নয় কী? বলেই হেসে উঠলেন হো হো করে।

রাজভবনে সাহেব ভূত ও অন্যান্য

প্রায় দুশো বছরের পুরানো এই রাজভবনের আনাচে কানাচে ঝোপে জঙ্গলে, সাউথ গেটের পুষ্করিণীর কাছে বা রাজভবনের উপরের বিখ্যাত দরবার হলে মাঝে মাঝেই নাকি বৃটিশ আমলের উর্দি'পরা সাহেব ভূত দেখতে পাওয়া যায়। রাজভবনের পুরাতন মুসলমান কর্মচারীরা যাকে বলে 'জীন'। জীন নাকি মানুষের কোনো ক্ষতি কোনদিন করে না—ওরা তো তাই বলে।

এই রাজভবনে দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্যপাল হিসেবে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সব চেয়ে বেশী দিন কাটিয়ে গেছেন। সেই ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিক অবধি। প্রায় দশ বছরের কিছু বেশী।

এঁর আগে বৃটিশ আমলে যে কয়েকজন লাট এই রাজভবনে দীর্ঘদিন কাটিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন লর্ড কার্জন, লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও জন এ্যান্ডারসন্। প্রত্যেকে লাটগিরীর দুটো করে 'টারম'। অর্থাৎ পাঁচ বছরের পর পাঁচ বছর।

শ্রীমতী পদ্মজার সময় রাজভবনে সাহেবী ভূতের বেশ একটা মজার কান্ড ঘটেছিল।

রাজভবনে যে সশস্ত্র পুলিশ রক্ষীদল চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর লালবাজার থেকে রাজভবনে আসে পাহারা দিতে তাদের সমগ্র সংখ্যা একুনে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন হবে। তারা এই বিশাল রাজভবনের বিভিন্ন জায়গা পাহারা দেয়। কেউ থাকে সাউথ গেটে, কেউ থাকে মার্বেল হলে, কেউ বলরুমে, কেউ ব্যানকোয়েট হলে, কেউ বা থাকে রাজভবনের বাগানে। নানান জায়গায়। বিশাল এই রাজভবনের নানা আনাচে কানাচে।

শোনা যায় কলকাতার পুলিশদের তার সমগ্র কর্মজীবনের মধ্যে অন্ততঃ ষাটদিন রাজভবনে পাহারা দিতে হবেই। এটা শাস্তি। একটা পয়সাও আউট ইনকাম নেই। পুলিশরা সেটা ভাবতেই পারে না, অন্তত পক্ষে আজকালকার রাজত্বে।

এইসব পুলিশদের মধ্যে বহুদিন ধরেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে রাজভবনে বৃটিশ আমলের কিছু অপঘাতে মৃত সাহেব ভূত আছে।

রাজভবনের কনস্টেবল চৌবেজী ও পাঁড়েজী আমাকে তো মায়ে মাঝেই একান্তে ফিস্‌ফিস্‌ করে অনেক কল্পিত ভূত দেখার কাহিনী শুনাতো—বলতো তাদের পেটের দায়। তাই নোক্‌রী করছে। তবে তারা সোচ্চারে কিছু বলতে সাহস করতো না রাজভবনের খাস ইংরেজ ইন্‌সপেক্টার ইনচার্জ মিঃ বেলা, মিঃ উইলকিন্‌সন বা তার পরবর্তী ইন্‌সপেক্টার মিঃ ডোরানের দাপটে।

বৃটিশ আমলে তো ছিলই এখনও বরাবরের রেওয়াজ রাজভবনের যে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর হবে সে সব সময়ে পারত পক্ষে সাদা আদমী হবে।

আমি তো দীর্ঘদিন ধরে তাই লক্ষ্য করে আসছি। এটা কলকাতা রাজভবনের কনভেনশন না রুল তা জানি না। মিঃ বেলা সাহেব, মিঃ উইলকিন্‌সন্‌, মিঃ ডোরান সব ক'জন রাজভবনের পুলিশের ইন্‌সপেক্টার সাদা চামড়ার লোক।

সদ্য এ নিয়ম কিছুটা পালটেছে। রাজভবনের গভর্ণর এস্‌টেটে এদের কোয়ার্টার খুব সুন্দর, ওয়েল ডেকোরেটেড। রেন্ট ফ্রি। ভাড়া লাগে না।

এখানে রাজভবনে একবার যে ইন্‌সপেক্টার হয়ে আসে সে সচরাচর লাট বাড়ী থেকে অন্য কোথাও যেতে চায় না। তা ছাড়া খাশ লাটবাড়ীর পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের সম্মান নিশ্চয়ই অন্য সমগোত্রীয় কলকাতার পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের চেয়ে বেশী। অন্ততঃ লাটবাড়ীর সকল স্তরের কর্মচারীর মতো লাটবাড়ীর ইন্‌সপেক্টরও তাই মনে করেন—আর তিনি যদি সাদা চামড়ার পুরো বৃটিশ হন তবে তো কথাই নেই।

যাক যা বলতে যাচ্ছিলাম। রাত তখন ১-৩০টা হবে।

রাজভবনের বিশাল 'ব্যান্‌কোয়েট' হলের দক্ষিণেই দরবার হল। দরবার হলের থেনের কাছে পাহারারত একজন পুলিশ আর 'ব্যান্‌কোয়েট' হলেও ঐ সুদূরে কোণায় একজন পুলিশ।

হঠাৎ 'ব্যান্‌কোয়েট' হলের কাঁচের বড় ঝাড়গুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠলো। দু-চারটি কাঁচের টুকরোও মাটিতে গেল পড়ে। ঝাড়ের আলো গেলো নিভে। কেউ কোথাও নেই। এ কি কাণ্ড। দুজন পুলিশই দুদিক থেকে ছুটে এসে ভয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো। দুজনের মুখ চোখ সাদা ফ্যাকাশে। কোমরে আঁটা গুলিভর্ত্তি রিভালবার দুটোও যুগলবন্দী পুলিশের ভয়ে কম্পিত দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে।

এ রকম কতক্ষণ ছিল জানা গেল না। যখন রাত দুটোয় নূতন পুলিশ এলো দরবার হলে ডিউটি বদলাতে তখন দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে সেও গেল ঘাবড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হুইসেল বাজিয়ে দিল।

হেড জমাদার আর সমস্ত পুলিশ ছুটে এলো দরবার হলে। এ দৃশ্য দেখে তারা হতবাক্‌। তখন ওই দুজন পুলিশই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেছে।

নীচে থেকে জল এলো তাদের মুখে চোখে দেবার জন্য। জ্ঞান ফিরে এলে ঐ দুজন পুলিশ তাদের অভিজ্ঞতার শিহরিত বর্ণনা দিল—তারা নিজে স্বচক্ষে দেখেছে দীর্ঘদেহী সাদা সাহেবী পোশাকপরা একজন অশরীরী ছায়াকে দীর্ঘপদে হেঁটে যেতে ব্যানকোয়েট হল থেকে দরবার হলের দিকে। তারপর বেশ কয়েকদিন আর কোনো পুলিশই আর ওদিকে যেতো না।

আর একবার আর এক কাণ্ড। মিঃ শশধর মিত্র দীর্ঘদিন রাজভবনের ইলেক্‌ট্রিক্যাল সুপারভাইজার। রাজভবনের সমস্ত রকম ইলেকট্রিকের গণ্ডগোল

হলে তিনি ছুটে আসেন তাঁর কোয়ার্টার ১নং ওয়েলেসলী প্লেস থেকে খোদ রাজভবনে, সে রাত বেরাত যখনই প্রয়োজন হয়।

তিনি বেশ সাহসী স্মার্ট লোক। ইংরেজী গড় গড় করে অনর্গল বলতে পারেন। ভূতটুতে আদৌ বিশ্বাস করেন না। কেউ কখনও ওসব কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেন।

একদিন তাঁর কোয়ার্টারে খবর গেলো যে সাউথ ইষ্ট লিফটে গেষ্ট আটকা পড়েছে। অটোমেটিক লিফট্। বাইরে থেকে রাজভবনের পাহারারত পুলিশ লিফটের ভেতরের যাত্রীদের লিফটে পদাঘাত শুনতে পাচ্ছে।

রাত তখন হবে প্রায় বারোটা। শীতকাল। মিঃ মিত্রের কোয়ার্টারে খবর গেলো। উনি হতদন্ত হয়ে ছুটলেন রাজভবনের লিফটের দিকে। নীচে থেকে অনেক চেষ্টা করলেন আটকানো লিফটকে নামিয়ে আনতে। বিফল হলেন। তখন রাজভবনের তিনতলার ছাদে উঠলেন হাত-হ্যান্ডেল চালিয়ে লিফট্ বিপদমুক্ত করে নীচে নামিয়ে দিতে।

লিফট আস্তে আস্তে নিচে নামল। আটকানো যাত্রীরা বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু একি? তিনতলার উপরের ছাদের লিফটের ঘরের দরজা আগলিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তো সঙ্গে কাউকেই নিয়ে আসেন নি। কে? ও কে? বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

একদৃষ্টে একজন সুটপরা সাহেব লোক দু'হাত দিয়ে তার যাবার পথ আটকিয়ে রেখেছে। মিঃ মিত্র চোখের চশমা খুললেন। না সত্যিই তো। কে? কে? তুমি কে? ছায়াধারী নিষ্পলক।

মিঃ মিত্র খুব ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বর্ধমানের অজগ্রামের ছেলে। সাহসী সহজে মনের বল হারান না। রাজভবনে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর কাটাচ্ছেন। এমন অভিজ্ঞতা তো ইতিপূর্বে তার হয়নি। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটা মতলব।

তিনি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরালেন। ভূতেরা নাকি আগুন দেখলে ভয়ে পালায়। মনে হলো অশরীরী আত্মাটা মুখ ব্যাজার করে সরে গেলো।

মিঃ মিত্র ছুটতে ছুটতে এসে দোতলায় ইয়েলো ড্রয়িং রুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। পাহারারত পুলিশরা ছুটে এসে তাঁর চোখে মুখে জল ছিটে দিলে তিনি সজ্ঞান হলেন।

তাঁর আর সন্দেহই রইল না রাজভবনে ভূত আছে। এরপর থেকে তিনি একজন এ্যাটেনডেন্ট বা হেলপার ছাড়া কখনও রাজভবনে রাত্রে একলা ইলেক্‌ট্রিকের কোনো ব্রেকডাউনে কাজ করতে বেরোতেন না।

এখন যেখানে রাজভবনের সাউথ গেট ময়দানের দিকে, ঠিক যার সামনে আছে মহামান্য তিলকের মূর্ত্তি সেখানে দুশো বছর আগে নাকি মহাশ্মশান ছিল।

পুরানো কলকাতার ইতিহাস তাই বলে। তখন যদিও এ জায়গার নাম ছিল

-না কলকাতা। ছিল গোবিন্দপুর। আর এখন যেখানে জি পি ও অর্থাৎ বড় পোস্টাপিস সেখানে বৃটিশ সেনানীদের আস্তা বা ছাউনী ছিল। ময়দানের বর্তমান সেনানীদের ফোর্ট উইলিয়ম তখনও গড়ে ওঠে নি।

ময়দান খাঁ খাঁ করতো। কিছু কুঁড়ে আটচালা ছিল। রাত্রে শেয়ালের ডাকে গোবিন্দপুরের প্রহর গণনা হতো। বেশ জঙ্গল ছিল। ইতিহাসেও তার সাক্ষী আছে। জনশ্রুতিও তাই বলে।

এই সাউথ গেটে বা তার আশে পাশে রাজভবনের কম্পাউন্ডের ভেতর এখনও অধিক রাত্রে পুলিশ একাকী পাহারা দিতে ভয় পায়।

ওখানে নাকি অনেক পাহারারত পুলিশের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে অধিকরাত্রে খড়ম দীর্ঘদেহী আজানু শ্মশ্রুগুম্ফলম্বিত গেরুয়া পরা কোন এক অশরীরী আত্মা ধীরে ধীরে পদচারনা করতে করতে রাজভবনের দক্ষিণ গেটের পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরে নিত্য ডুব দিয়ে স্নান সারেন। পুলিশের মতে ব্রহ্মদৈত্যের ক্যাটাগোরীতে এই ভূত বাবাজীকে ফেলা চলে।

রাজভবনে আরও কিছু কিছু মজার ঘটনা ঘটে থাকে।

রাজভবনের নিজস্ব টেলিফোন পি বি এক্স্ আছে। যেখানে সব সময়েই একজন টেলিফোন অপারেটার থাকবেই থাকবে। পি বি এক্স্ ঘরের ভেতরেই টেলিপ্রিন্টার মেসিন বসানো আছে। তাতে কত দেশ বিদেশের টাটকা খবর আসছে হরদম কাগজে ছাপা হয়। রাজ্যপালকে তখনই সেটা ছিড়ে ডাকপ্যাডে পুরে জানাতে হচ্ছে।

এই রাজভবনের পি বি এক্স-এ রাত্রেও একজন করে টেলিফোন অপারেটার থাকে।

রাজভবনের কুশান দেওয়া চেয়ারে তিনি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে নেন। আবার টেলিফোন কল্ এলে তা রিসিভও করেন সে যত রাতেও হোক।

১৯৬০ সালের তেসরা জানুয়ারী শোনা গেলো রাজভবনের টেলিফোন রুমে গতরাত্রে নাকি একটা মস্তবড় বাঘ রাজভবনের বাগানের জঙ্গলের ভেতর থেকে এসে ঢুকেছিল। কী ব্যাপার।

টেলিফোন অপারেটার মিঃ চক্রবর্তী গতরাত্রে তখন নিদ্রামগ্ন। তার পা চেয়ার থেকে শোওয়া অবস্থায় মাটিতে রয়েছে। ফোস্ ফোস্ শব্দ শোনা গেলো। মিঃ চক্রবর্তী ঘুম ভেঙ্গে বাপরে বলে টেলিফোন বোর্ডের উপর উঠে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরুচ্ছে না। ঘরে ভীষণ একটা উগ্র গন্ধ। দম্ বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। জানোয়ারটি দু'চারবার এদিক ওদিক ঘুরে আস্তে আস্তে ঘরের দক্ষিণের দরজা দিয়ে রাজভবনের বাগানে বেড়িয়ে গেলো।

মিঃ চক্রবর্তী কিন্তু সারারাত ঠায় ঐ টেলিফোন বোর্ডের উপর বসে রইলেন। টেলিফোনে সে রাত্রে কোন 'কল' এসেছিল কিনা কে জানে। তবে পরের দিন সকালে মিঃ চক্রবর্তীর মুখে সে ঘটনা শুনে রাজভবনের দীর্ঘদিনের প্রাক্তন এক

শিয়ান অফিসার মন্তব্য করলেন ও কিছু না। ভাম্। তবে বড় সাইজের। ওদের গায়ে খুব উগ্র উৎকট গন্ধ থাকে। মানুষকে সাধারণত কামড়ায় না। সেইখানে ঐ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

এই কিছুদিন আগেও খাস রাজভবনের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রাজভবনের বাগানে গাছে গাছে কিছু লাল বাঁদর ছিল। ডালহৌউসী স্কোয়ারের অনেক পুরানো অফিস বাবুরা তাদের দেখেছে। মাঝে মাঝে তারা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে মস্করা ও হাসি ঠাট্টা করেছে।

রাজভবনের সবচেয়ে পুরানো মালী গুণধরের মতে কোন্ এক ইংরেজ লাট ঐ লাল বাঁদরগুলি রাজভবনের বাগানে ছেড়ে দিয়েছিল আগ্রা থেকে খাঁচা বন্দী করে এনে।

বাগান থাকলে এবং তার মধ্যে ঘন জঙ্গল থাকে তবে বাঁদরের ও নানা রকমের পাখীর প্রয়োজন ঐ জঙ্গলের সৌন্দর্যের জন্য। এটা নাকি তদানীন্তন সেই বৃটিশ লাটের মত ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত প্রবাদ মনে পড়ে।

শোনা যায় হিমালয়ের উচ্চে দার্জিলিং শহরে কোন কালো কাক আগে নাকি ছিল না। কাকের কা কা রব—দেশের কবি, লেখক থেকে মায় সাধারণ গৃহস্থও সহ্য করতে পারে না।

বাংলা কাব্যের রাজ্যে তো কাক পক্ষীকুলের মধ্যে সব চেয়ে নিচু পঙ্‌ক্তিতে আছে। প্রায় ফুলের রাজ্যে অপাংক্তেয় ঘেঁটু ফুলের মতো। 'কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে, কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে'—এ বাঙালী কবিরই উচ্ছ্বাস।

বহু ভাগ্যবান বাংলার কালো কোকিল। বিলাতের যেমন অতি আদরের স্কাইলারক্।

তবু পরিবেশে মানুষের মন বদলায়। কলকাতার উজ্জ্বল চৌরঙ্গীতে যে আদিম বাসীকে নোংরা কুৎসিত দেখায় তাকেই আবার বিহারের পালামৌ জেলার জঙ্গলে দেখতে বেমানান মনে হয় না। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এটা বাঙালী লেখকেরই কথা।

তাই দার্জিলিংবাসী বাঙালী গৃহস্থ বধূরা বর্ধমানের রাজাকে ধরলেন। দার্জিলিং-এর পাহাড়ে, উপত্যকায় বাংলাদেশের কালো কাক উড়তে যেন দেখা যায়।

বাঙালী প্রবাসী বধূর চোখে বাপের বাড়ীর অনাদরের কালো কাকও দূর প্রবাসের সামান্য সান্ত্বনা।

তাঁরা দাবী করলেন কালো কাকের কঠোর তীক্ষ্ন রব যেন বরফাচ্ছাদিত সমাহিত দুগ্ধফেননিভ কাঞ্চনজংঘার কন্দরে কন্দরে, গুহায় গুহায় গিয়ে পৌঁছায়। সঠিক প্রমাণিত হোক সুন্দরী দার্জিলিং শহর বাংলাদেশেরই

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অঙ্গচ্ছেদ নয়। নেপাল রাজের বৃটিশরাজকে যৌতুক দেওয়া অনূঢ়া কন্যা নয়।

বর্ধমানরাজ কথাগুলির যুক্তি শুনে একটু যেন হাসলেন। এই যুক্তিতে সম্মতও হলেন। দশ ঝুড়ি ভর্তি কালো কাক বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীগ্রাম থেকে ধরে এনে দার্জিলিং শহরের আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হলো।

তারাই আজ বংশ পরম্পরায় দার্জিলিং-এর কাক গোষ্ঠী।

শীতল পাহাড়ের গায়ে বেস একটু উত্তপ্ত রোদের শান্ত ছোঁওয়া।—গাঢ় নিস্তব্ধতার মাঝে যেন একটু কর্কশ শব্দের ঝলকানি। প্রাণের আমেজ। পাহাড়ী পরিবেশের স্বর্ণ রত্নালঙ্কার।

তবে এসব নিছক কল্পনা বা জনশ্রুতিও হতে পারে। দার্জিলিংবাসী অনেক বাঙালীদের মুখেই আমি এ গল্প শুনেছি—বার বার।

ই বলছি রাজভবনের বানরদের একটা অলিখিত সৌন্দর্য ছিল রাজভবনের জঙ্গলের পরিবেশের মাঝে। এই লালমুখো বানরকুল মাঝে মাঝেই রাজভবনের রাস্তা পেরিয়ে এ. জি. বি. বা গভর্ণমেন্ট প্রেসের স্টাফ কোয়ার্টারে হানা দিত যে ক'জন গৃহস্থ তখন ওখানে থাকতেন তাদের সব্জির ঝুড়ীতে কলাটা মুলোটা বা রান্না করা খাবারে ভাগ বসাতে।

একবার এক ঘটনা ঘটেছিল এই বাঁদর নিয়ে রাজ্যপাল হরেন মুখুজ্যের সময়ে ১৯৫৪ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে।

র মজার কৌতুকাবহ ঘটনা। বৃটিশ চলে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। রাজভবনের ফুলের বাগান কাট ছাট করে তাতে মর্তমান কলাগাছ লাগানো হয়েছে; দূরে দূরে পেয়ারা গাছেরও ভীড়। রাজ্যপাল কাটজু কাশী থেকে এনে কলকাতার রাজভবনে লাগিয়েছেন।

রাজভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিলাতী আঙুরের বড় মাচান। পুষ্টু রসাল আঙুর থোকা থোকা ঝুলছে। এছাড়া মাটিতে লাগানো হয়েছে চীনা ছোট্ট মুলো।—চাইনীজ মুলোর বেড। এই ঝাঁঝওয়ালা মুলো দেশী বিদেশী অতিথি অভ্যাগতদের খাবারের পাতে কাঁচা কাঁচা দেবার জন্য। ছোট্ট ছোট্ট ওই মুলো। অত্যন্ত সুস্বাদু।

এক কথায় হরেক রকমের ফল সব্জী বাগান হয়ে উঠেছে তখন কলকাতার খাস রাজভবনে। এক কথায় রাজ্যপাল হরেন মুখুজ্যে রাজভবনের বাইরে থেকে কেনা কাঁচা তরিতরকারির খরচ কমাতে সবিশেষ ইচ্ছুক।

হঠাৎ রাজভবনের হাউসহোলডের প্যান্ট্রির শৈবালবাবু লাট হরেন্দ্রকুমারের কানে তুললেন—'স্যার বাগানের নারকেল গাছ থেকে সব ডাব চুরি যাচ্ছে।'

লাটবাগানে চুরি! হরেন মুখুজ্যে তো রেগেই আগুন। তসব হলো বাগান সুপারভাইজারের। কী হে বিজলী আমার ডাব নারকেল সব কে খেয়ে যাচ্ছে? হরেন মুখুজ্যের গম্ভীর অর্থ পূর্ণ ধমক।…

মাথা চুলকাতে চুলকাতে গার্ডেন সুপারভাইজার মিঃ বিজলী চ্যাটার্জি উত্তর দিলেন 'স্যার বাঁদরের যে উপদ্রব হয়েছে। বাগানে কিছু থাকছে না।'

গম্ভীর মূর্তি উত্তেজিত রাজ্যপাল হরেন মুখার্জী বাগান সুপারভাইজারের এ কথা শুনে ছোট্ট ছেলের মতো হেসে উঠলেন—কী হে বাঁদর আবার গাছ থেকে ডাব পেড়ে খায় নাকি ? না-না ও বাঁদর নয়। খোঁজ নাও তো রাত্রে যে পুলিশ পিকেট থাকে রাজভবনের বাগানে তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় বাঙাল ছেলে কোনো পুলিশ আছে কি না ? তবেই এ রহস্যের কুলকিনারা হবে। তবেই সব চোর ধরা পড়বে।

সত্যই দেখা গেলো রাত্রে পুলিশ প্রহরীদের মধ্যে দু' চারজন পূর্ববঙ্গীয় পুলিশ দলবল নিয়ে রাত্রে নারকেল গাছে চড়ে ডাব পাড়ে আর ওগুলি ভাগাভাগি করে খেয়ে সাবাড় করে। ডাবের ছোবড়া বা চোকলা গাছের তলা থেকে তারা সযত্নে নিপুণ হাতে কুড়িয়ে নিয়ে রাজভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আকাশবাণী রেডিও স্টেশনের দিকে যে ময়লা ফেলার 'ভ্যাট বা ডাস্টবিন' আছে তাতে ফেলে দেয়।

দেখা গেল ডাব ও নারকেলের খোসার পাহাড় সেখানে স্তূপীকৃত ভাবে জমে আছে। বাঁদর কখনো নারকেল ভেঙ্গে খেয়ে ছোবড়া ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না—এ যুক্তি সত্যই হরেন্দ্রকুমারের মধ্যে আপনভোলা কৌতুকপ্রিয় শিক্ষক মানুষটিকে সকলের সামনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

এই রকম ছোট্ট ছোট্ট শিক্ষামূলক রসাল অভিব্যক্তি রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের মুখ থেকে অজস্র বের হতো।

এখনও যাঁরা রাজভবনের পুরানো দিনের কর্মচারী আছে তাদের কাছে এগুলি হীরামুক্তো মাণিকের মতো অন্তরের নিভৃত কোণে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

হরেন্দ্রকুমারের কথা উঠলে এখনও সব লাট ফেলে তাঁর কথায় কেন জানিনা চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। কী ব্যক্তিত্ব, কী গরীবের জন্য প্রাণ ঢালা ভালবাসা। আমার তো মনে হয় করুণাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর এই হতভাগ্য বাংলা দেশে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের মতো সহানুভূতিশীল দরদী মানুষ বড় একটা জন্মগ্রহণ করে নি।

রাজভবনে—লাটের রুমাল ও লাটের জুতো

একটি চালু প্রবাদ আছে লোকের পায়ের জুতো দেখলেই তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা হয়ে যায়—লোকটি কৃপণ কি না? লোকটি স্বভাবে পরিচ্ছন্ন কি না? বা লোকটি অলস কি না?

কথায় বলে a man is known by the shoes he wears.

বেশ কিছুদিন পূর্বেও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পূর্বে লর্ড ব্রাবোর্ণ, লাট ব্যারোজ, লাট হারবার্ট লাট কেসী প্রভৃতি বাংলার গভর্ণরদের পায়ের জুতো তৈরী করতো কলকাতার একটি বিখ্যাত জুতো কোম্পানী—তবে সেটা বাটা নয়—একটি চৈনিক কোম্পানী। তারা লোক পাঠাতো রাজভবনে স্বয়ং লাট ও লাটগিন্নীর পায়ের মাপের জন্য।

তখনকার জমানায় রাজভবনে এসে বৃটিশ লাট ও লাটগিন্নীর পায়ের মাপ নেওয়াও সমাজে একটা মস্ত স্ট্যাটাস সিমবল ছিল।

সত্যি বলছি রাজভবনে সুদীর্ঘ আমার কর্মজীবনে দেখে আসছি সেই বৃটিশ লাটেরাও যেমন জাঁকজমক পছন্দ করতেন, আজকের দেশ স্বাধীন হবার পরও দেশী লাটেরা তেমনি আছেন। কেবলমাত্র পূজনীয় হরেন্দ্রকুমার ও রাজাজীকে বাদ দেওয়া চলে এঁদের মধ্য থেকে।

না হলে কলকাতার রাজভবন বৃটিশ আমলে জাঁকজমক হয়তো ছিল কুড়ি এখন স্বাধীন ভারতে হয়তো সেটা হচ্ছে উনিশ—অর্থাৎ তফাৎ উনিশ বিশ। এর বেশী ফারাক্ নেই। এটা হলফ করে বলা যায়।

মনে পড়ে যায় একবার লর্ড ব্রাবোর্ণের সময় তাঁর এখানে তৈরী নতুন জুতো সবিশেষ মনঃপূত হলো না।

দামী মহামূল্যবান জুতো। তখনকার দিনে ৬০।৭০ টাকা দাম হবে। ভেবে দেখুন ১৯৩৭ সালে। জুতো কোম্পানী তো মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। এই জুতো নিয়ে কী করবেন। কিন্তু স্বয়ং লাট ব্রাবোর্ণই তার সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি জুতো রহস্যের কথা গোপনে জানতে পেরে সেই নতুন জুতো জোড়াটি নিজে দাম দিয়ে কিনে নিলেন। দিন কয়েক জুতো জোড়াটি তাঁর সু স্ট্যান্ডে রেখে সেটি পরে রাজভবনের হাউসহোল্ডের একজন সৌখিন বাঙালী কর্মচারীকে দান করে দিলেন।

মজার কথা লাটের দানের জুতো পেয়ে মিঃ ভূপতি মুখার্জী সেটা নিজের বাড়ীর কিউরিও কেসে সযত্নে রেখে দিলেন। এই সেদিনও তাঁর বাড়ীতে সেটা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।—লর্ড ব্রাবোর্ণের নাম কাগজে আঁটা জুতো জোড়াটির মাথায়।

বৃটিশ প্রদত্ত রায় সাহেব খেতাবধারী এই বাঙালী বাবুটি লর্ড ব্রাবোর্ণের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন।

এই রকম ছোটখাটো টিপস্ বা দান তখনকার দিনের সাদা চামড়ার লাটেরা প্রায়ই করতেন তাদের অধস্তন প্রভুভক্ত রাজ কর্মচারীদের। বলা বাহুল্য লর্ড ব্রাবোর্ণের জন্য আবার সেই বিখ্যাত কোম্পানী নতুন করে তাঁর মনের মতো একজোড়া জুতো তৈরি করে দিলেন।

কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় রবিবাসরীয় প্রবন্ধে ৬ই আষাঢ় ১৩৭৭ ও ৩০শে আষাঢ় ১৩৭৭ সংখ্যায় 'লাটের রুমাল লাটের জুতো' ও 'লাটের রুমাল—আরো খবর' এই শিরোনামায় দুটি কৌতুহলোদ্দীপক লেখা বার হয়।

তার কিছু কিছু অংশ এখানে দেওয়া যেতে পারে। তাতে আছে—'লাট কথার প্রচলন হয়েছিল পরাধীন ভারতে। তখন বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিকে আমরা লাট বলতাম। 'লাট' আবার ছিল দুই রকমের।—বড়লাট ও ছোটলাট। বড়লাট ছিল ভারত সরকারের প্রধান আর ছোটলাট প্রদেশ সরকারের প্রধান। এখনও ঝগড়াঝাটির সময় আমরা "লাটসাহেব" কথার প্রয়োগ করি।

কিন্তু "লাটের রুমাল" ব্যাপারটা কি? স্বভাবতই মনে হবে রুমালটি নিশ্চয়ই বৃহদাকার। দামী তো বটেই।

আবার কেউ হয়তো মনে করবে রুমালে নিশ্চয়ই মণি মুক্তা খচিত থাকতো। আবার কেউ হয়তো ভাববে পূর্বরাগ বা অনুরাগ মিশ্রিত থাকতো। কিন্তু কোনোটাই নয়।

রাজভবনের ইতিহাসের পাতা রুমালটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রুমালটি নিজেই এক ইতিহাস রচনা করেছে। শুধু মাত্র আমাদের দেশে নয় বিশ্বে। রুমালটি ছিল রঞ্জিত ও সিল্কের। অতি সাধারণ। নামী দামী তো নয়ই, উপরন্তু আমাদের দেশীয়।

কিন্তু এই রুমালটি বিশ্বের পার্লামেণ্টের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

১৯১৫ সাল; বঙ্গীয় আইন পরিষদে ঐ রুমালটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

পরিষদের আলোচনায় তা লিপিবদ্ধ আছে। কোনো দেশের পার্লামেণ্টের ইতিহাসে এরকম আর দেখা যায় না। সত্যিই অভিনব।

তখন বাংলার লাট ছিলেন লর্ড কারমাইকেল তিনি নিজে ঐ রুমাল ব্যবহার করতেন। তার সম্মতি নিয়েই মিঃ বিটসনবেল বঙ্গীয় আইন পরিষদে ওটির ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারী দপ্তরের কর্মদক্ষতা বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ করে স্বয়ং লাট বাহাদুরের প্রয়োজনেও।

ছোট রঞ্জিত রুমালটি পরিষদের সদস্যদের দেখিয়ে মিঃ বিটসনবেল বলেছিলেন —এই রুমালটির ইতিহাস অভিনব।

স্বয়ং লাটবাহাদুর মহামান্য লর্ড কারমাইকেল বিলেতে থাকাকালীন এডিনবরার

একটি দোকান থেকে এই রুমাল কিনে ব্যবহার করতেন। শুধুমাত্র কারমাইকেল সাহেবই নয়, তাঁর সমগোত্রীয় বিলেতের গণ্যমান্য লোকেরা ঐ রুমাল ব্যবহার করতেন

ভারতে আসার প্রাক্কালে মহামান্য লাট বাহাদুর ঐ দোকানকে বললেন যে, তাঁর আর ঐ রুমালের দরকার হবে না। তিনি শীঘ্রই ভারতে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে ওটি খরিদ করবেন।

লর্ড কারমাইকেল মাদ্রাজে অবতরণ করেই তাঁর একখানা রুমাল স্যাম্পেল হিসেবে ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এক ডজন রুমাল খরিদ করবার জন্য। কিন্তু তারা জানালেন যে ঐ রুমাল তাঁদের কাছে নেই। বোধহয় ঐ রুমাল বাংলাদেশে তৈরী হয়।

তারপর লাট বাহাদুর বাংলাদেশে এসে ঐ রুমালের অনুসন্ধান সুরু করলেন কলকাতায় ও তার আসে-পাশে। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল জানালেন যে ঐ রুমাল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, বোধ হয় ওটা বোম্বেতে তৈরী হয়।

তখন তিনি বোম্বেতে ঐ রুমালের অনুসন্ধান সুরু করলেন।

কিন্তু বোম্বে থেকে উত্তর এলো যে ঐ রুমাল বোধহয় বার্মাতে তৈরী হয়। বার্মা তখন ইংরেজের অধীনে। লাট বাহাদুর তখন বার্মাতে রুমালের খোঁজ করালেন। কিন্তু বার্মা সরকার জানালেন যে ঐ রুমাল বোধহয় জাপানে তৈরী হয়।

লাট বাহাদুর তখন ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কাছে রুমালটি পাঠিয়ে দিলেন জানার উদ্দেশ্যে যে ভারতের কোন প্রান্তে এই রুমাল তৈরী হয়।

কয়েক মাস পরে জবাব এলো যে ঐ রুমালটি বোধহয় খাঁটি ভারতীয় রুমালই নয়। ওটি সম্ভবত ফরাসীদেশের দক্ষিণ প্রান্তে পাওয়া যায়।

তখন লর্ড কারমাইকেল এডিনবরার সেই দোকানকে এক ডজন রুমাল পাঠাবার জন্য লিখলেন। সঙ্গে একটি চিঠিও দিলেন অনুরোধ করে জানাতে যে ভারতের কোন প্রান্তে ঐ রুমাল তৈরী হয়।

কিছুদিন পরে এডিনবরার সেই দোকান এক ডজন রুমাল পাঠালো এবং সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে ঐ রুমাল বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ নামক স্থানে তৈয়ারী হয়। এখানে বলা দরকার এই ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ আমার (লেখকের) মাতৃভুমি। এরজন্য আমি গর্বিত।

কিন্তু কি অপূর্ব ব্যাপার, ভারতের জিনিস ভারত জানে না, বাংলার জিনিস বাংলা সরকার জানে না।

শেষ পর্যন্ত ঐ রুমাল মুর্শিদাবাদের কোথায় পাওয়া গেলো তা কৌতুহলোদ্দীপক। কলকাতার লাটবাড়ী হতে ঐ রুমালের সন্ধান করবার জন্য মুর্শিদাবাদের বৃটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট তলব যাওয়ার পর ম্যাজিস্টেট সাহেব বহরমপুর খাগড়ার ঐ সময়ের প্রধান সিল্ক ব্যবসায়ী শশাঙ্ক মোহন বাগচী মহাশয়ের নিকট নমুনা সহ লোক পাঠান। বাগচী মহাশয় ঐ দিনই কয়েক খানা রুমাল সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এ সমস্যার সমাধান এতো সহজে হবে।

ঐ রুমাল এবং গাউনের জন্য সাদা এবং রুমালের অনুরূপ ছাপা সিল্ক প্রভৃতি ঐ বাগচী মহাশয় তখন ফ্রান্সে রপ্তানি করতেন।

এর বৎসর খানেক পর লর্ড কারমাইকেল যখন মুর্শিদাবাদ সফরে যান তখন ঐ রুমাল কোথায় কী ভাবে তৈয়ারী হয় তিনি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বাসভবনের অতি নিকটে বহরমপুর শহরের শেষ উত্তর প্রান্তে, জনবিরল স্থানে দুইটি খড়ের ঘর। একটিতে রুমাল প্রস্তুত কারক আবদুলের বাস, অপরটিতে তার ছাপার কারখানা।··

বাংলার লাট সাহেব তার ঐ স্থানে যাবেন শুনে তো আবদুল হতবাক।

এ খবর শহরের অনেক লোকও বিশ্বাস করতে চান নি। অনেকেই মনে করেছিল মহারাজ নন্দকুমারের জীর্ণ ও ভগ্ন বাসস্থানগুলি এবার বোধহয় পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হবে।···

যাইহোক অনেকেই সেদিন আবদুলের কারখানার আশে-পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৫।২০ মিনিট সময়ের মধ্যে বিব্রত আবদুল দুখান সিল্কের ২০ ইঞ্চি স্কোয়ার রুমাল ছেপে সেলাম করে লাট সাহেবের হাতে দেন।

লর্ড কারমাইকেল তাঁর দস্তানাপরা হাত বাড়িয়ে আবদুলের রঙিন হাত মর্দন করেন এবং তাকে দুখানি সুবর্ণ মুদ্রা উপহার দেন।

এই রুমালে বিভিন্ন রঙ ছোট ছোট মুরগীর ছাপ থাকতো, যতদূর স্মরণ হয় ঘোর নীল রঙ, অধিক থাকতো লাল ও হলদে রঙ।

সব রঙই কিন্তু গাছ গাছড়া হতে সে নিজে তৈরী করতো। ১৫।২০ খানা মাটির শানকীতে (সরা) ঐ সকল গাছের ছাল, শিকড়, পাতা ভিজানো থাকতো—দুটি তিনটির মিশ্রণে একটি রং হতো।

এ রুমাল বহরমপুর শহরে অনেক পূর্ব হতেই লোকে নানাভাবে ব্যবহার করতেন, গলায় বাঁধার জন্য বা ছোট টেবিলে বিছাবার জন্য ব্যবহার হতো।

দাম ছিলো তখন একটাকা পাঁচ সিকে। যেদিন হতে ওটা কারমাইকেল Hand Kerchief হলো, দাম হয়ে গেল দু টাকা করে। এই Vegetable Dye পাকা রঙ ছিল কখনও উঠতো না।

তারপর আবদুলের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়েছে তার কারখানাতেও অনেকবার গিয়েছি, ছাল বাকল ভিজানো দেখেছি, কিন্তু গাছের নাম কখন জানা যায় নি, কাউকেও বোধ হয় সে কোনোদিন বলেনি—জিজ্ঞাসা করলে হেসে সে সামনের গভীর জঙ্গল দেখিয়ে দিতো। তার মধ্যে বোধহয় দিনেও রোদ ঢোকে না।

আবদুল এখন আর নেই, তার ছেলে পুলেরাও এখন বেঁচে নেই, বাগচী মহাশয়ের ব্যবসাও নেই এবং কারমাইকেলের রুমালও আর পাওয়া যায় না।

[illegible] "লাটের জ্বতো"।

লাট [illegible] আশা করা যায়। প্রথমে হয়তো মনে হবে যে লাটের [illegible] মরিসন এবং বেটল বা বাটা কোম্পানি বা ঐ রকমের নামীদামী কো[illegible] তৈরী বা ইউরোপের কোনো দেশ থেকে বিশেষ অর্ডারে তৈরী। কিন্তু তার কোনোটাই নয়।

এসব অতি সাধারণ জ্বতো কলকাতার বেণ্টিক স্ট্রিটের দ্বইজন চীনা আ—ইয়ক্ ও তার বন্ধ্ব ওটি তৈরী করতো। জ্বতার মালিক ছিলেন স্বয়ং লাট বাহাদ্বর লর্ড কারমাইকেল। লাটগিন্নীর জ্বতোও ঐ চীনাদ্বয় তৈরী করতো। লাটসাহেবের জ্বতো তৈরী করবার ফলে চীনাদ্বয় কলকাতার সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল তখন।

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। একদিন ঐ চীনাদ্বয়কে ৩১ সের আফিং বেআইনীভাবে মজ্বত করার অপরাধে গ্রেপ্তার করে কোর্টে হাজির করা হল।

বিচারক ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্বইন হো। আসামী পক্ষের উকিল মিঃ এইচ ডি ঘোষ জামিনের জন্য কোর্টে আবেদন জানালেন। আবেদনে উল্লেখ ছিল যে আসামীদ্বয় লাট ও লাটগিন্নীর জ্বতো তৈরী করেন এবং তাঁরা অত্যন্ত রাজভক্ত। সমাজে তাদের মান সম্মান ক্ষ্বন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের শত্রু রিপাবলিকান পার্টির কিছ্ব সদস্য অন্যায়ভাবে এই মামলায় তাঁদের জড়িয়েছে। বিচারক জামিন মঞ্জ্বর করলেন এবং সত্যঅন্বসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্বলিশকে নির্দেশ দিলেন।

কিছ্বদিন পরে আসামীদের ম্বক্তি দেওয়া হলো। সত্যিই লাট নামের মাহাত্ম্য। সাত খ্বন মাপ।

শেষ করি আজকের কলকাতার রাজভবনে একটা অমর্যাদাকর ঘটনার উল্লেখ করে। আজকের স্বাধীন ভারতের দেশীয় রাজ্যপাল, তার নাতি নাতনি ছেলে বউদের সব জ্বতো, চটি, নাগরা, চপ্পল রাজভবনের হাউস খালাসি বা বেয়ারা চাপরাশিদের ম্বখ ব্বজে পালিশ করতে হয়। ম্বচির কাজ তারা ম্বখ ব্বজে করে চলেছে সেই বৃটিশ আমল থেকে কারণ লাট বা রাজ্যপালদের মাইনে করা সব কিছ্ব আছে, নেই কেবল ম্বচি।

সেই বৃটিশ আমল থেকে কলকাতার লাটবাড়ীতে নাপিত, ঠাকুর, ধোবা, মশালচী, কামার, রাজমিস্ত্রী, ড্রাইভার ঝাড়্বদার, বেয়ারা সবাই আছে।—কিন্তু নেই কেবল মাইনে করা হতভাগ্য আমাদের দেশের ম্বচি আর ততোধিক ভাগ্যহীন স্বাধীন ভারতের জ্বতো পালিশ বয়।

রাজভবনের এ ডি সি

গভর্ণর হাউস বা রাজভবনের গভর্ণর বা রাজ্যপালের পরেই যাদের দাপট আকাশচুম্বী তারা হচ্ছেন রাজ্যপালের এ ডি সি, ইংরেজীতে যার সারমর্ম Aide in Camp

এরা রাজ্যপালের সঙ্গে সদা সর্বদা ঘোরাফেরা করেন। রাজ্যপালের সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে সেই নিশুতিরাতে যতক্ষণ না রাজ্যপাল শুতে না যাচ্ছেন তখন পর্যন্ত এঁরা রাজ্যপালের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকেন সদা সতর্ক প্রহরীর চোখ নিয়ে। এটাই বৃটিশ জমানার ফেলে যাওয়া রীতিনীতি।

এঁরা রাজ্যপালের সদা সর্বদার সঙ্গী। যেমন আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন—"বহ্নি ধুমায়মানা দৃশ্যতে—অর্থাৎ পর্বতের আগুন দেখলেই যেমন বোঝা যায় ওখানে আগ্নেয়গিরি আছে, তেমনি রাজ্যপালকে যেখানে দেখা যাবে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ধরাচুড়া পরা তাঁর এ ডি সি হাজির থাকবেই। কারও কোমরে তলোয়ার ঝুলছে অর্থাৎ নেভীর লোক, কার বুকে আঁটা গণ্ডাচারেক লাল সবুজ ব্যাজ অর্থৎ পদাতিক বাহিনীর।

ঈগল মার্কা টুপি পরা বিমান বাহিনীর এ ডি সি-ও মাঝে মধ্যে এখানে আসে। তবে বৃটিশ আমলে উপরিউক্ত তিন বাহিনীর এ ডি সি-ই সদা সর্বদা রাজভবনে মজুত থাকতো। ১৯৩৭ সালের ২৭শে নভেম্বর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ যখন গভর্ণর হিসেবে রাজভবনের বিখ্যাত থ্রোনরুমে শপথ নিলেন তখন দেখা গেলো খোলা তলোয়ার নিয়ে জাঁকজমক পোষাকে আগে আগে মার্চ করে আসছে নেভীর এ ডি সি তারপর লর্ড ব্রাবোর্ণের খানিক দূরে ষ্ট্রোল ধরে মার্চ করে আসছে পদাতিক ও বিমান বাহিনীর দুই এ ডি সি। সে এক দেখার মত দৃশ্য।

কলকাতা রাজভবনের সর্বোচ্চ কর্মচারী রাজ্যপালের সেক্রেটারী বা প্রাইভেট সেক্রেটারীর যতটা না ক্ষমতা বা দাপট সমস্ত রাজভবনে তার চেয়েও শতগুণ দাপট এই সব মিলিটারী এ ডি সি-দের। এরা যেন রাজ্যপালের অতি কাছের সন্তান আর রাজভবনের অন্যান্য কর্মচারীরা যেন রাজভবনের সব রবাহুত বা স্টেপ সন্। এঁদের ভাব ভঙ্গি বা অভিব্যক্তি এমনই।

এই সব এ ডি সি-রা সংখ্যায় দু'জন বা কখনও কখনও তিনজন করে রাজ্যপালের দপ্তরে থাকেন। এরা সব মিলিটারী পারশোনেল। রাজভবনে চাকরীতে আসেন দু'তিন বছরের মধ্যে খোদ ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বা অন্যান্য মিলিটারী দপ্তর থেকে। এই সব এ ডি সি দের মধ্যে আবার একজন থাকেন ল্যাণ্ড বা পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্ক-এর বা করপোরাল র‍্যাংকের আর অপরজন থাকেন

বৈমানিক বাহিনীর বা নেভীর বা তিনজন তিন বাহিনীর। এদের নিজের নিজের পোষাকের চিহ্নই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান করে এর নিজেদের আসল দপ্তর।

এদের মধ্যে আবার অবিবাহিত-এর সংখ্যাই বেশী হতে হবে। কারণ রাজভবনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা রাজ্যপালের সঙ্গে ওঠা বসা করতে গেলে প্রিয়তমা পত্নীকে সোহাগ করবার সময় কই। তা ছাড়া অবিবাহিত না হলে খোদ রাজভবনের তো বিবাহিতদের ফ্যামিলী রাখা চলে না। আফটার অল তারা তো মাইনে করা নোকর। রাজ্যপালের সমগোত্রীয় নয় জন প্রতিনিধি না প্রকৃত অর্থে সরকারি মাইনে করা চাকর। এরা পুজোর নৈবিদ্যের উপর যেন মণ্ডার মতো শোভা পায়। সরানোও যায় না, রাখলেও বেশী কাজের নয়।

বৃটিশ আমলে এ ডি সি মানেই অবিবাহিত মিলিটারী পারশোনেল। তবে দেশ স্বাধীন হবার পর এর কিছু ব্যতিক্রম হয়েছে। এখন পালা করে রাজ্যপালের দু'জন এ ডি সির মধ্যে একজন থাকেন ম্যারেড বা বিবাহিত আর অপরজন হন অবিবাহিত। একজনের কোয়ার্টার থাকে খাস রাজভবনের বিল্ডিং-এ আর একজনের কোয়ার্টার থাকে রাজভবনের বাইরে যেখানে অন্যান্য কর্মচারীদের কোয়ার্টার আছে। তবে রাজভবনের অন্যান্য কর্মচারীদের কোয়ার্টারের চেয়ে এদের কোয়ার্টার অনেক সুন্দর, অনেক সুসজ্জিত, অনেক সুশোভিত—free furnished। রেডিও, ফ্রিজ, মায় দামী মদের খরচও অর্ধেক।

এই সব এ ডি সি দের রাজভবনে দাপটের সঙ্গে সঙ্গে নিজের খেতে ও শুতে এক পয়সা লাগে না। (সম্প্রতি রাজ্যপাল টি এন সিং এর আমল ১৯৭৮ থেকে এ ডি সি দের খাওয়ার খরচ নিজে করতে হচ্ছে) এ'রা "রাজভবন ছাপ" দেওয়া সিগারেট পর্যন্ত বিনা পয়সায় পায়।

ইংরেজী ম্যাগাজিন বা বই পত্তরের কথা ছেড়েই দিলাম সেই বৃটিশ আমল থেকে রাজ্যপালের Breakfast, Lunch, Dinner-এরসব খাবার দাবার আগে এইসব মিলিটারী এ ডি সি পুংগবদের তা পূর্বাহ্নে টেস্ট করা বা চেখে দেখবার কর্মসূচী ঠিক করা আছে। কারণ ইংলণ্ডের রাজার সেফটি তো নির্ভর করছে তাঁর প্রতিভূ রাজ্যপালের সেফটির উপর। তার জন্য খাবার বাবদ যত টাকার খরচ হোক না কেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ও প্রথা প্রায় চালুই নেই বলা যায়।

এই সব এ ডি সি দের আবার রাজ্যপালের অফিস ঘর যেটাকে নাকি স্টাডি বলে তার পাশে নিজের ছোট্ট অফিস ঘর থাকে। রাজ্যপালের অতিথি অভ্যাগতরা যাদের লাট ভবনের বেয়ারা বাবুর্চি'রা সাক্ষাত আদমী বা মেহেমান বলে তাদের বসবার সুসজ্জিত ঘর এই এ ডি সি অফিসের সংলগ্ন। এর সঙ্গে স্মোকিং রুম আছে, সিটিং রুম আছে,' রিলাক্সইন সোফা, ডিভান, ইজিচেয়ার পশমের সুন্দর কার্পেট ইত্যাদি মনভোলানো সব জিনিস আছে। এ ডি সি দের অবসর সময়ে পড়বার জন্য সুন্দর সুন্দর ইংরেজী ক্রাইম ড্রামা, ইংরেজী বিভিন্ন ম্যাগাজিন, নানা জাতের নানা ছবির বই।

যে সব কথা রাজভবনের নামী অফিসাররা রাজ্যপালকে সব সময়ে জানাতে সাহস করে না এই সব এ-ডি-সিরা তা সহজে সুযোগ মত রাজ্যপালের মর্জি বুঝে তাঁকে জানায়। এতে আর যা কিছুই হোক না হোক একটা চাপা ধারণা রাজভবনের কর্মচারীদের মধ্যে গেঁথে আছে যে,এই সব তথাকথিত এ-ডি-সিদের ক্ষমতা রাজভবনে অপরিসীম।

তাই রাজভবনে প্রায়ই দেখা যায় যে নিমন্ত্রণে রাজভবনের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও কোথাও কিছু তদারকি বা উমেদারির জন্য এইসব এ-ডি-সিদের কাছে একটি পারশোনাল সার্টিফিকেটের জন্য কাঙালীপনা করছে। আর এই সব এডিসিরা এ রাজভবনের Aid-in-camp মার্কা নিজেদের সরকারি প্যাডে অশুদ্ধ মিলিটারী ইংরেজিতে পাতার পর পাতা সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীন আমলে তাতে যে কারও উপকার হচ্ছে বলে আমি জানি না। তবে বৃটিশ আমলে হয়তো বা কিছু হোতো। তবে এই বাজারে সিমেন্টের পারমিট জন কয়েক যে পেয়েছে এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজভবনে এই সব এ-ডি-সিদের দেখলে আমার মনে হয় সেই পুরাকালের রাজা মহারাজাদের বা নব নব বাদশাদের যে মাইনে করা নকীব থাকতো সেই রকম।

রাজা বাদশার দরবারে আসবার আগে নকীবরা হাঁক পাড়তো রাজা-বাদশাদের গুণপণার ফিরিস্তি দিয়ে বা তাদের স্তুতি গেয়ে।—'হুকুম হুকামত শাহানশা বলি বাহাদুর নবাব জং সাহেব উলমুলুক হাজির' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখনও মাঝে মাঝে রাজভবনে রাজ্যপাল কোনো অনুষ্ঠানে হাজির হবার পূর্বে এ ডি সি চেঁচিয়ে ওঠেন—Your Excellency, Miss Padmaja Naidu Governor of West Bengal is Coming এই কথা শোনার জন্য প্রায়শঃ দেরীতে আসা আমাদের স্বাধীন রাজ্যপালদের আগমণ অপেক্ষায় নিরন্তর ধৈর্য্যরত শ্রোতারা অধীর হয়ে ওঠেন।

রাজ্যপালের এ ডি সিদের এই নকীবী উক্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হয়ে ওঠেন। এইটাই রীতি। ইংরেজ আমলের গোড়াপত্তন থেকে এখনও। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে, চলছে, চলবে।—শাশ্বত ভারতের নাতির সামনে দাদুর সাপ খেলানোর সুরে রামায়ণ পড়ার মতো। অর্থাৎ লেখক ওয়াজেদ আলীর সেই পুরাতন ভারতবর্ষ।

রাজভবনে বিদমান এই সব এ ডি সিদের আর একটি অবশ্য কর্তব্য এই যে, যেখানে রাজ্যপাল স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেন না, সেখানে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত দূত হিসেবে একজন এ ডি সি উপস্থিত হন। ভি. আই. পি. দের সঙ্গে রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা চালানোও এ ডি সিদের অপর একটি অলিখিত কর্তব্য।

রাজভবনে এইসব এ ডি সিদের বেলেল্লাপনা বা খামখেয়ালীরও ভূরি ভূরি নজির পরাধীন বৃটিশ আমল থেকে আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেও চলে আসছে।

শোনা যায় বৃটিশ লাট জন হার্বার্টের স্ত্রীর সঙ্গে তৎকালিন কোনো এক এ ডি সির এমন প্রেম ভালবাসা প্রগাঢ় হয়ে যায় যে স্বয়ং হার্বার্টই শেষ পর্যন্ত সেই এ ডি সিকে রাজভবন থেকে বিতারিত করতে বাধ্য হন। লর্ড লিটনের দুই সুন্দরী কন্যার বিবাহ তো প্রায় এ ডি সিদের সঙ্গেই হবার প্রায় পাকাপাকি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। এ ছাড়া স্বাধীন ভারতের রাজ্যপাল ডঃ কৈলাস নাথ কাটজুর কন্যার সঙ্গে তাঁর এ ডি সি মিঃ মুখার্জীর প্রেম ভালবাসা হয়ে বিবাহ, রাজাগোপালাচারীর এ ডি সি মিঃ হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিখ্যাত অভিনেত্রী কানন দেবীর বিবাহ ইত্যাদি এই কলকাতার রাজভবনেই। বহু এ ডি সির প্রেম ভালবাসার গুটি কয়েক উজ্জ্বলতম নিদর্শন দিলাম।

এ ছাড়া বান্ধবীরূপিনী গুপ্তচরমনা দু-চারজন সুন্দরী মহিলার অলিখিত ইতিহাসও হয়তো সাম্প্রতিকালের রাজভবনের পুলিশ ডায়েরীতে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে—এটাও এ ডি সি দের কীর্তি। সত্যিই চন্ডীগড়ের সামরিক তাৎপর্যের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ বা আলেখ্য আমাদের দেশের এইসব আপনভোলা মিলিটারী পারশোনেলের কাছ থেকেই তাদের কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা তো এই সেদিনের সংবাদপত্রের শিরোনামার ইতিহাস।

আমি আমার রাজভবনের জীবনে যতগুলি এ ডি সিদের দেখছি, তা প্রায় গোটা পঞ্চাশ জন হবে, তার মধ্যে হাতের কোড়ে আঙ্গুলে গোনা যায় জন কয়েক মাত্র সুসভ্য ভদ্র শান্তশীল এ ডি সি কে।

শোনা যায় নাকি পরিবেশই মানুষের মনুষত্বের বিকাশকে সৃষ্টি করে। আর জন্মগত রক্ত তাকে দেয় উদ্দীপনা ও অনুশীলনের ক্ষমতা। তাই পুলিশের বড়-কর্তা হয়ে যে সাহিত্যের অধ্যাপক লোভনীয় আই পি এস সার্ভিসে এ ঢোকেন তিনি কালক্রমে আচার আচরণে পুলিশই হয়ে যান। মেজাজ তার তখন সদা সর্বদাই সপ্তমে চড়ে থাকে। নিজের স্ত্রীকেও সন্দেহ বা অপমান করতে তখন তার আর বাঁধে না।

তাই দেখি রাজ্যপালের এ ডি সি হয়ে যাঁরা রাজভবনে ঠাঁই পান প্রায় অলিখিত তিন বছরের জন্য তাঁরা সবাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সমাজের অতি উচ্চবংশীয় পদমর্যাদার।

এদের কেউ হয়তো এসেছেন মিলিটারী থেকে যেহেতু তাঁর বাবা উত্তর প্রদেশের মহা গণ্যমান্য ব্যক্তি, কেউ হয়তো এসেছেন মহীশূর থেকে সেখানে তার বাবা বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার কেউ বা হয়তো এসেছেন এই পশ্চিমবাংলা থেকেই যার বাবা All India Bata Company এর চার আনার অংশীদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এ হেন বংশ মর্যাদার পুত্রদের এমনতরো ঘৃণ্য আচার আচরণ, রুচিশীলতার এমন জঘন্য অভিব্যক্তি দেখেছি তা সত্যই বেদনাদায়ক, অসম্মানকর ও পর্বত প্রমাণ লজ্জাদায়ক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাদের সৃষ্ট বহু ঘটনার মধ্যে আজও একটি ঘটনা আমার স্মৃতিপটে এখনও অত্যুজ্জ্বল ভাবে আঁকা আছে। বেদনাদায়ক সে ঘটনাটির উল্লেখের প্রয়োজন হোতো না যদি না আমি আমার বেদনাহত চিত্তের বহিপ্রকাশ এখানে কখনো না করতাম।

সালটির কথা ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে নাই বা বললাম, তবে দিনটি ছিল ঠিক ২৫শে বৈশাখের রবীন্দ্র জয়ন্তীর কয়েক দিন আগে। যদিও সাধারণত রাজভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয় না তবু কবিগুরুর ছবিটি রাজভবনের গুদাম ঘর থেকে রাজ্যপালের Study তে টাঙ্গানোর আদেশ দিলেন এ ডি সি কে তদানীন্তন জনৈক অবাঙালী গভর্ণর।

এখানে বলা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের কোনো দোষ ছিল না। তবু এ ডি সি সেন যে ভাবে রাজভবনের গুদাম ঘরে এসে জুতোওয়ালা পায়ের ডগা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিটি লক্ষ্য করে রাজ্যপালের Study তে সেটা টাঙ্গানোর নির্দেশ দিয়ে গেলেন তা যেমন অপমানজনক তেমনি বঙ্গদুলালের পর্বত অপৌরুষের নিবীর্য সাক্ষী।

যে কবিগুরুকে পৃথিবী শুদ্ধ লোক মাথায় করে রেখেছে তাকেই অশ্রদ্ধা জানালো সামান্য একজন কর্ণেল এ ডি সি, সেও আবার এই বঙ্গেরই সন্তান। যদিও তদানীন্তন রাজ্যপাল এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না। তাঁর এসব জানার কথাও নয়।

শেষ করি রাজভবনের জনৈক সুসভ্য এ ডি সির এক মর্মস্পর্শী ঘটনার ইতিবৃত্তের উপসংহার দিয়ে। তখন ১৯৫৪ সাল। বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্র-কুমার মুখার্জী। তাঁর এ ডি সি এস্ ব্যানার্জী।—বৃটিশ আমলের জবরদস্ত আই পি এস অফিসার বিখ্যাত আর ব্যানার্জীর ছেলে। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার যাচ্ছেন বহরমপুর শহরে কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল পরিদর্শনের জন্য। এ ছাড়া আরও অনেক সেরিমোনিয়াল—ফাংশন আছে সেখানে।

বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের প্রাঙ্গণ ঘিরে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। এদিকে ওদিকে সাদা পোষাকের সি আই-ডির লোকেরা তড়িঘড়ি ঘোরাফেরা করছে। রাজ্যপাল ও তাঁর দলবল ডিষ্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট সমভিব্যহারে জেলার সারকিট হাউস থেকে মোটরের মিছিল করে কলেজিয়েট স্কুলের গেটের কাছে নামলেন। সামনে রাজ্যপাল পরেই একটু দূরে এ ডি সি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী। স্কুলের হেডমাষ্টার মশায় ও অন্যান্য শিক্ষকেরা রাজ্যপালকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন করজোড়ে।

পাশে দাঁড়ানো স্কুলের মালি বাবুজানের ট্রে থেকে রক্ত গোলাপের একটি স্তবক রাজ্যপালের কোটের বাটন হোলে হেডমাষ্টার মশায় পরিয়ে দিয়ে জোড় হাত করে রাজ্যপালকে নমস্কার করলেন। আর একটি গোলাপের স্তবক যেমনি তিনি এ ডি সি ব্যানার্জীকে দিতে গেছেন এ ডি সি ব্যানার্জী বলে উঠলেন আরে আরে,

বাবুজান না। আরে তুমি কেমন আছ? এগিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

এ ডি সি ব্যানার্জী হেডমাষ্টার মশায়কে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন স্যার আপনি নতুন লোক আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। আর এই বাবুজান আমার সহপাঠি ছিল। ট্রে টা একটু স্যার ওর হাত থেকে নিন ও ওর পুরানো বন্ধু আমাকে গোলাপ দিয়ে ভালবাসা জানাক। আমরা যে ক্লাসে পাশাপাশি বসতাম।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার একটু এগিয়ে গিয়ে এই ঘটনায় ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। কোন শিক্ষক এই ফাঁকে তাঁকে সব ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। আর এদিকে মালী বাবুজান রক্ত গোলাপ হাতে নিয়ে পুরানো বন্ধুর পায়ের উপর লুটিয়ে কাঁদছে। সে যেন আনন্দের স্বর্গীয় অশ্রুধারা।

রাজ্যপাল চির শিক্ষক হরেন্দ্রকুমার কেন জানিনা এ দৃশ্য দেখে একবার চোখের চশমা জোড়া নিজের গরম শালে মুছে নিয়ে দ্রুত পায়ে সামনে হাঁটতে লাগলেন।

কেউ তারপর বলতেই পারলো না রাজ্যপালের চোখ জলে ভিজে গিয়েছিল কি না? বা চোখের উদগত অশ্রু তিনি নীরবে লুকিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর পুরু চশমার আড়ালে।

রাজভবনের ঘড়িবাবু ও চাবিবাবু

রাজভবনের প্রায় উননব্বইটি বিভিন্ন কামরার চাবি গচ্ছিত রাখা ও বিভিন্ন ঘরের ঘড়িতে ঠিক্ ঠিক্ সময়ে দম দেওয়া সে এক বিচিত্র কাজ।

রাজভবনের পুরাতন কর্মচারী মিঃ খামারু এইসব কাজ করেন। অতি পাকা পোক্ত লোক। কর্মঠ ও কায়দাকেতা দুরস্থ যাকে এক কথায় পাকা 'নেটিভ সাহেব' বলা চলে। ইংরেজী অনর্গল বলতে পারেন তবু তিনি নন ম্যাট্রিক—প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত বিদ্যে—তিনি নিজে একথা সতত বলে থাকেন আমাদের। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু কোন ইংরেজ লাট সাহেব কবে কেমন করে হেসেছিল, কেমন করে কেঁদেছিল, কী কী কথা বলেছিল তা তাঁর নখাগ্রে। কোন লাট কী ফুল ভালবাসতেন কোন বৃটিশ লাট প্রজাপতি নিয়ে কালচার করতো তাও তাঁর মুখস্থ।

কথায় অকথায় তিনি গর্ব করে বলতেন, 'আমি হচ্ছি মিঃ জি. খামারু'। এই পশ্চিমবাংলার বাঙালীর মধ্যে বিচিত্র আমার পদবী। আর সেনটারে আছেন মিঃ নেহেরু। এরাই তো দেশকে চালাচ্ছেন। এই কথা বলার ভেতর তাঁর বেশ দাম্ভিকতা থাকতো। তবে ইনি যে রাজভবনের জীবনে অত্যন্ত কর্মঠ নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তা রাজভবনের পুরাতন কর্মচারী প্রত্যেকেই স্বীকার করবে।

মিঃ খামারুর অফিসে বসবার ঘরে কাঠের এক বিরাট আলমারি জুড়ে রাজভবনের চাবির থোকা বাঁধা। এটা সেই বৃটিশ আমলের সিসটেম।

কাঠের মস্ত কাচ-লাগানো আলমারিতে প্রতি গোছা চাবির নীচে রং দিয়ে রাজভবনের বিভিন্ন কামরার নামও নম্বর বসানো। বলাতো যায় না কখন কোন চাবি হারিয়ে যায়। ডুপ্লিকেট চাবির তখনই প্রয়োজন। চতুর সুশৃংখল বৃটিশ জাতির তাই এই কি বোর্ডের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা।

রাজভবনে যতগুলি ঘর ততগুলি না হলেও তার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ঘড়ির সংখ্যা।

কোনটা টেবিল ক্লক, কোনটা দেয়াল ঘড়ি, কোনটা গ্রান্ড মাষ্টার. কোনটা ইলেকট্রনিক্যাল ঘড়ি ইত্যাদি। তাদের ঘন্টার আওয়াজ ও বিচিত্র। বিচিত্র তাদের এক এক রকম অংগসৌষ্ঠব। পুরাকালের সঙ্গে সদ্য আধুনিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। কোনোটা বার্ণিশ করা, কোনোটা স্প্রে পেণ্টিং করা, কোনোটা আবার রং চটা—রাজভবনের একেবারে অযোগ্য। সে এক এলাহি ব্যাপার।

এ ছাড়া রাজভবনের মেন বিল্ডিং এর বাইরে ওয়েলসলী প্লেসের গ্যারাজে, ষ্টোরে, ইলেকট্রিক অফিসে, রাজভবন এষ্টেটের অফিসে বিভিন্ন আকারের নানা

রকম ঘড়ি আছে। কোনটাতে প্রত্যহ দম দিতে হয়। কোনোটিতে আবার সপ্তাহে একবার। কোনোটা খালি ব্যাটারীতেই চলে।

পুরাকালের কলকাতার জমিদার বাড়ীর মতো রাজভবনেও একজন ঘড়িবাবু আছেন। তিনি রাজভবনের বিভিন্ন ঘড়িতে দম দেন। আলাদা মাসিক এ্যালাউন্স পান।

এই ঘড়ি বাবু মিঃ খামারুর আবার রাজভবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প বলার সখ আছে। কখন কোন বিদেশী নামকরা অতিথিদের সঙ্গে রাজভবনের কোন স্যুটে কেমন করে দেখা হলো ঘড়ির দম দিতে দিয়ে কখন কবে তিনি রাশিয়ান ভি-আই-পি অতিথিদের কথা বুঝতে পারেন নি, কখন ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ তার গুড মর্ণিং এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিল সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস তার নখাগ্রে।

এই ঘড়িবাবুর সবচেয়ে কষ্টের কাজ স্বয়ং রাজ্যপালের শোবার ঘর বা 'বেডরুমের' ঘড়িতে দম দেওয়া। কখন রাজ্যপাল কী মুডে থাকবেন তার সঠিক ইতিহাস পূর্বাহ্নে লাটের খাস বেয়ারার কাছে না জেনে নিলে ঘড়িবাবুর কপালে লাটসাহেবি ধমক জুটবে ঘড়ির দম দিতে গিয়ে।

বড়লাটের রুমে বিনা অনুমতিতে কারোরই ঢুকবার হুকুম নেই। আর লাটের বেড রুমে ঢোকা তো প্রায় অমার্জনীয় অপরাধ। এই নিয়ম সেই বৃটিশ আমল থেকে।

এতো কড়াকড়ি কারণ লাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য। তবু লাটসাহেব যখন সকালে 'গোশলে বা স্নান পর্ব' সারতে যান তখনই সুযোগ বুঝে ঘড়িবাবু লাটের খাস বেয়ারার হুকুম নিয়ে লাটের বেড রুমের ঘড়ির চাবি দিয়ে আসেন। এটা প্রায় তার ফোর ফর্টি রেসের মতো ছুটে তাড়াহুড়ো সারতে হয়। তবু ক্যালকুলেশন মাঝে মাঝে একটু ওদিক হয়ে গেলে ঘড়িবাবুকে প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়তে হয় ও কপালে লাটের ধমক জোটে।

এইতো সেদিনের ঘটনা। পদ্মজার আমল। উনিশশো ষাট সাল। পদ্মজা সকালে গোশল করতে তাঁর স্যুইটের এ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকেছেন। ঘড়িবাবু মিঃ খামারু যথারীতি টুক করে লাটের ঘড়ির দম দিতে তাঁর বেড রুমে ঢুকে ঘড়িতে দম দিচ্ছেন। হঠাৎ শ্রীমতী পদ্মজা কেন জানি কী কারণে ভিজে চুলে ঘরে ফিরে এসেছেন।

ঘড়িবাবু তাড়াহুড়ো হুট করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু পদ্মজা তাঁর বিরাট আয়নাতে কার যেন ছায়া দেখতে পেয়েছেন। হৈ হৈ ব্যাপার।

রাজভবন তোলপাড়। রাজ্যপালের খাস বেয়ারা হাকিম মহম্মদ কিছুতেই মানতে চাইছে না যে তার চোখের সামনে দিয়ে কেউ লাটের ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু সে মনে প্রাণে জানে যে সে মিথ্যে কথা বলছে। তখন সে অন্য করিডরে অন্য বেয়ারার সঙ্গে দেশওয়ালী কথাবার্তা বলছিল।

শ্রীমতী পদ্মজা কিন্তু তার কথা মানবে না। তিনি যে স্বচক্ষে দেখেছেন আয়নাতে ছায়া পড়েছে কোন এক অজানা লোকের।

খোঁজ। খোঁজ। লাটের ভীষণ গোসা। লাটবাড়ী নিঃশ্চুপ। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে মিঃ খামারু ভয়ে ভয়ে লাটের সেক্রেটারী মিঃ পিনাকীরঞ্জন সিনহার কাছে স্বীকার করলেন তার অপরাধ।

তাও প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে—I am guilty, sir.

লাটের সেক্রেটারী শ্রীমতী পদ্মজাকে সব ব্যাপার খুলে বললেন। শ্রীমতী পদ্মজা এই বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে খুব ভালবাসতেন। তিনি সব কথা শুনে একটু হাসলেন। সেখানেই সেই পর্ব শেষ।

তবু তো মিঃ খামারু হেঁজিপেঁজি নন। লাটবাড়ীর ঘড়িবাবু' এই যা সান্ত্বনা।

সেই কবে কোন বৃটিশ লাটের আমল থেকে রাজভবনের এই একটি কাজই তার সবিশেষ মন-পসন্দ। সেই ট্রাডিশন এখনও চলেছে।

লাটবাড়ীর একশোটি ঘড়ি ঘুরছে। ঘুরছে। ঘুরবে। ঘুরবে। ঘুরবে। ঘুরবে।

একটি বিবাহ বাসর ও কলকাতার রাজভবন

মানুষের মনে অখণ্ড শান্তি নাকি থাকে।

শাস্ত্রে বলে মুনি যোগীদের মন নাকি অখণ্ড শান্তিতে প্রশান্ত। কিন্তু তাও দেখা যায় সাধুসন্তরা, মুনি-ঋষিরা মাঝে মাঝে অপার্থিব শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁদের মনের যে অশান্তি তা কেবল অপার্থিব শান্তির জন্য ব্যাকুলতা। হয়তো বা পার্থিব অশান্তি তাদের থাকে না। কিন্তু সাধারণ লোক, দীন দরিদ্র লোক, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ থেকে অতি বিত্তশালী ধনী রাজা মহারাজা মায় দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা রাজ্যপালদের মনেও কখন সখন মাঝে পার্থিব অশান্তিতে রাত্রে ঘুম, দিনে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে।

এমনি অশান্তিতে রাজ্যপাল ডায়াস শ্রীমতী ডায়াস দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। কারণ তাঁদের অতি আদরের চারটি কন্যার মধ্যে সেজো কন্যা শ্রীমতী লায়লার এখনও বিয়ে হয়নি।

শ্রীমতী লায়লা ডায়াস বিদুষী, চিত্রশিল্পী, স্মার্ট, প্যারিসে অঙ্কন শিল্প অধ্যায়নী কিন্তু কেন যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তার মনের প্রবল অরুচি।

রাজ্যপাল ডায়াস ও শ্রীমতী ডায়াসের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। ছিল চারটি কন্যা। প্রথম কন্যার বিয়ে হয়েছে মিঃ সিনাই এর সঙ্গে দ্বিতীয় কন্যার মিঃ অরোরার সঙ্গে ও সর্ব কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয়েছে ডাঃ রাও-এর সঙ্গে। সে বহু-পূর্বে। অর্থাৎ মিঃ ডায়াস রাজ্যপাল হবার পূর্বে। কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যার উপরের কন্যা শ্রীমতী লায়লার এখনও বিয়ে হয়নি।

শ্রীমতী লায়লা থাকে প্যারিসে। বেশ সুন্দর ছবি আঁকে। মাঝে মধ্যে কলকাতার রাজভবনে আসে। রাজভবনের বিস্তৃত বাগানে কিসের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা রাজভবনের গাড়ী নিয়ে ইডেন গার্ডেনে চলে যায় রাজভবনের কোন গার্ডেন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে।—ভেঙ্গে নিয়ে আসে গাড়ী ভর্তি করে গাছ গাছালির শুকনো মরা ডাল কাটুম কুটুম বানাবার জন্য। মা বাবার সঙ্গে ছুটিতে ২।১০ দিন কাটিয়ে আবার প্যারিসে চলে যায় নিজের আস্তানায়।

রাজভবনে লায়লা এলেই সকলের মুখেই লায়লার কথা শোনা যায়। সুন্দরী মেয়ে, ছবি আঁকিয়ে, কিন্তু বিয়ে হয়নি। তাও আবার বাবা আই. সি. এস. পদ্মভূষণ মিঃ ডায়াস। বর্তমানে বাংলার রাজ্যপাল।

কর্মচারীরা বিশ্বাসই করতে চায় না কেন এ মেয়ের বিয়ে হলো না। রাজ্যপাল ও মিসেস ডায়াসের এর জন্য তো মনে অসুখের অশান্তিতে ভরা।…

আজ আটই জুন উনিশশো চুয়াত্তর সাল। পশ্চিমবাংলার বসন্তকাল যাই যাই করে সবে চলে গিয়েছে কলকাতার রাজভবনের গালিচা ঘেরা সুন্দর প্রস্ফুটিত

ফুলের প্রাঙ্গণ থেকে। মাসটা সবে বৈশাখ। তবু রাজভবনের ছায়া সুশীতল 'গাছের কুঞ্জে কুঞ্জে ভোর না হতেই কোকিল ডেকে ওঠে, ফিঙে শালিক, টিয়াপাখীদের কুজন শুনে এখনও রাজভবনের চারিপাশের বাসিন্দাদের ঘুম ও সন্ধ্যার বিশ্রাম আমেজে ভরে ওঠে। কলকাতা মহানগরীর লোহা দিয়ে বাঁধানো ইট কাঠের রাজত্বে আর কলকাতার কোথাও বোধ হয় রাজভবনের মতো সজ্জিত শ্যামলিমা ঘেরা সবুজের সমারোহ নেই। তাই রাজভবনের স্থায়ী সরকারি কর্মচারী, এই মন্ত্রী-নিবাসের মন্ত্রীদের, ও স্বয়ং রাজ্যপালের তাই কলকাতা রাজভবনের প্রতি মমতা।

সে যাই হোক আজ ষোলই মে রাজভবনে শোনা গেলো রাজ্যপাল তনয়া অনূঢ়া মিস লায়লার অঙ্গুরী বদল হচ্ছে। ভাবী জামাতার নাম মিঃ জাহীদ আলী বেগ। জাতিতে মুসলমান। দিল্লী না বোম্বাই-এর কোথাকার বাসিন্দা। ধনীর দুলাল।

দুপুর ঠিক ১টার সময় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় ও মায়া রায় রাজভবনে এলেন এই রিং বদল অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। শোনা গেল আরও একজন পাদ্রী এসেছে রাজভবনে মিঃ বেগকে মুসলমান ধর্ম থেকে ক্রীশ্চান ধর্মে রূপান্তরিত করবার জন্য। কারণ ডায়াস কন্যা ক্রীশ্চান।

যথারীতি সব অনুষ্ঠান শেষ হলো। পাত্র ক্রীশ্চান হলো, এবং প্রাক বিবাহের রিংও বদল হলো।

রাজভবনের অনেকের মনে বিস্ময় জাগলো যে সাধারণতঃ সব সময়েই দেখা যায় যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীকে বিয়ের বাঁধনে বাঁধতে গেলে অ-মুসলমান পাত্র বা পাত্রীকে মুসলমান হতে হয়। তবে মিস লায়লার ব্যাপারে অন্য রকমের হলো কেন? হতো বা তার উত্তর মিস লায়লা রাজ্যপালের কন্যা। হেঁজিপেঁজী নয়। তাকে পেতে গেলে নিশ্চয়ই কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সীতাকে পেতে গেলে রামকে ধনুর্ভঙ্গ পণ করতে হয়েছে। দ্রৌপদীকে মিলেছে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরিশ্রমের পুরস্কারের বদলে। শ্রীমতী লায়লার বেলায় তো শুধু সামান্য ধর্মান্তঃকরণ।

ষোলই মের পর থেকে লায়লার বিয়ের জোগাড়ের জন্য রাজভবনে হৈচৈ পড়ে গেলো। কোথায় কোন ঘরে খাওয়া দাওয়া হবে, কোথায় বর বসবে, কোথায় কোন সুইটে বরের আত্মীয় স্বজন ও রাজ্যপালের আত্মীয়রা এসে থাকবেন, কোন গাড়ীতে বর চার্চে রাজভবন থেকে বিয়ে করতে যাবে, সদ্য কেনা রাজভবনের ডীপ ফ্রিজে কী কী জিনিস রাখা হবে, দার্জিলিং রাজভবন থেকে বিয়ের দিন এরোপ্লেনে সদ্য কী কী ফুল আসবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শোনা গেল আটই জুন শনিবার বেলা ১১-টায় মিডিলটন রোর সেণ্ট টমাস চার্চে শ্রীমতী লায়লার সঙ্গে জাহীদ আলি বেগের বিবাহ হবে।

বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো কলকাতার রাজভবনে ততই সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। তার কারণ প্রায় দুশো বছরের পুরানো কলকাতার এই রাজভবনে কেউ কোন দিন কোনো রাজ্যপাল কন্যার বিবাহের আসর দেখেনি, বড়

জোর দেখেছে সাহেবদের আমলের বড়দিন বা অন্যান্য সময়ের বল নাচের বেলেল্লাপনা, ড্রিংক। কিন্তু এ যে একেবারে ভারতীয় বিবাহ। যদিও রাজ্যপাল খ্রীশ্চান বলে সব শুদ্ধ আধ ঘণ্টায় এই অপূর্ব বিয়ের পর্বটা মিডলটন স্ট্রীটের চার্চে সারা হলো। কিন্তু বিয়ের পরের পর্ব সে যে এক সপ্তাহের দীর্ঘ ইতিহাস।

এই বিয়ের পরের কথা পরে বলছি। প্রাক্ বিবাহের কয়েকটি মজাদার ঘটনার কথা আগে বলি।

শ্রীমতী লায়লার বিয়ে চার্চে বেনারসী শাড়ী পরেই হয়েছে। কিন্তু জাত শিল্পী লায়লা একে শিল্পী তারপর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে থাকতো সুতরাং ভারতীয় নব বধূরা বিয়ের পর বেনারসী শাড়ী পরে কেমন করে হাঁটা চলা করে তা তার জানা নেই। তাই বিয়ের দিনকতক পূর্ব থেকেই তার সহোদরা বড় বোন মিসেস সিনাই রাজভবনের তিনতলায় বল রুমে লায়লাকে লাল বেনারসী পরিয়ে সকাল সন্ধ্যে ট্রেনিং দিচ্ছিল কেমন করে ভারতীয় নব বধূরা শাড়ী পরে হাঁটবে, আত্মীয় স্বজনের সামনে সম্ভ্রমভরে এগিয়ে যাবে, কেমন করে মাথায় ঘোমটা দেবে ইত্যাদি। লায়লাও সলজ্জভাবে বড় বোনের তালিম নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলছিল।

অনূঢ়া বয়স্কা মেয়ের বিবাহ একটা পরম উপভোগ্য জিনিস। সলজ্জা ভাব থাকলেও সেখানে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ের আচার অনুষ্ঠান মেনে নেয়। কারণ এখন যে তার জীবন দ্বারে বসন্ত জাগ্রত—জীবনে অনেক বছর পরে নব বসন্ত এসেছে, দখিনা মলয় বাতাস নিয়ে। সেটা যেন কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠানের গাফিলতির জন্য ব্যর্থ হয়ে না যায়।

রাজভবনের ব্রাউন ড্রইং রুমের বারান্দায় বিয়ের জন্য একটি নতুন ল্যাটরিন বা বাথরুম করা হলো। সেটার খরচ ইলেকট্রিক ও স্যানিটারী নিয়ে প্রায় পনরো ষোলো হাজার টাকা পড়লো। একটা নতুন ডীপ ফ্রীজ কেনা হলো তার খরচ প্রায় চার হাজার টাকা। দার্জিলিং থেকে চার জন মালী এলো রাজভবন ও বিয়ের চার্চ সাজাতে তাও বেশ কিছু টাকা খরচ। দার্জিলিং মেল সাম্প্রতিক রেল স্ট্রাইকের পর তখনও বন্ধ, সুতরাং ঐ চারজন মালীকে উত্তরবঙ্গের স্টেটবাসে দার্জিলিং রাজভবন থেকে ফ্ল্যাওয়ার ভাস, কার্পেট, ককারিজ ইত্যাদি আনতে হয়েছে।

বিয়ের পূর্ব দিন বিকেলে এক বড় টুকরী সদ্য ফোটা ফুল নিয়ে এরোপ্লেনে চড়ে দার্জিলিং রাজভবনের দুই মালী—হেম নারায়ণ প্রধান ও সিং বাহাদুর লোমজান—কলকাতার রাজভবনে এসে পৌছাল। যদিও এখানে বলে রাখা দরকার যে প্লেনে বাগডোগরা থেকে এই দুজন মালী ও ফুলের ঝুড়ি রাজ্যপাল কন্যা লায়লার বিয়েতে এলো সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্লেনে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ও ঐ প্লেনে ছিলেন।

ফুলে ফুলে কলকাতার রাজভবন ফুল সাজে সজ্জিতা। ফুলের এ রকম

সমারোহ সত্যিই হৃদয় মনোহারী। সাহিত্য করতে গেলে বলতে হয় বিয়ের কদিন রাজভবনে ফুলের হিল্লোল বয়ে গেছে। সে যেন রং বে-রং-এ ফুলের নিস্তব্ধ মহা সমুদ্র।

এর মধ্যে কিছু ফুল বাজার থেকে কেনা হয়েছে, কিছু ফুল নানা জনে উপহার দিয়েছে, কিছু ফুল এসেছে লাটসাহেবের ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ বাগান থেকে আর কিছু ফুল দার্জিলিং ও কলকাতার বাগানের। জানিনা এইসব ফুল কিনতে বা দার্জিলিং থেকে যে সব মালীরা এসেছিল তাদের যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি বাবদ যে টাকা ব্যয় হলো সেটা রাজ্যপাল নিজেই দিলেন, না সেই বৃটিশ আমলের চিরাচরিত গৎ মাফিক লেখা হলো তাদের টি. এ বিলে—Expenditure incurred in the interest of Gcvt.. Service.

বিয়ের দিনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিয়ের নেমন্তন্ন এ ডাকা হলো ৫৬৫ জনকে। আর দুপুরের খানায় ৫০ জনকে ও রাত্রের খানায় নিজের পরিজনদের ২০০জনকে।

রাজভবনে রাজ্যপালের নিজস্ব খাস কর্মচারীর সংখ্যা ব্যারাকপুর দার্জিলিং ও কলকাতার রাজভবন মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জন। এর মধ্যে রাজপাল মিঃ ডায়াস নিয়ম করে দিলেন যাঁরা গেজেটেড তাদের কার্ড দিয়ে লায়লার বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হবে। বাদ বাকী অন্য রাজভবনের কর্মচারীদের লিষ্ট করে হাতে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হবে।

এতে অনেকে দারুণ মনঃক্ষুন্ন হলো। কারণ রাজ্যপালের মেয়ের বিয়ে, প্রায় প্রত্যেক কর্মচারীকেই প্রত্যক্ষ বা অ-প্রত্যক্ষভাবে কিছু না কিছু কাজ এই বিয়ের ব্যাপারে করতে হয়েছে।

কেউ হয়তো তাবৎ নিমন্ত্রণের কার্ড লিখেছে, কেউ হয়তো বিয়ের সমস্ত বরযাত্রীদের হাওড়া ষ্টেশন বা দমদম এরোড্রাম থেকে গাড়ী করে পথ দেখিয়ে রাজভবনে নিয়ে এসেছে, কেউ হয়তো রাজভবনের বাগানে চারিদিকের ফুল গাছের আলবালে গত একমাস ধরে সযত্নে জল সিঞ্চন করেছে যাতে শ্রীমতী লায়লার বিয়ের দিনে সমস্ত ফুলগাছগুলি পত্রপুষ্পে সতেজ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, কেউ হয়তো রাজভবনের কামরায় সুদৃশ্য বিছানা সাজিয়েছে নূতন অভ্যাগতদের আরামে থাকবার জন্য। ইত্যাদি।

কিন্তু সকলেই আশা করেছে রাজ্যপালের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গেজেটেড নন্ গেজেটেডদের যেন পার্থক্য না থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হবার নয়। হলোও না। তবে কেন আমরা উষ্মা প্রকাশ করি ইউরোপে কালারবার আছে বলে? অসভ্য। ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজের ছেলে বিয়ে করা বউকে ভালবাসলে সে হল ভেড়ুয়া আর নিজের জামাই তার বধূকে ভালবাসলে সে হয় আদর্শবান জামাই।

এমনকি রাজ্যপাল ডায়াস মেয়ের বিয়ের চাপে স্রেফ্ ভুলেই গেলেন যে সাধারণ

ভাবে একটি নিমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত অধস্তন সকল কর্মচারীকে লায়লার বিয়ের কথা জানানো বা প্রথামত নিমন্ত্রণ করা। সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত তার কর্মচারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও বিয়ের দিন দুপুরে এক বাক্স করে মিষ্টি পেলো সঙ্গে একটা চিরকুট—তাতে লেখা From Laila and Zahid.

প্রত্যেক প্যাকেটে ছিল একটি শোন পাপড়ী, একটি মিষ্টি, দুটি লুচি ও একটু আলুর দম।

বাঙালী আমরা খুব স্পর্শকাতর জাত। তাই এই প্যাকেট নেবার কালে দেখা গেল অনেকে অভিমান ভরে প্যাকেট নিল না, কেউ বা ভদ্রতার সঙ্গে প্যাকেট হাতে নিয়ে মালী, জমাদার, পিওন ইত্যাদিকে খাবার শুদ্ধ প্যাকেট বিলিয়ে দিলো—অনিমন্ত্রিত হয়ে এই তাচ্ছিল্যের প্যাকেট আমি নেবো না—সে রাজ্যপালই হোন বা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলের বিয়েরই হোক। কিন্তু বেশীরভাগ কর্মচারীই দেখলাম সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে হাসিহাসি মুখে সন্দেশের সদ্ব্যবহার করছে।

মুখে যেন তাদের অলিখিত অভিব্যক্তি—চাকরী বড় বালাই, রাজ্যপাল আই-সি-এস ডায়াস জানতে পারলে রাজভবনের কোয়ার্টার থেকে খেদিয়ে দেবে; ছা-পোষা আমরা সরকারী চাকুরীজীবী। যদিও এর দিন পনেরো আগে আমার এক সহকর্মীর ভায়রা ভাই-এর মেয়ের বিয়েতে এই রকম এক টু ক্ষুদ্র অসামাজিকতা হয়েছিল বলে গিন্নী শুদ্ধ আমার ঐ সহকর্মীটি কেউ-ই সে বিয়েতে যান নি। তার কথায় এখানে চাকরী যে বড্ড বালাই।

শ্রীমতী লায়লার বিয়েতে রাজভবনের প্রত্যেক ঘরে গেস্টে গেস্টে ভরে গিয়েছিল। তাতে যেমন ছিল বরপক্ষের মা, বাবা ইত্যাদিরা তেমনি ছিল বোম্বে থেকে আগত রাজ্যপাল ডায়াসের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের দলের লোকরা। এত এলাহি ব্যাপার যে রাজভবনের বহু স্যুইটের মেঝেতে এমনকি স্প্রিং-এর তোষক বিছিয়ে অভ্যাগতদের শোবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

এখানে একটা কথা বলে রাখি যে প্রথমে শোনা গিয়েছিল যে লায়লার বিয়ে কলকাতার খোদ ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সিকিউরিটির খাতিরে। কেননা বোম্বে থেকে বেশ জনাকয়েক বিখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রী এই বিয়ে দেখবার জন্য হাজির হবেন। শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুর, পতৌদি, অমিতাভ বচ্চন, রাজকাপুর সস্ত্রীক ইত্যাদিরা নাকি এই বিয়েতে হাজির হচ্ছেন। কিন্তু দেশের বৃহৎ নিরাপত্তার খাতিরেই নাকি ওটা করা সম্ভব হলো না। শোনা গেলো কিছু জাঁদরেল মিলিটারী অফিসার নাকি এতে বাধ সেধেছেন—ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট উইলিয়ামই। এর মধ্যে হুল্লোড় করে বিয়ে হতে পারবে না।

এবার আটই জুন উনিশশো চুয়াত্তর খোদ রাজভবনে এই বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছু বর্ণনা করি।

লায়লার বিয়ের যে নিমন্ত্রণের কার্ড ছাপা হয়েছিল তার এক পিঠে লেখা ছিল—

Shri & Smt A. L. Dias

request the pleasure of your Company at the marriage of their daughter.

Laila

to

Zahid Ali Baig

আর অন্য পিঠে Shri & Smt M. R. A. Baig request the pleasure of your Company at the marriage of their Son :

Zahid

to

Laila Dias

নীচে লেখা at ST. Thomas church, Middleton Row on Saturday the 8th June 1974 at 11-30 A. M. and at a Rece tion at Rajbhavan Calcutta from 6 p m to 7-30 p.m.

এর সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছাপানো কাগজ একটি সবুজ রং-এর সুন্দর প্ল্যাসটিকের জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকানো—You are requested not to bring any presents. এবং Car Park Rajbhavan Calcutta 8th June 1974, Entrance South West Gate-এর তলায় লেখা Please Display this on the wind Screen.

রাজভবনের মধ্যমানের কর্মচারী হয়ে কোনো বিশেষ কারণে ভাগ্যবলে এই নিমন্ত্রণের কার্ড পেয়েছিলাম কিন্তু Car Park-এর লেখাটা দেখে বাড়ীশুদ্ধ সবাই একযোগে হো হো করে হেসে উঠেছিল—বলেছিল এখানে তোর নিজস্ব পদযুগলকেই Car-মিন করা হচ্ছে।

বিয়ে হবে লায়লার ১১-৩০ মি. সেন্ট টমাস চার্চে।

ঠিক তার ঘন্টা খানেক পূর্বেই রাজভবনের একটা সুন্দর নীল রং-এর ইমপেলা গাড়ীতে হবু বর, বরের মা, বাবা ইত্যাদিরা মিডলটন রো-এর সেন্ট টমাস চার্চে রাজভবনের দক্ষিণ গেট দিয়ে বেড়িয়ে গেলেন। আর তার ঘন্টা খানেক পরে লাল রং এর বেনারসীতে নববধূ সাজে সজ্জিত হয়ে মিস লায়লা, রাজ্যপাল ডায়াস, মিসেস ডায়াস মিঃ ও মিসেস সিনাই, অরোরা, রাও ইত্যাদি জামাইরা ও আত্মীয়রা রাজভবনের খান চারেক গাড়ীতে পাইলট ভ্যানসহ দক্ষিণ গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন পার্ক স্ট্রীটের সেন্ট টমাস চার্চে লোকে লোকারণ্য। চার্চ ফুলে ফুলে সজ্জিত। ভি-আই-পি গেস্টে ঠাসা।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় ও শ্রীমতী মায়া রায় সেখানে পূর্বাহ্নেই

উপস্থিত। রাজ্যপাল ডায়াস কন্যাসহ গাড়ী থেকে নামলেন। চার্চের পাদ্রী পূর্ব থেকেই তটস্থ ছিলেন। মিস লায়লা ও মিঃ বেগ কী যেন একটা খাতায় সই করলো। তারা উভয়েই একটু মুখ তুলে সবার দিকে সলজ্জ হাসলো। একটু মাথা নোয়ালো। বিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যেই শেষ।

গাড়ীতে চড়ে হুড়োহুড়ি করে রাজভবনে সবাই আসবার জন্য হুলুস্থুলু পড়ে গেলো। কয়েকটা গাড়ীর বড় লাইন করে পাইলট ভ্যান সহ সকলে নববধূ ও বরকে নিয়ে রাজভবনের দক্ষিণ গেট দিয়ে রাজভবনে পেঁছুলো।

সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি বিলেতী কায়দায় কক্‌টেল পার্টি আরম্ভ হলো। দামী দামী মদ বহু পূর্ব থেকেই রাজভবনের প্যানট্রির ঠাণ্ডা মেশিনে রাখা ছিল এই বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য। এ ছাড়া এই সব ব্যাপারের জন্য দুশো পঁচাত্তর লিটারের একটা নতুন ফ্রিজ কেনা হয়েছিল প্রায় হাজার পাঁচেক টাকায় যা পূর্বেই বলেছি। ককটেল পার্টি চললো প্রায় বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত।

এর পর বেলা দুটোয় রাজ্যপাল ও শ্রীমতী ডায়াস নব বরবধূ ও নিজের আত্মীয়দের নিয়ে লাঞ্চে বসলেন। প্রায় ৫০ জনের মতো সকলে মিলে। এদিকে দফায় দফায় খাবারের বাক্স রাজভবনের নন্‌ গেজেটেড কর্মচারীদের মধ্যে বিতারিত হতে লাগলো। সেও বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চললো।

আবার বিকেল ছটা থেকে ভেঁপু বাজিয়ে সারি সারি নানারকমের গাড়ী রাজভবনের বিভিন্ন গেট দিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট পথ অনুযায়ী ঢুকতে লাগলো। রাজভবনের বিশাল ব্যানকোয়েট হলে ৫৬৫ জনের রিসেপসন্‌। এলাহি ব্যাপার। থাকে থাকে নানা টেবিলে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন রকমের রান্না করা সুবাসিত মাংস, পুরী, মিষ্টি, প্যাস্ট্রি, কচৌরি, সন্দেশ ইত্যাদি। বুফে সিসটেম—যে যার মতো টেবিল থেকে প্লেটে নিয়ে খাও।

রিসেপসন আরম্ভ হলো। লায়লা ও জাহিদ নব সাজে উপস্থিত হলো। এ ডি সি কারও সঙ্গে কারও আলাপ করিয়ে দিলেন। কেউ কেউ নিজেই নিজের পরিচয়ে আলাপিত হলো। লাট ও লেডী মৃদু মৃদু হাস্যে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন।

কোনো কোনো ভি-আই-পিকে মৃদুস্বরে বলতে শোনা গেলো কেন ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাণ্ড পার্টি আনা হলো না। কাউকে কাউকে আবার তার উত্তরে বলতে শোনা গেলো দেশের বৃহৎ নিরাপত্তার খাতিরে এই বিয়ে যখন ফোর্ট উইলিয়মেই হলো না, তখন তাদের ব্যাণ্ড পার্টি এনে আবার কী ট্রাবল হয় কে জানে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। All's well that ends well.

কলকাতা রাজভবনের ভি-আই-পি ?

এই কলকাতার রাজভবনে প্রায় মাঝে মধ্যেই দু' একটা করে নানারকম মজার ঘটনা ঘটে থাকে। 'কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল'-এ এ রকম বহু ঘটনার উল্লেখ করেছি।

এই তো কিছুদিন আগে রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এর আমলে তাঁর পোষা একটি হরিয়ানার ছাগল রাজভবনের খাশ চত্বর থেকে খুন হয়ে লোপাট হয়ে যাওয়ায় কলকাতার কমিশনার থেকে ফরেনসিক ডিরেকটার পর্যন্ত তড়িঘড়ি করে রাজভবনে ছুটে এসেছিলেন।

একটা ছাগল হত্যা নিয়ে সে সময় কলকাতার কাগজে কাগজে, লোকের মুখে মুখে, সে কী সরস আলোচনা।

আজ আবার পনরোই মে উনিশশো তিরাশি কলকাতার রাজভবন সরগরম। কারণ কিছু নয় একটি লাল ছোট্ট বাঁদর।

কোথা থেকে যে এই বাঁদরটি রাজভবনে এসে গেছে এবং রাজভবনের বাসিন্দাদের এমনকি খোদ রাজভবন সংলগ্ন মন্ত্রী মহাশয়দের কোয়ার্টারে কী ভীষণ উপদ্রব শুরু করলে তা আর কহতব্য নয়।

গত শুক্রবার থেকে রাজভবনের সমস্ত কোয়ার্টারের জানালা দরজা বন্ধ হবার জোগাড় সকলের। এই বাঁদরটি কখন যে কার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়বে, কখন কাকে চড় চাপড় মারে, কখন রাজভবনের পুলিশের মাথার টুপী উঠিয়ে নিয়ে গাছের সেই মগডালে চড়ে বসে তার আর হদিস নেই।

রাজভবনের কর্তব্যরত পুলিশ হয়তো মিনিষ্টারের গাড়ি দেখে সালুট করতে ব্যস্ত কোন ফাঁকে এর মধ্যে মিনিষ্টার কোয়ার্টারের গাছ থেকে নেমে এসে বাঁদরটা পুলিশের মাথার টুপীটি নিয়ে এক দৌড়। পুলিশ না পারলো বাঁদরটিকে ধরে ফেলতে না পারলো ঠিক মতো মাননীয় মিনিষ্টারকে সময় মতো সম্মান দেখাতে।

স্বয়ং মিনিষ্টার তাঁর গেটের পুলিশের এই রকম একটা অবস্থা দেখে নিজের রুমাল দিয়ে মুখে হাসি চেপে গাড়ী করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁর চিন্তা হতে লাগল তাঁর সদ্যজাত নাতি তো এখন মামাবাড়ী। ফিরে এলে কী হবে। দেখা যাক কী করা যায়—মিনিষ্টার গৃহের ভীষণ চিন্তা।

এদিকে রাজভবনের সব বাসিন্দা অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে কলকাতার চিড়িয়াখানা এবং সেখানে কোন কাজ না হওয়ায় চিড়িয়াখানার এক মুখপাত্রের পরামর্শে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতিতে' ঘন ঘন ফোন করতে ব্যস্ত। বাঁদরটি কিন্তু এই ফাঁকে বেশ কয়েকটি রাজভবনের সম্মানীয় পুরুষ ও মহিলাকে কামড়িয়ে খামচিয়ে চড় মেরে ঘায়েল করে দিয়েছে। আহতদের মধ্যে আবার রাজ্যপালের সেক্রেটারীর ছেলেও

অন্যতম। ষোলই মে বাঁদরটি আবার একটি সার্কাসের ক্লাউনের মতো কাণ্ড করে বসলো।

রাজ্যপালের এ ডি সি মিঃ শর্মা তখন রাজ্যপালের খোদ দপ্তরে বসে বেশ খোশ মেজাজে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন পড়ছেন এই ফাঁকে বাঁদরটি তার গভর্মেন্ট প্লেসের কোয়ার্টারে ঢুকে সোজা বাথরুমে গিয়ে দাঁড়ি কামাবার ব্রাশ দিয়ে মুখ ভেংচিয়ে দাড়ি কামানো দেখাতে লাগলো।

লোকে বলতে লাগলো এটি নিশ্চয়ই কোন বাঁদরওয়ালার খেলানো বাঁদর। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে। কানে দুটো রিং-এর ফুটো দেখছো না?

যাই হোক যখন কোনো ক্রমেই বাঁদরটাকে কলা মুলো আম দেখিয়েও ধরা গেলো না, তখন রাজ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতি হুকুম দিলেন বাঁদরটিকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলুক। কারণ কী বলা যায় এখন হয়তো বাঁদরটি রাজ্যের মন্ত্রীদেরকে কেয়ার করছে না, হয়তো বা এরপর স্বয়ং বর্তমান রাজ্যপাল বি ডি পাণ্ডের সুইটে গিয়েই বাঁদরামী চালাবে।

প্রথমত বাঁদরটিকে মেরে ফেলবার জন্য পুলিশের লালবাজারের একজন ও সি মিঃ সরকার গুলিভর্তি রিভলবার নিয়ে রাজভবনে এলেন ষোলই মে সোমবার বেলা ঠিক তিনটের সময়। সঙ্গে সঙ্গে এলো যতো সব কলকাতার দৈনিক কাগজের প্রেস ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক রাজভবনের ও ডালহৌসী পাড়ার অগুণতি অফিসের কর্মী নিজেদের দপ্তরের কাজ মুলতবী রেখে।

একজন বেশ বয়স্ক পথচারীতো বাঁদরের এ নিধন দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে বলে বসলেন—কেন মশায় চিড়িয়াখানার লোক এসে জ্যান্ত এই ছোট্ট ফুটফুটে বাঁদরটিকে ধরে নিয়ে যেতে পারলো না। তবে একটা গল্প বলি শুনুন মশায়রা—সেই বৃদ্ধ পথচারী গল্প আরম্ভ করলেন—জানেন একবার এক ছিনতাইকারী এই কলকাতার গঙ্গার ধারে বাবুঘাটের কাছে একজন মহিলার গলার হার ছিনতাই করে মারলো এক ঝাঁপ গঙ্গায়। কাছেই ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। সে তো ছুট ছিনতাইকারীকে গেলো ধরতে। লোকে লোকারণ্য তখন।

ওদিকে মাঝ গঙ্গায় ডুব সাঁতার দিয়ে মুখ উঠিয়ে সেই ছিনতাইকারী বার বার সেই ট্রাফিক পুলিশকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাঁকছে—ট্রাফিক পুলিশ হবে না। আমাকে ধরতে জল পুলিশ ডাকো। আমি এখন জলে রয়েছি—এটা তোমার আওতায় নয়।

এই বলেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুখে একটা বিদঘুটে আওয়াজ করে দেশের চলতি আইনের বাপের শ্রাদ্ধ করে সেখান থেকে ধীর পায়ে কেটে পড়লেন ভীড়ের মধ্যে রাজভবনের চত্বর থেকে—কারণ আচমকা পুলিশের গুলি কখন কার লাগে এই বাঁদরটিকে মারতে গিয়ে।

এদিকে হলো কী রাজভবনের এক কর্মচারীর ছেলে পশুপ্রেমী টুলু—যাকে রাজভবনের বাসিন্দারা সবাই চেনে কারণ তার আছে নিত্য খেলার সঙ্গী তার পোষা

ঐক বাঁদর, একটা কালো-শাদায় সুন্দর শিংওয়ালা ছাগল, দুটো সুন্দরী বিড়াল, একটা লাল রং-এর কুকুর, একটি টিয়াপাখী। টুলু কিন্তু এ কদিন রোজ চেষ্টা করছে যাতে ঐ বাঁদরটিকে সে কোনো রকমে ধরে ফেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ওটাকে বাঁচাতে পারে।

টুলুর একটাই যুক্তি—আমি পশুপাখি ভালবাসি। মানুষ বেইমান হয়। কিন্তু জন্তু জানোয়ার বেইমান হয় না যদি তাকে প্রাণ দিয়ে কেউ ভালবাসে। বাঁদরটি বেশ ভালো। আমি ওকে ধরে দেবোই। আপনারা ওকে মারবেন না।

এখানে বছর চৌদ্দ বয়সের গড়নের এই কিশোর ছেলে টুলু ঘোষের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে রাজভবনের কর্মচারী নয়। কিন্তু তার বাবা ফটিক ঘোষ রাজভবনের পাম্পম্যান—শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক। টুলু কিন্তু চঞ্চল—যাকে বলে প্রাণ উচ্ছল হৃদয়বান ছেলে।

সে তার পোষা জন্তু জানোয়ারের জন্য কোথায় কোন অসময়ে বাঁদরের জন্য ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফুটপাতে বাজার থেকে কলাটা মুলোটা বিভিন্ন পাকা ফল ইত্যাদি নিজের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে লুকিয়ে কিনে এনে নিজের পোষা পশুপাখীদের নিত্য খাওয়ায়।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা তার নিজের শোবার জায়গা—সেটা দড়ির খাটিয়া। রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে কোন অতিথি এলে দেখতো টুলু খাটিয়ার মাঝখানে টানটান হয়ে শুয়ে আছে আর তার মাথার দিকে একপাশে শুয়ে তার প্রিয় কুকুর, পায়ের কাছে শুয়ে তার পোষা বাঁদর, বাঁ হাতের পাশে শুয়ে বিড়াল, টিয়াপাখীর খাঁচাটা ডান হাতের পাশে রাখা একটা ছোট্ট মোড়াতে এবং দাড়িওয়ালা সুশ্রী ছাগলটা গলায় ঘন্টাবাঁধা অবস্থায় প্রভুর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে চোখ বুজে আস্তে আস্তে মুখ নেড়ে চর্বিত চর্বন করছে।

শেষে সেই দিনই অর্থাৎ ষোলই মে সোমবার বেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঐ বিপুল জনতার হাততালির মধ্যে টুলু টুক করে রাজভবনের কোয়ার্টারের এক বাড়ীর ছাদ থেকে পুলিশের ওসির রিভলবারের গুলির তোয়াক্কা না করে বাঁদরটিকে ধরে ফেলে ওর প্রাণ বাঁচালো।

পরের দিন কলকাতার কাগজে কাগজে ছবি বেরুল সহৃদয় পশুপ্রেমী টুলুর ও ছোট্ট বাঁদরটির।

টুলুর চোখে জল আর বাঁদরটি তাকে দুহাতে বুক জড়িয়ে ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে সকরুণ নয়নে তাকিয়ে আছে—যেন মনে হচ্ছে অপরাধী ছেলেকে বহুদিন পরে বাড়ীতে ফিরে পেয়ে স্নেহময় বাবার চোখে আনন্দাশ্রু।

আর একটি ঘটনা সেদিন রবিবারের সুন্দর মেঘ মুক্ত সকাল। তারিখটা হচ্ছে নয়ই মার্চ উনিশশো আশী সাল। হঠাৎ রাজভবনের কোয়ার্টারে বসে খবর কানে এলো যে রাজভবনে মহাকান্ড হয়ে গেছে। — রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এর অতি প্রিয় ইজরায়েলি ছাগল রাজভবনের খোদ কম্পাউন্ডের ছাগলের ঘর থেকে

কে বা কারা চালের এ্যাসবেসটারের সিট ভেঙ্গে সেই মস্ত শাদা রং এর ছাগলটাকে খুন করে তার ধড় ও মুণ্ড নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

খবরটি লালবাজারে পৌঁছুতেই স্বয়ং পুলিশ কমিশনার তাঁর দলবল, সি-আই-ডির হোমরা চোমরারা এমন কি ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রধান পর্যন্ত রাজ্যপালের ছাগল খুনের ঘটনার কুলকিনারা করতে ছুটে এসেছেন। পুলিশ ডগও আনতে ভোলেন নি।

রাজভবনে পা দিয়েই তো তাঁরা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠলেন। হাইকোর্টের দিকে ঠিক বিধানসভার পূর্ব পারে রাজভবনে চৌহদ্দির মধ্যে এই কিছুদিন হলো প্রায় ছাব্বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এই ইজরায়েলি ছাগলের ঘর বানিয়ে ছিলেন।

আশা ছিল রাজভবনের বাসিন্দারের খাঁটি ছাগলের দুধ খাওয়াবেন এবং নিজেও পান করবেন। এর মধ্যেই ছাগলের দু'বার বাচ্চা হয়ে ধাড়ী ও বাচ্চা মিলে প্রায় চৌদ্দটি ছাগলের বৃহৎ সংসার এই রাজভবনের সুন্দর ঘরটিতে ভরে উঠেছিল। দুধও দিচ্ছিল বেশ কয়েকটি ছাগল। ছাগল চরানোর জন্য দুটি ছেলেও রাজভবনে চাকরী পেয়েছিল। সবই এই মাস ছয়েক ছকবাঁধা পথেই চলছিল। হঠাৎ এই ছাগল খুন ও তার ডেডবডি বেপাত্তা।

শহরের কাগজে কাগজে এমনকি স্টেটসম্যানের পাতায়ও রাজভবনের ছাগল খুনের ঘটনা সোমবারের পাতাতেই বেরিয়ে গেলো। খুবই হৈ চৈ ব্যাপার। রাজভবনে এর পূর্বে অনেক তৈজস পত্র চুরি গেছে, নারকেল গাছ থেকে ডাবের কাঁদি চুরি গেছে। রাজভবনের মধ্যেকার দুটি পুষ্করিণী থেকে বড় বড় মাছ চুরি গেছে। রাজভবনে সুদৃশ্য ঘর থেকে আরও সুদৃশ্যতম ব্রিটিশ আমলের ইলেকট্রিকের দেয়াল ফিটিং, চুরি গেছে ঝাড়বাতির চমৎকার চমৎকার বৃটিশ আমলের কাটগ্লাসের নক্সার নমুনা। ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এ যে খুন। আজ হয়তো নিরীহ ছাগল খুন হয়েছে কিন্তু কালই তো স্বয়ং রাজ্যপালের জীবনও সংশয় হোতে পারে। তাই খুব হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার রাজভবনের সমস্ত জন-জীবন জুড়ে।

হঠাৎ বারোই মার্চ উনিশশো আশী বুধবার, কলকাতার একটা দৈনিক সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে খবর বেরুলো—"অজ-বিলাপ"। তাতে লেখা হল মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার পুলিশ রাজভবনের ছাগল খুনের কিনারা করে ফেলেছে। ছাগলের ছাল উদ্ধার হলেও পুলিশ এ সম্পর্কে আজাদ আলি, গোবিন্দ পোদ্দার ও রসিদ নামে তিন ভবঘুরেকে পাকড়াও করেছে। রাজভবনের আশপাশে এদের ডেরা। হদিশ মিলেছে একটা রক্তমাখা ভোজালিরও···ছাগলটির কুলপঞ্জি জানা গেছে। এর পিতা ইজরায়েলি, মাতা বাঙলার। রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং অস্ট্রেলিয়া থেকে একজোড়া ইজরায়েলি পাঁঠা রাজভবনে এনেছিলেন প্রতিটির দাম কম করেও চার হাজার টাকা।

সম্ভবত শনিবার বেশি রাতে ছাগল নিবাসের ছাদ ভেঙে খুনীরা ঢোকে। 'ছাগল নিবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মী' রামফল তখন বাইরে ছিল। দুর্বৃত্তরা রামফলের লুঙ্গি হাতিয়ে ছাগল নিবাসে ঢোকে। ডাকাডাকি শুরু করলে ওরা ছাগলের গলায় লুঙ্গির ফাঁস আটকে দিয়ে কণ্ঠরোধ করে ভোজালির কোপ লাগায়। তারপর তারা নিউ মার্কেটে মাত্র ২৫ টাকায় ছাগলটাকে বিক্রি করে। পুলিশ এখন দেখছে এই খুনের সঙ্গে রামফলের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।"

সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই ছাগলচুরির আদ্যপ্রান্ত পুলিশের ইনভেস্টিগেশন দেখে আমাদের মতন সামান্য লেখকদের সুষ্ঠু ধারণা হয়ে গেলো কেন কলকাতার পুলিশকে বৃটিশ আমলে এবং পরেও বিশ্বের অন্যতম সেরা পুলিশ বলে। বেশ কয়েকজন ডি সি, স্বয়ং পুলিশ কমিশনার, ফরেনসিকের ডিরেকটর ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় জনা চল্লিশ জন পুলিশ অফিসার যেমন ভাবে এবং যেমন কড়া নজরে এই তদন্ত চালালেন তা বেশ দেখবার মতন।

পুলিশ ডগ তো দেখা গেল রাজভবনের পশ্চিমের গেট পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। দেখা গেলো পুলিশের লোকজন ছাগল ঘরের এ্যাসবেসটাস থেকে চেঁছে শুকনো ছাগলের রক্ত সংগ্রহ করছে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। পুলিশ কমিশনার রাজভবনের চতুর্দিকে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। এটা তো যে সে চুরির ঘটনা নয়। স্বয়ং রাজ্যপালের ছাগল খুন। এক কথায় বলতে গেলে এই প্রদেশের ফার্স্ট সিটিজেনের পেয়ারের ছাগল হত্যার কুলকিনারা করার দায়িত্ব।

এদিকে আবার রাজভবনের পাশে বিধানসভায় এই প্রসংগের উল্লেখ করে কংগ্রেস (ই) এর এক সভ্য আসর গরম করছেন—রাজ্যপালের ছাগল খুন হলে পুলিশ তিনদিনেই ধরে ফেলছে অপরাধীকে, কিন্তু সামান্য লোকের বেলায় তিন বছরেও কিছু হয় না। হাঃ হাঃ হাঃ।

রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ কিন্তু এ ব্যাপারে নিজের মনের ভারসাম্য একটুও হারান নি। বরং তিনি ছাগল অন্য গুলির দানাপানির সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য তাঁর মাদ্রাজী আই-এ-এস ডেপুটি সেক্রেটারীকে কড়া হুকুম জারি করলেন।···

রাজভবনের ঐ ছাগল ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যানের ব্যবস্থার কথা এখন কিছু লেখা যাক।

যখন কলকাতার চতুর্দিকে প্রচণ্ড লোডশেডিং চলছে এমনকি সারা পশ্চিম-বাংলার কলকারখানার লে অফ, ক্লোজার, ছাঁটাই ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ভূতের বোঝা চেপে বসেছে, সেই উনিশশো আশী সালের দিনগুলি তখন পুরো রাজভবন আলোয় আলোকময়।

ভি-আই-পি কোটার মাহাত্ম্যে রাজভবনে কখনও লোডশেডিং হয় না। যদিও কলকাতায় যেখানে আশী শতাংশ লোক এই আজকের দিনে, দিনে রাতে যখন আট দশ ঘণ্টা নিত্য নৈমিত্তিক লোডশেডিং-এ ভুগছে তখন এই কলকাতার বুকেই বড় বড় হসপিটাল এবং কিছু কিছু মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি বর্তমানে আছেন যারা কিন্তু

এতো লোডশেডিং এর ধাক্কায় গায়ে আঁচরটির লেশমাত্র টের পেলেন না। এবং তার এক মাত্র কারণ আমাদের দুর্ভাগা দেশে এখানকার ডেমোক্র্যাসী। সেটা ভারতবর্ষীয় ডেমেক্র্যাসী। এখানে ইতরজনের সঙ্গে ধনবানদের কিছুটা ফারাক থাকবেই। মুখে লীডাররা সে যে যতই বলুন না কেন।

হাসপাতালে আলো পাখা দরকার কারণ, না হলে রোগীদের কষ্ট হবে। রাজভবনে লোডশেডিং হবে না কারণ, কখন কোন বিদেশী অতিথি অভ্যাগত আসেন। সবই ঠিক। কিন্তু তাই বলে কী রাজ্যপালের পোষা ছাগল ঘরে ইলেকট্রিকের পাখা অতি সত্তর লাগাতে হবে ? কারণ, ছাগল গরু যে অবলা জীব।

এই প্রসংগে মনে পড়ে যাচ্ছে যে রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং যখন একবার মে মাসে গ্রীষ্মে সদলবলে দার্জিলিং এ কিছুদিনের জন্য ট্যুরে যাচ্ছিলেন তখন রাজ্যপাল পত্নী ধর্মপ্রাণা লেডী সুশীলা সিং রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণকে অনুরোধ করে রাজভবনে তাঁর ঠাকুরঘরে এয়ার কুলার ও খশখশের ব্যবস্থা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, তাঁরা এই নিদারুণ গরম থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দার্জিলিং পালিয়ে যাচ্ছেন তাপীত অন্তরে শান্তি পাবার জন্য তখন তাঁদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ জী কী রাজভবনে গরমে পচে মরবেন !

সেটা না হয় ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। কিন্তু আজ এই যে সাতাশে এপ্রিল উনিশশো আশী সাল এ রাজভবনের চৌদ্দটি ছাগল নিয়ে গঠিত ছাগলের সংসারে ইলেকট্রিক ফ্যান লাগানো হলো এর কোনো যুক্তি থাকতে পারে ? চারিদিকে দুঃসহ লোড শেডিং। কলকাতার মানুষজনের ইলেকট্রিসিটির অভাবে প্রাণ ওষ্ঠা গত। খবরের কাগজে নিত্য নৈমিত্তিক লোডশেডিং এর ভয়াবহ চিত্র, কিন্তু অন্যদিকে কলকাতার রাজভবনের অন্দর মহল-এর কাহিনী সম্পূর্ণ আলাদা।

সেখানে ঘরে ঘরে নতুন নতুন এয়ার কণ্ডিশনার বসানো হচ্ছে পুরাতনকে পালটিয়ে নতুন ডিজাইনের (লাটের বড় ছেলের ঘরে ছ'টি নতুন এয়ারকণ্ডিশনার বসানো হলো এই মাসে) নতুন নতুন ধাঁচের শেড্ আসছে, ছাগলের ঘরে শিলিং ফ্যান ঝোলানো হচ্ছে কিন্তু মোগল আমলের হারেমের মতো রাজভবনের সব পুরানো কর্মচারীরা ফিস ফিস করে কিছু নিজেদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুললেও জোরে টুঁ শব্দটি করতে ভয় পাচ্ছে এতোদিনের শখের গোলামী যদি তাদের হারাতে হয়।

সত্যি সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ ! কী বিচিত্র এই দেশের জনগণ ! খোদ বৃটিশ জাত যারা শীতপ্রধান দেশের লোক তারা এই রাজভবনে প্রায় দেড়শো বছর কাটিয়ে গেলো কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখন কলকাতার রাজভবনে প্রায় একটাও এয়ার কন্ডিশনার বা গরম জলের গিজার ছিল না কিন্তু আজ দেশী আমলে রাজভবনের চিত্র আলাদা ঃ

(ক) গিজার ঃ—

(১)	ওয়েলেসলী	সুইট	=৩টে।
(২)	এ্যানডারসন	,,	=৩টে।

(৩)	ডাফরিণ	,,	=৪টে।
(৪)	প্রিন্স অব ওয়েলস, স্যুইট ,,		=৪টে।
(৫)	গভর্ণর	,,	=১টা।
(৬)	সেকেণ্ড ক্লাস	,,	=১টা।
(৭)	কটেজে	,,	=১টা।
(৮)	মন্ত্রীদের ঘরে	,,	=১টা।
(খ)	এয়ার কনডিশনার		=প্রায় ৪৮টা
(গ)	ফ্রিজিডিয়ার		=১৮টা
(ঘ)	ইলেকট্রিক বাল্ব পয়েন্টস মেন রাজভবনে		=প্রায় ২,৫০০
(ঙ)	রাজভবনের অন্যান্য বাড়ীতে		=প্রায় ২,৫০০ হাজার

কলকাতার রাজভবন বনাম দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন

সব প্রদেশের এক-নম্বর নাগরিক হচ্ছেন সেই সেই প্রদেশের রাজ্যপাল বা গভর্ণর। তেমনি সারা ভারতের প্রথম সম্মানীয় নাগরিক ভারতের প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি থাকেন দিল্লীতে।

এখন আমরা যখন বাংলার রাজ্যপালের রাজভবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয় এই বই-এ সবিস্তারে বললাম তখন আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি দিল্লীতে কেমন থাকেন, কেমনই বা তাঁর আবাসস্থল, কতজন লোক সদা সর্বদা কাজ করে চলেছে, কতোটা জমি নিয়ে তাঁর বিরাট রাষ্ট্রপতি ভবন ইত্যাদির খবর রাখা দরকার। কেন না দিল্লীর রাষ্ট্রপতিরই সোজাসুজি প্রতিনিধি রাজ্যপাল। যেমন বৃটিশ আমলে ছিল ভাইসরয়ের প্রতিনিধি গভর্ণর।

রাজ্যপাল তো ভারতের সব প্রদেশেই একজন ক'রে আছেন এবং প্রায় প্রত্যেক রাজ্যপালেরই মোটামুটি খরচ বা বাড়ীর জাঁকজমক অনেকটা প্রায় কলকাতার রাজভবনের মতো। কোথাও খরচ বা রাজভবনের চৌহদ্দী একটু বড় বা ছোট। কিন্তু একুনে সব রাজভবনই সেই মান্ধাতা আমলের কাল থেকে বৃটিশ কায়দার চাল চলনে কথায় বার্তায় প্রায়ই সমপরিমাণ।

এইতো সিকিম, যে সিকিম সেদিনও আধা স্বাধীন ছিল, সে ভারতের অঙ্গরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েই কলকাতার রাজভবনে বার বার চিঠি লিখে জানতে চাইলো কেমন করে কলকাতার রাজভবনের হাউস হোলড চলে, কতজন স্টাফ, কতজন ঝাড়ুদার, কতজন খিদমদগার, কতজন বাবুর্চি ইত্যাদি।

তাই বলছিলাম কলকাতা-রাজভবনের ইতিবৃত্ত যখন লেখা হয়েছে তখন পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখন দিল্লীর রাষ্ট্রপতির বিশাল ভবন সম্বন্ধে কিছু তথ্যের অবতারণা করা যাক।

৩৩০ একর জমির উপর তৈরী এই রাষ্ট্রপতি ভবনের জন্য লেগেছে ৫ একর জমি। ভবনটি চওড়ায় ৬৩০ ফুট আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৫৩০ ফুট।

এর ভিতর চারিদিকের মাপ ১০৩০ গজ, দুটি সচিবালয়ের পশ্চিম দিক থেকে ১১০০ ফুট পিছনে থাকলেও এ বাড়ির বিরাটত্ব সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। নর্থ অ্যাভিন্যু এবং সাউথ অ্যাভিন্যু এসে এ ভবনকে যুক্ত করেছে এবং সার সার ফ্ল্যাটগুলিতে থাকেন সংসদ সদস্যরা।

একটা টিলা ফাটিয়ে তার ওপর এই ভবন তৈরী করায় ভিতের খরচ বেঁচেছে—বেঁচেছে অনেক শ্রম।

গোটা বাড়িটা সাধারণ ইট দিয়ে তৈরী এবং বাড়ির বাইরেটা ঘিরে ও টমাটো রংএর লালপাথরে সাজানো।

পাথরগুলি আনা হয় দিল্লী থেকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত ধোলপুর থেকে।

ভবনের মেঝে ও ছাদ তৈরী হয়েছে 'রিনফোর্সড কংক্রিটে' এবং প্রায় সব ঘরই সাদা কালো মার্বেল পাথরে মোড়া।

রঙীন পাথরগুলি এসেছিল ইতালি ও ইউরোপ থেকে।

এটি তৈরী করতে লেগেছিল আট বছর সময় এবং কাজ করেন ৫ হাজারের ওপর শ্রমিক, ছুতোর, ইনজিনিয়ার ও কারিগর। এতে লেগেছে ১৫ লক্ষ ঘনফুট পাথর, ৪৫ লক্ষ ইট, সাড়ে সাত হাজার টন সিমেণ্ট, এবং সাড়ে তেরশ টন লোহা ও ইস্পাত।

ভবনটিতে আছে ৩৪০টি বড় এবং ছোট ঘর ও হল; ২২৭টি কলাম। ভবনের বারান্দার দৈর্ঘ্য দেড় মাইল এবং জায়গাটি ঠাণ্ডা রাখতে ৩৭টি ঝর্ণা থেকে জল সিঞ্চন করা হয়।

এ ভবনের সবচেয়ে বড় হল—দরবার হলের ব্যাস ৭২ ফুট এবং উচ্চতা সাড়ে সাতাত্তর ফুট। সাদা কালো মার্বেলে মোড়া এ ভবনটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ ও অভিষেকের জন্য ব্যবহার করা হয়।

হলের পশ্চিমদিকে যে রুপোর সিংহাসনে আগে ভাইসরয়েরা বসতো এখন সেখানে রয়েছে বুদ্ধের একটি মূর্তি এবং সাজানো রয়েছে নানা ছবিতে।

দরবার হলের পরেই অশোক হল।

এটি প্রথমে ভাইসরয়দের বলরুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন এখানে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ, রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র পেশ অনুষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় ভোজসভার সময় অতিথিদের সঙ্গে সফরকারী প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ঘরেও রয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান চিত্র।

এর পর ব্যাঙ্কোয়েট হল বা ভোজসভা হল।

এর মাঝখানে রয়েছে এমন একটি টেবিল যাতে ১০৪ জন একসঙ্গে বসতে পারেন। এ ভবনে সংগীত শিল্পীদের মঞ্চ রয়েছে সাধারণের অলক্ষ্যে।

একতলায় রয়েছে রাষ্ট্রপতির পাঠ ভবন। এর পর যে ঘর সেখানে রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে ঘরোয়া ভোজসভারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ভবনের আরেক আকর্ষণ 'মোগল গার্ডেন'। লেডি হার্ডিঞ্জ কাশ্মীরের 'মোগল গার্ডেন' দেখে মুগ্ধ হয়ে এই অপরূপ উদ্যানটি তৈরী করান।

এই বিরাট জাঁকজমক পূর্ণ রাষ্ট্রপতি ভবন তার জন্য খরচ হয় কতো?

সরকারি হিসেবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত। একজন মুখপাত্র বললেন, শুধু রাষ্ট্রপতি ভবনের জন্য খরচ ৭০ লক্ষ টাকা, এছাড়া পূর্ত বিভাগ এর দেখা শোনার জন্য খরচ করে বছরে ৫০ লক্ষ টাকা ও আরো ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয় বিবিধ খাতে। কুমায়ুন রেজিমেণ্টের খরচও এখান থেকে মেটান হয়।

সবচেয়ে মজার বিষয় রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রায় সাড়ে তিনশ ঘরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করেন মাত্র তিন কামরার এক স্যুইট, অন্য ৬০টি স্যুইট ব্যবহার করা হয় বিদেশী অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য।

রাষ্ট্রপতি ভবনের রান্নাঘরে দেড়শ জন রাঁধুনি রান্না করে চলেছে নানা ধরনের খাবার। ২০১ জন খিদমদগার সদা তটস্থ—এই বুঝি ডাক আসে। ৭৫ জন সব সময়ে মেজে উজ্জ্বল করে তুলছে রুপোর বাসনপত্র, ৩৫০ জন ঝাড়ুদারের ঝাঁটায় সাফ হচ্ছে রাজ্যের ময়লা, ৩০০ জন মালির যত্নে গাছে গাছে ফুটে উঠছে ২৫ রকমের গোলাপ—বাগানে বাহার দিচ্ছে নানা রকমের গাছ—ফুল ফল আর পুরো কুমায়ুন রেজিমেণ্ট তাদের পোষাকের চাকচিক্যে, জৌলুসে আকর্ষণ করছে সকলের সম্ভ্রম।

সকাল থেকে রাত্রি—রাষ্ট্রপতি ভবনে এতোগুলি লোক নিষ্ঠার সঙ্গে একাগ্র মনে করে যাচ্ছেন তাঁদের কাজ।

৩৩০ একর জমি নিয়ে তৈরী রাষ্ট্রপতি ভবনের মান-মর্যাদা রক্ষায় তারা সদা ব্যস্ত।

রাষ্ট্রপতি ভবনে আছে নানা রকমের পাখি, পোষা বেড়াল, হরিণ ইত্যাদি। আর আছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে সাড়ে তিনশ কর্মী

এখন দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের কোন এক বছরের (১৯৮৫-৮৬) বার্ষিক খরচের তালিকা দেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা = ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।
(২) ” সচিবালয়ের খরচ = ৫৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা।
(৩) ” বাড়ির খরচ = ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
(৪) ” আপ্যায়নের খরচ = ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।
(৫) ” মোটর ও অন্যান্য
যানবাহনের খরচ = ৫ লক্ষ টাকা।
(৬) ” ভ্রমণের খরচ = ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

রাজভবনে রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ

আমাকে কলকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক অনেক সময় অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিম বাংলার এক পারসেণ্ট লোকেরই কলকাতার রাজভবনের ভেতর দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, এটা কিন্তু স্বাধীন দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক। যেখানে তাজমহল, হাজার-দুয়ারী, ফতেপুর সিক্রি, পার্লামেণ্ট হাউস ইত্যাদি আমরা ইচ্ছে করলেই দেখতে পারি কিন্তু সেখানে বৃটিশ আমলের এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাসাদপুরী কেমন তা দেখবার হুকুম নেই। চিঠি লিখলেও অনেক সময়ে সম্মতিসূচক উত্তর আসে না।

যাই হোক সে সব ভদ্রলোকদের আমি কোন সদুত্তর দিতে পারি নি। তবে 'কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহলে' তাঁরা রাজভবনের কিছু ছবি বাড়ীতে বসেই পড়তে পারবেন।

এখন দেখা যাক রাজভবনে নূতন রাজ্যপালেরা কী করে শপথ গ্রহণ করেন।

(১) রাজভবনের দোতলায় দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ঐতিহাসিক থ্রোন রুমে প্রত্যেক রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ করানো হয়। এই কার্যপদ্ধতি বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে। এখানে চাঁদীর বাঘমুখো হাতল যুক্ত যে বৃহৎ সিংহাসনে রাজ্যপাল বসেন ও শপথ নেন সেটা অনেকের মতে বৃটিশ আমলে আনীত টিপু সুলতানের সিংহাসন। আবার অনেকের মতে এই থ্রোন রুমে আর যে একটি ছোট সিংহাসন আছে সেটাই টিপু সুলতানের।

(২) নির্দিষ্ট ঘোষিত সময়ে শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেটা প্রায়ই বিকেলের দিকে হয়ে থাকে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের সেই নির্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ ১৫ মিঃ পূর্বে নিজেদের নিজের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয় নিমন্ত্রণ পত্রে।

(৩) এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, বিধানসভার বিরোধী পক্ষের নেতা, আমেরিকা, রাশিয়া, পাকিস্তান, জাপান, বৃটেন, ব্রহ্মদেশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল, ফোর্ট উইলিয়ামের লেঃ জেনারেল, এরিয়া কমাণ্ডার প্রভৃতি অফিসারগণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগন, রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, কলকাতার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, প্রভৃতি প্রায় তিনশো থেকে চারশো জন নিমন্ত্রিত অতিথি।

(৪) পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে ভাবী রাজ্যপাল সুসজ্জিত দুই এ-ডি-সি সহ নিজের কক্ষ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে থ্রোন রুমে এসে সিংহাসনে বসেন। তখন সমস্ত অতিথিবৃন্দ সসম্মানে দাঁড়িয়ে ওঠেন। রাজ্যের চিফ সেক্রেটারী অর্থাৎ মুখ্য সচিব তখন মাথা ঈষৎ নত করে ভাবী রাজ্যপালের কাছে অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার অনুমতি নেন ও

ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত নতুন রাজ্যপালের নিয়োগ পত্রটি জোরে জোরে পাঠ করেন। এই নিয়োগ পত্রটির নাম প্রেসিডেন্টস্ ওয়ারেন্ট অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

(৫) এরপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দণ্ডায়মান অবস্থায় রাজ্যপালকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এই শপথ বাক্যটির নাম ওথ্ অব অফিস।

(৬) এরপর রাজ্যপালের সেক্রেটারী নতুন নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে সিংহাসনের সম্মুখে রক্ষিত অন্য একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে শপথ সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র সই করান। এই সময়ে রাজভবনের গম্বুজের উপর রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করা হয়। (ষাটের দশকের পর রাজ্যপালের নিজস্ব কোনো পতাকা নেই। জাতীয় পতাকাই গভর্ণরের পতাকা) রাজভবনের উত্তর দিকে মেন গেটের পাশে 'কলারস রুম' অর্থাৎ দর্শনার্থী প্রকোষ্ঠে রাজ্যপালের অভিলাষী দর্শনার্থী অতিথিদের নাম ঠিকানা লেখবার জন্য নতুন খাতা রাখা হয় ও ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সতেরো বার তোপধ্বনি করা হয়।

(৭) এর পর মুখ্য সচিব অনুষ্ঠান শেষ করবার অনুমতি চান রাজ্যপালের কাছে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন ও রাজ্যপাল শোভাযাত্রা সহকারে নিজের স্যুইটে বিদায় নেন।

কয়েক মিনিট পরেই নবনিযুক্ত রাজ্যপাল আবার 'ব্যানকোয়েট' হলে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হন ও রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজ্যপালকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

এখন এই নব নিযুক্ত রাজ্যপালের অভিষেকে ১৭ বার তোপধ্বনি কী করে করা হয় বা বৃটিশ আমলেও কেমন করে করা হত তাই বলা হচ্ছে।—প্রথম দিকে বৃটিশ আমলে যখন গভর্ণর শপথ নিতেন তখন রাজভবন থেকে তোপধ্বনি করবার সংকেত খুব মজার ও কৌতুকপূর্ণ উপায়ে দেওয়া হতো।

নব নিযুক্ত রাজ্যপাল বা গভর্ণর যখন শপথ সংক্রান্ত কাগজপত্র সই করতে আরম্ভ করতেন তখন থ্রোন রুমের দক্ষিণের বারান্দা থেকে একজন ইংরেজ সৈনিক একটা নিশান বা ফ্লাগ হাত দুলিয়ে নাড়তে থাকেন। সেই ফ্লাগ দেখে নীচে দক্ষিণের গেট থেকে আবার একজন ফ্লাগ নাড়াতেন। আবার দক্ষিণ গেটের ফ্লাগ নাড়ানো দেখে ময়দানের মধ্যে দণ্ডায়মান আর একজন সৈনিক ফোর্টের ভেতর ফ্লাগের সংকেত জানাতো। তখনই ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ১৭ বার তোপ দাগা হতো।

এখন অবশ্য রাজ্যপালের শপথ নেওয়ার সময় ফোর্ট থেকে রাজভবনের মধ্যে একটা অস্থায়ী টেলিফোন লাইন ও ওয়ারলেস এর ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজটি ফোর্টের সৈনিক ইনজিনিয়ারেরাই করে থাকেন।

এই প্রসংগে উল্লেখ করছি যে নব নিযুক্ত রাজ্যপালের শপথ নেওয়ার মতই প্রাদেশিক নতুন মন্ত্রীদের শপথ নেওয়ানো হয় রাজভবনেই এই ঐতিহাসিক থ্রোন রুমে। তবে এঁদের বেলায় কোন তোপধ্বনি হয় না এবং রাজ্যপাল স্বয়ং এঁদের শপথ নেওয়ান এই যা তফাৎ।

রাজ্যপালের পতাকা ও কলকাতার রাজভবন

তখন সবে মাত্র কলকাতার লাটবাড়ীর ঘন সবুজ বাগানে ঘুমন্ত পাখীরা ডেকে উঠেছে। বাগানের নানারকম নানা বর্ণের নানা আকারের মরসুমী ফুলের উপর ভোরের শীতের আকাশ থেকে ফোটা ফোটা শিশির বিন্দু ঝরে টলমল করছে। লাটবাড়ীর উত্তর পূর্ব কোণে যে বিরাট শিউলী গাছটা আছে তা থেকে পথের ফুটপাথে দু'একটি করে শিউলী ঝরে পড়ছে।...

ভোরের নিত্য গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা রাজভবনের ঐ শিউলী গাছটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফুটপাথ থেকে সদ্যঝরা শিউলী ফুলগুলি নিজেদের আঁচলে কুড়িয়ে নিচ্ছে। আর পাশে দণ্ডায়মান রাতজাগা রাজভবনের পুলিশটিকে অনুরোধ করছে শিউলী গাছটিকে ঝাঁকিয়ে দিতে—হাজারে হাজারে শিউলী ঝরে পড়লো লাটবাড়ীর অঙ্গনে, ফুটপাথে। পথচারিণীরা সমস্ত ফুল তাদের লোল আঁচলে কুড়িয়ে নিল।

তখন ডালহৌসী পাড়ার ময়দানে অস্ফুট আলো-আঁধারের খেলা চলছে। ভোর ৪ টার প্রথম ট্রাম ডালহৌসীর পাশ দিয়ে চলে গেলো। প্রভাতের প্রথম উষার আলো রাজভবনের পূর্ব দিগন্তের সুদূর রঙীন আকাশ থেকে ধীরে ধীরে এসে রাজভবনের ৩০ ফুট উচ্চ গম্বুজের উপরকার ২০ ফুট উঁচু ফ্লাগ ষ্ট্যাণ্ডের মাথা সবে মাত্র স্পর্শ করেছে। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ রাজভবনের বিশ্বস্ত কর্মচারী শিং লামার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে তাড়াতাড়ি তন্দ্রাজড়িত চোখে রাজভবনের তিনতলার ছাদের উপর উঠে তারের মই বেয়ে রাজভবনের গম্বুজের উপর উঠে গেলো। সেখান থেকে ধীরে ধীরে সম্মানের সঙ্গে রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকার (ষাটের দশকে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যপাল, প্রেসিডেণ্ট ও কাশ্মীরের রিয়াসৎ এর আলাদা পতাকা খারিজ করে সব ক্ষেত্রেই জাতীয় পতাকা মঞ্জুর করেন) দড়ি টেনে ফ্লাগ ষ্ট্যাণ্ডের উপর উড়িয়ে দিল। তখন সবে মাত্র ভোর পাঁচটা।

এটাই রাজভবনের বৃদ্ধ ফ্ল্যাগম্যান শিংলামার কাজ। লাট যখন কলকাতায় থাকবেন তখন রোজ সকালবেলায় লাটের পতাকা গম্বুজের উপর উড়িয়ে দেওয়া ও প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পতাকা ধীরে ধীরে নামিয়ে নেওয়া।

এই কাজ যে সেই কতোদিন ধরে চলে আসছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই যবে ১৮০৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতার এই রাজভবনকে ইংলণ্ডের লর্ড কার্জনের প্রপিতামহের কেডেল্‌ ষ্টোন হাউসের অনুকরণে তৈরী করিয়েছিলেন প্রায় সেই তখন থেকে এই ব্যবস্থা। তারপর ইংরেজ শাসনের প্রায় দু'শো বছর ও ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর এখনও একই ট্রাডিশন চলে আসছে। সকালে রাজ্যপালের ফ্ল্যাগ (এখন চক্রশোভিত জাতীয় পতাকা) উঠানো ও সন্ধ্যায় নামিয়ে নেওয়া। অবিরাম। অবিচ্ছেদ্য। অনর্গল।

এখন দেখা যাক লাটবাড়ীর এই ফ্লাগ উঠানো ও নামানো সম্বন্ধে আমাদের সংবিধান কী বলে ও এই ফ্লাগ উঠানো নামানো নিয়ে লাটবাড়ীতে যে কয়েকটি রসাল চমকপ্রদ সত্য ঘটনা ঘটেছে তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য বর্ণনা। অনেকের হয়তো জানা নেই আমাদের ভারতীয় সংবিধানের বৃহৎ পৃষ্ঠার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আমাদের জাতীয় পতাকা কখন কী ভাবে তুলতে হবে, কখন নামাতে হবে, কখন অর্ধনমিত করতে হবে, বা বিভিন্ন দেশের হাই ডিগনীটারীদের নিজ দেশের জাতীয় পতাকার সঙ্গে আমাদের পতাকা কেমন ভাবে টাঙানো হবে কেমন ভাবে তা শোভা পাবে, কোনদিকে থাকবে বাঁ-য়ে না ডাইনে ইত্যাদি সবিস্তারে বলা আছে।

এখানে আবার বলা দরকার ষাটের দশকে আমাদের জাতীয় পতাকা, প্রেসিডেন্টের পতাকা, গভর্ণরের পতাকা, লেফটেনেন্ট গভর্ণরের পতাকা, জম্মু কাশ্মীর রিয়াসতের পতাকা এক হয়ে গেলো—অশোকস্তম্ভ শোভিত তেরঙা জাতীয় পতাকা। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে, ভারতের প্রেসিডেন্টের পতাকা রাজ্যপালদের পতাকা ও কাশ্মীর রিয়াসতের পতাকা আমাদের জাতীয় পতাকা থেকে আলাদা ছিল—হলুদ রং-এর।

এখন রাজভবনে রাজ্যপালের পতাকা সম্বন্ধে দু'একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করছি।

সেদিন ছিল নভেম্বর মাসের শীতের সন্ধ্যা। সাল ১৯৫৬। আটই আগস্ট। হঠাৎ বাংলার তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখার্জী রাজভবনে সন্ধ্যেবেলার স্টেনোকে ডিকটেসন দিতে দিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেই দিনই কলকাতার প্রথম কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে ইলেকট্রিক চুল্লীর উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন করেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায়। কলকাতার রাজভবন থেকে ডাঃ রায়ের কাছে কেওড়াতলা শ্মশানে জরুরী বার্তা গেলো রাজ্যপাল হরেন মুখার্জীর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার সংবাদ। কিন্তু ডাঃ রায় তাড়াতাড়ি রাজভবনে এসে দেখলেন হরেন্দ্রকুমার চিরনিদ্রায় শায়িত।

যাই হোক যা বলছিলাম তাই বলি। অর্থাৎ রাজ্যপালের ফ্ল্যাগের কথা। হরেন মুখার্জী মারা গেলেন। কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে কোনো প্রদেশের রাজ্যপাল হঠাৎ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রদেশের চীফ জাস্টিস্ অস্থায়ী রাজ্যপাল হবেন। এবং যত শীঘ্র হয় তাঁকে দিয়ে রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ করিয়ে নিতে হবে। কারণ ভারতের সংবিধানে আছে যে প্রদেশের রাজ্যপালের আসন কখনও খালি থাকবে না।

সে যাই হোক তখন কলকাতার হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ছিলেন শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী। তিনি অবিবাহিত। থাকতেন তাঁর ভাই বোনের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার ডোভার লেন অঞ্চলে। তখনই রাজভবন থেকে লোক ছুটলো শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর বাড়ীতে। তাদের জীপে রাজ্যপালের তখনকার সময়ের রাজভবনের নিজস্ব পতাকা

গেরুয়া রং এর এবং কিছু বাঁধা দড়ি। কারণ পরের দিন উষা লগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই যে অস্থায়ী রাজ্যপাল মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর উপরে ঐ পতাকা উড়াতে হবে। অস্থায়ী ভাবী রাজ্যপাল এখন ওখানেই আছেন।

রাজভবনের পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী মানিক মজুমদারের সঙ্গে রাজভবনের দু একজন পিওন ও মজদুর গেছে। হাতে তাদের রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকা ও একটি ছোটো খাটো বংশদণ্ড ও কিছু দড়ি। ফণিভূষণ কিন্তু কিছুতেই তাঁর ডোভার লেনের বাড়ীতে প্রথমে নিশান টাঙাতে দিতে রাজী হন নি। তিনি সাদাসিধে রাশভারী লোক। রাজভবনের পতাকা তাঁর বাড়ীতে টাঙানো হবে কেন? তার উপর তিনি তখনও রাজ্যপালের শপথ পর্যন্ত নেন নি। আচ্ছা ব্যাপার। একে তিনি কড়া মেজাজী লোক, বেশ গম্ভীর হয়ে রইলেন।

কিন্তু রাজভবনের কর্মচারী মানিক মজুমদার যখন অনেক অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বোঝালেন যে এই ফ্লাগ টাঙানো না টাঙানোর সঙ্গে তার নিজের ক্ষুদ্র রাজভবনের চাকরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করছে তখন অগত্যা ফণিভূষণ চক্রবর্তী সকালে তাঁর বাড়ীতে সেই পতাকা বা ফ্ল্যাগ টাঙাতে অনুমতি দিলেন। এর দু'একদিন পরেই অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণকে খোদ রাজভবনে এসে উঠতে হয়েছিল। তখন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ী থেকে রাজ্যপালের পতাকা সম্মানের সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে এসে রাজভবনের গম্বুজের উপর পত পত করে উড্ডীন করা হয়েছিল।

আর একবারের ঘটনা। এই সেদিন। রাজ্যপাল মিঃ ডায়াস ছাব্বিশ দিনের ছুটিতে কানাডা যাচ্ছেন ওটাওয়া শহরে ইনটারন্যাশনাল রিসার্চ সেণ্টারের সভায় যোগ দিতে, তাই বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজ্যের তখনকার চীফ্ জাষ্টিস শংকর প্রসাদ মিত্র। তিনি থাকেন তাঁর নিজস্ব বাড়ী দক্ষিণ কলকাতার কুপার স্ট্রীটে। মিঃ ডায়াস আটই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখ সকালে কলকাতার রাজভবন ছেড়ে কানাডা যাবেন সুতরাং রাজভবনের সেই বিশ্বস্ত কর্মচারী মানিক মজুমদার তার দলবলসহ রাজ্যপালের তখনকার অশোক চক্রমার্কা পতাকা বাঁশ দড়ি ইত্যাদি নিয়ে শ্রীযুক্ত শংকরপ্রসাদের বাড়ীতে উপস্থিত। সেই পুরানো আবদার রাজ্যপালের পতাকা টাঙানো ব্যাপার—যতদিন না তিনি স্বয়ং কলকাতার রাজভবনে উঠে যাচ্ছেন।

জাষ্টিস্ শংকরপ্রসাদ মিত্র মানিক মজুমদারের রাজ্যপালের পতাকা টাঙানো আইন সম্বন্ধে সব কিছু শুনে শেষে মৃদু হেসে বললেন—মিঃ মজুমদার আমিও তো একজন আইনজ্ঞ। রাজভবনের উপর রাজ্যপালের পতাকা টাঙানো থাকে তার অর্থ বাংলার রাজ্যপাল এখন কলকাতা মহানগরীতেই আছেন। এর তো বেশী নয়। সুতরাং আপনাদের রাজভবনের উপর পতাকা টাঙানো থাকলেই লোক বুঝবে যে বর্তমান অস্থায়ী রাজ্যপাল কলকাতাতেই আছেন। সুতরাং আমি আমার এই বাড়ীতেই থাকি বা লাটভবনেই থাকি কলকাতাতেই আছি। এই পতাকা টাঙানো নিয়ে কিছু আসে যায় না। আমার শপথ অনুষ্ঠান হলে পরে রাজভবনেই পতাকা

টাঙিয়ে দেবেন। লোকে নিশ্চয়ই বুঝবে শংকর প্রসাদ মিত্র কলকাতাতেই আছেন। ব্যস্।

রাজভবনের মানিক মজুমদার অস্থায়ী রাজ্যপাল মিঃ মিত্রর এই কথা শুনে একটু হেসে হাত কচলিয়ে শংকর প্রসাদকে বললেন—স্যার এই ছোট্ট কথাটি আমাকে এতদিন কেউ আপনার মতো সরল ভাবে বুঝিয়ে বলেনি তাই স্যার আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এতো দৌড়ঝাঁপ। যাক স্যার, সব কথা গিয়ে আমি আমার রাজভবনের সেক্রেটারী সাহেবকে বলছি। এই বলে তিনি তার লোকজন, পতাকা, বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি নিয়ে জীপে করে আবার রাজভবনে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

আর একবারের ঘটনা। মিঃ ডায়াস তো উনিশশো একাত্তর সালের ২১ শে আগস্ট রাজ্যপাল ধাওয়ানের জায়গায় পশ্চিমবাংলার নব নিযুক্ত রাজ্যপাল হয়ে এলেন। তিনি এর পূর্বে ছিলেন আগরতলার লেফটানেণ্ট গভর্ণর। তিনি কলকাতার রাজ্যপাল হয়ে এসেই রাজভবনে হুকুম জারি করলেন যে রাজভবনের গম্বুজের ফ্ল্যাগষ্টাণ্ডের ওপর সারারাত্রি লালবাতি জ্বলবে। তবেই লোক বুঝতে পারবে যে বাংলার লাট কলকাতায় আছেন। কারণ রাত্রে তো আর রাজ্যপালের পতাকা উড়ানো চলবে না।

এইরকম লালবাতির ব্যবস্থা প্রাক্তন এই আই-সি-এস্ গভর্ণর মিঃ ডায়াস নাকি আগরতলায় চালু করেছিলেন যখন তিনি সেখানকার রাজ্যপাল ছিলেন।

কিন্তু দু'চারদিন এই ব্যবস্থা কলকাতার রাজভবনে চলবার পরেই কেন জানিনা রাজভবনের গম্বুজে আর লালবাতি দেখা গেলো না। পরে অফিসে কানাঘুষো শুনলাম যে ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপাল, প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী ইত্যাদির বাসভবনে পতাকা টাঙানোর সুনির্দিষ্ট আইনকানুন আছে। এর বাইরে কেউ কখনও নতুন আইন আমদানি করতে পারেন না। আর সন্ধ্যার পর যখন পতাকা নামিয়ে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট আইন সুতরাং রাত্রে কলকাতায় স্বয়ং রাজ্যপাল আছেন কিনা দেশবাসীকে রাজভবনে লালবাতি জ্বালিয়ে বুঝাতে হবে না।

আর একবারের ঘটনা বলি। ঘটনা সব সময়েই ঘটনা থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে এমন সব কৌতুকাবহ মাল মশলা এসে পরে সে সেই সব ঘটনা শক্তিশালী লেখকের কলমের ডগায় অপরূপ কাহিনীর রূপ নেয়। এই প্রসংগে আমার মানসকল্পিত সাহিত্যগুরু শ্রদ্ধেয় শংকর এর কথা মনে পড়ে। তিনি যদি কলকাতার রাজভবনে নিছক দু'চার বৎসরও চাকরী করতেন তবে এখানকার কতো কথা কতো মজার কাহিনী লিখতে পারতেন—যেমন পারে দু'টি গাছের সবুজ পাতা ও বনের ধারের জংলা ফুল নিয়ে আমাদের রাজভবনের প্রাচীন মালীরা অপরূপ ফুলের তোড়া করতে। সেসব ফুলের তোড়া যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তারাই কেবল বলতে পারেন অধুনা বিশ্বের প্রচলিত জাপানী ফুলের ইকোবানা হতে সেগুলি কতো স্বতন্ত্র। কতো বিভিন্ন কতো অপরূপ।

এখন যে ঘটনা বলছি, সেদিন সকাল ১১-৩০ মিঃ হবে। উনিশশো বাহাত্তর সালের ১লা জুলাই। হঠাৎ আকাশবাণী কলকাতা থেকে মুহুর্মুহুঃ মুহুর্মুহুঃ সংবাদ প্রচার করা

হতে লাগলো যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায় হঠাৎ পরলোকগমন করেছেন। এই খবর রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হাজারে হাজারে লোক বেরিয়ে পড়লো। সবারই গন্তব্যস্থল ১নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট। ডাঃ বিধান চন্দ্রের বাড়ী। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত অফিসের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে দেওয়া হলো রাইটার্স বিল্ডিং এমন কি কেন্দ্রীয় অফিস গুলিতেও।

ব্যারাকপুর লাটবাগানে হয়তো খবরটা একটু আগেভাগেই পেঁছিয়ে ছিল। তখন সেখানকার গার্ডেন-ইন-চার্জ ছিলেন প্রণব সেন। তিনি বেশ পাকাপোক্ত লোক। তবে কখন যে কী করতে হয় তাঁর সে জ্ঞান একটু কম আছে। যাকে সাদা বাংলায় বলে উপস্থিত বুদ্ধি।

প্রণব সেন যেই ডাঃ রায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন তেমনি তরাক্ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে এক দৌড়ে ব্যারাকপুর লাট বাগানের ফ্ল্যাগষ্টাফ হাউসে এসে রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকা অর্ধনমিত করে নিজ হাতে ফ্ল্যাগষ্ট্যাণ্ডে টাঙিয়ে দিলেন। পতাকা অর্ধনমিত হয়ে পত্‌পত করে উড়তে লাগলো।

তারপর প্রণব সেন নিজের লাটবাগানের কোয়ার্টারে ফিরে এসে আবার ফেলে রাখা ভাতের থালায় খেতে বসলেন। খাঁটী বরিশালের লোক, ভাতের খুব ভক্ত। তখন তার দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর ধারায় অশ্রু ঝরছে। কারণ এই ডাক্তার রায়ের সময়েই প্রণব সেনের এই ব্যারাকপুর লাটবাগানে চাকরী জীবনের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

ভাত খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, হঠাৎ দু'জন ব্যারাকপুরের মিলিটারী অফিসার তাঁর কোয়ার্টারের সামনে এসে হাজির। কী? না? মিঃ প্রণব সেনের কী অধিকার আছে বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা স্বয়ং জীবিত থাকতে তিনি তাঁর নিজস্ব পতাকা হাফ মাষ্ট করেন। এ অধিকার কে তাঁকে দিল? সে কি হম্বিতম্বি মিলিটারী অফিসারদের।

প্রণব সেনকে মিলিটারী অফিসার দুজন নিজেদের ব্যারাকে ধরে নিয়ে গেলো। ব্যারাকপুর লাটবাগানের ভেতর ফ্ল্যাগষ্টাফ হাউসের পাশেই তাদের ব্যারাক। প্রণব সেন অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা করে সেখান থেকে ছাড়া পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এসেই ফ্ল্যাগষ্টাফের মাথা থেকে তখনকার রাজ্যপালের নিজস্ব পতাকা তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলে স্বগতোক্তি করলেন—খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রায়। লাটসাহেবের নিশানের এতো ঝামেলা! বাবুঃ বাঃ!

লাটবাড়ীর পায়রা-পিওন

কলকাতার রাজভবনে মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড কারখানা ঘটে যা কৌতুকাবহ। ভারি মজাদার। আর তার থেকে অনেক কিছু শেখাও যায় আর রসিক হলে রসও সংগ্রহ করা যায়, কেবলমাত্র শুধু যদি ক্ষুদ্র জিনিষকে দূরের থেকে বৃহৎ করে দেখবার অভ্যাস থাকে বা কল্পনা থাকে।

এই প্রসংগে মনে পড়ে রাজভবনের আমাদেরই সহকর্মী এক বন্ধুর বারে বারে বলা একটি লাইন। দলাদলিতে গভর্মেণ্টকে দোষ দেবার আগে ক্ষুদ্র করে নিজের অফিসের দলাদলি ও বাড়ীর লোকেদের অলিখিত দলাদলির কথা ভেবে দেখবেন। এই উক্তিকারক মিঃ দে পুরোপুরি যদিও মনে প্রাণে শাসক কংগ্রেসের সমর্থক। তবু নিজ-দলের দোষগুণ সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করতেন।

সে যাই হোক রাজভবনের মজার মজার কথা বলতে গেলে অনেক কথা মনে এসে যায়।

যেমন রাজভবনে লাটসাহেবদের প্রিয় কুকুরের মৃত্যুর কথা যায় তার সঙ্গে তাদের জাঁকজমক পূর্ণ সমাধিস্থ করার কথা, রাজভবনের সিংহাসন রুম থেকে ঐতিহাসিক সিংহাসনের রুপোর পাত চুরির কথা, রাজ্যপাল কাটজু সাহেবের সখের বেড়ালের অন্তর্ধানের কথা, রাজভবনের ঐতিহাসিক সাহেব ভূতের কথা, রাজভবনের পুকুরের মাছ চুরির কথা। প্রভৃতি।

এর অনেকগুলির ঘটনার দিন ও তারিখ এই দিনপঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার যে ঘটনা ঘটলো রাজভবনে সেটা প্রায়ই প্রাগৈতিহাসিক সমতুল্য। তাই মনে মনে খুব আনন্দ পেলাম এবং কাব্যিকগুণে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের হুবহু রকমফের নকল বলে এখানে তাই লিপিবদ্ধ করছি।

বেশ কিছুদিন ধরে অর্থাৎ উনিশশো চুয়াত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক থেকে এই রাজ্যে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের চিঠি বিলি ব্যবস্থা নিয়ে ভীষণ গণ্ডগোল চলছিল। প্রায়ই কাগজে সংবাদ বেরুতে লাগলো কলকাতায় কেউ কারও চিঠি পাচ্ছে না। বিদেশের চিঠি কলকাতায় যা আসছে তারও বিলি ব্যবস্থা হচ্ছে না ঠিকমতো।

কাগজে কাগজে প্রতিদিন ছবি ছাপা হচ্ছে আনডেলিভারড পোস্টাল মেল ব্যাগের ছবি। পোস্টালম্যানেরা যায় পোস্ট অফিসের সমস্ত কর্মচারী নিয়ম মাফিক কাজ করছেন। দাবী ওভার টাইম। তা কিছুতেই কমানো চলবে না। একে তারা কম বেতনের সরকারী কর্মচারী তার ওপর বাজারে জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। সুতরাং ওভার টাইম কাটলে চলবে না। না হলে নিয়ম মাফিক কাজ। যার ফল হাজারে হাজারে চিঠি আনডেলিভারড। মেলব্যাগবন্দী।

আবার তার মাঝে খবরের কাগজে মাঝে মাঝেই বেরুতে লাগলো অমুক পুকুরে স্নান করতে গিয়ে অমুক ব্যক্তি কতগুলি জীবন্ত চিঠি ভেসে বেড়াতে দেখেছে, কলকাতার অমুক গঙ্গার ঘাটে এতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে। ইত্যাদি।

এইসব খবর শুনে দিল্লীর পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বাঘা বাঘা অফিসারেরা কলকাতায় এলেন ছুটে। অনেক অফিসিয়াল আন অফিসিয়াল মিটিং করলেন। রাজ্যপালের সঙ্গে বোধহয় দেখাও করলেন। ফল কিন্তু কিছু হলো না।

এরপর হঠাৎ অফিসে শুনতে পেলাম রাজ্যপাল ডায়াস রাজভবন থেকে-পায়রা উড়াবেন। এয়ার সারভিসও এর সঙ্গে যুক্ত। পায়রার পায়ে বাঁধা থাকবে চিঠি।

খবরটা খবরের কাগজেও বেরুলো চৌঠা ডিসেম্বর। অফিসের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুনতে লাগলাম, জানেন মশায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা অতো বোকা ছিল না তারা জানতো সাবেকি জিনিসের একবার না একবার দরকার পড়বেই—তা যতই সায়েন্সের উন্নতি হোক না কেন। প্রকৃতির সঙ্গে চালাকি। প্রকৃতির সম্পদ একদিন না একদিন নিঃশেষ হবেই। তখন আবার সাবেকি জিনিস। পেট্রল, কয়লা, কাঠ দুনিয়াতে কতদিন থাকবে যে এরোপ্লেনে বা রেলগাড়ীতে চিঠি চলাচল করবে। তা ছাড়া সিক্রেট বলেও তো একটা জিনিস আছে। আজকাল যে রকম কনফিডেনসিয়াল চিঠি ও ফোন টামপারিং হচ্ছে।

আর একজন কাব্যিক সহকর্মী আরও একটু রসিকতা করে বলে উঠলেন, আরে মশায় কবিরা হন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। না হলে কালিদাস কখনো মেঘের ভেলায় প্রিয়াকে প্রেমপত্র পাঠাতেন। গরুর গাড়ীতে পাঠালে চলতো না? তখনও তো গরুর গাড়ী দেশে ছিল। সিক্রেট বলেই তো।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম ওটা তো কাল্পনিক কাব্য মশায়। সহকর্মী প্রচণ্ডভাবে অফিস ডেস্কে থাপ্পর মেরে বললেন, না মশায় কবি কালিদাস অতো ন্যাকা ছিলেন না। নিশ্চয়ই অলকা বলে হিমালয়ের দিকে কোনো গুপ্তস্থানে কবি কালিদাসের সজীব প্রিয়া ছিলই ছিল। আমি আর তার কথায় হবে বা না কিছুই বলতে পারলাম না। কারণ ঐ কাব্যিক আমার সহকর্মীটির ফিটের ব্যারাম এমনিতেই ও ভীষণ বদমেজাজি।

দিনদুয়েক পরে অর্থাৎ ছয়ই ডিসেম্বর শুক্রবার উনিশশ চুয়াত্তর সাল সকাল ৮-৩০ মিনিটে কলকাতার রাজভবনের ইস্ট লন থেকে রাজ্যপাল ডায়াস চিঠি সমেত পায়রা উড়ালেন।

পরের দিন খবরের কাগজে রাজ্যপালের ছবিশুদ্ধ পায়রা উড়ানোর ছবি বেরুলো। ছবিতে লেখা আছে—"যাও পাখি বলো তারে :—শুক্রবার সকালে রাজভবনে, রাজ্যপাল বিমান ডাকটিকিটের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন পায়রা উড়িয়ে। চিঠি বেঁধে পায়রা রাজভবন থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট ডাকঘরে যায় পাঁচ মিনিটে"

আর যায় কোথায়। আমার রাজভবনের কাব্যিক সহকর্মীটি পরের দিনই নিজে লিখে একটা কবিতা এনে হাজির অফিসে—

পুরাকালে কালিদাস
আর এ কালের ডায়াস
সমান সমান তারা বিরহের দাস
অলকা কোথায় আজ—
কোথায় সে রামগিরি—
কোথায় কাঁদিছে একা—
সে বিরহিনী যক্ষিণী নারী।—
কে বলে তাহার দিশা
নাই আর দেশে,
রাজ্যপাল ডায়াস তা জানেন
কালিদাসের বেশে।

ফিস ফিস করে আমার কানের কাছে আরও সে বললো একেই বলে আমাগো বাঙ্গাল দ্যাশে ঝি-কে ম্যাইরা বউকে শ্যাখান—দ্যাখবেন এইবার পোস্টাল ড্যালিভারি চক্করের মতো চলিতেছে। হুঃ।

কলকাতার রাজভবন
ও
তার ঐতিহাসিক অয়েল পেন্টিং

কলকাতা রাজভবনের পুরাতন দামী দামী মহামূল্যবান তৈলচিত্র বা নানা ধরণের ছবির সম্বন্ধে অনেকে আমার 'কলকাতা রাজভবনের অন্দর মহল' বইটী পড়ে দীর্ঘ চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন।

তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কলকাতার রাজভবনে এমন সব মহামূল্যবান ছবি ছিল যা ভারতের অন্য কোন রাজভবনে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের একক মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহে দেখা যাবে না। বা কোনো রাজকীয় সংগ্রহশালায় বা আর্ট গ্যালারিতেও তা দেখা যাবে না। কলকাতা রাজভবনের দীর্ঘদিনের চাকরীতে আমার তো তাই মনে হয়েছে।

স্বাধীনতার পরও দেখেছি কলকাতার রাজভবনের প্রশস্ত দেয়ালে দেয়ালে এগুলি সযত্নে টাঙ্গানো থাকতো।

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মজা তেসরা নভেম্বর উনিশশো ছাপান্ন সালে প্রয়াত রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমারের জায়গায় রাজ্যপাল হয়ে এসেই রাজভবনে দেয়ালে টাঙ্গানো প্রায় প্রতিটি ঐ মহামূল্যবান ছবি নামিয়ে রাজভবনের মেন বিল্ডিং-এর সামনে গ্রান্ড ষ্টেয়ার কেসের নীচে অন্ধকার গুদামে ঐ গুলি স্থানান্তরিত করান—তাঁর যুক্তি এগুলি ইংরেজ গুণকীর্তন মার্কা। দ্বিতীয়ত রাজভবনের বড় বড় ঘর এরা মৌরষিপাট্টা করে জুড়ে আছে।

গুদামে সেখানে দামী দামী ছবিগুলি অযত্নে ও অবহেলায় শিল্পীর পুনরুদ্ধারের এমন অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকে যে তা আর কালের যাত্রার সঙ্গেও সমপদে কোনোদিনই এগিয়ে চলবে না। সেগুলি ঐ অন্ধকার গুদামে অবহেলায় অযত্নে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

সেই সব ছবির অমর ইংরেজ শিল্পীদের আত্মা কলকাতার রাজভবনের দেয়ালে দেয়ালে যেন কেঁদে বেরিয়েছে—আমাদের বাঁচতে দাও। তোমাদের দেশ স্বাধীন হোক কিন্তু আমাদের মনের কল্পনাকে এমন ভাবে নষ্ট হতে দিও না। তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ইতিহাস তোমাদের অভিসম্পাত দেবে।...

এই সেদিনও উনিশশো বাহাত্তর সালে কোন এক বিখ্যাত দিল্লীর শিল্পী রাজভবনে এসে ষ্টেয়ার কেসের গুদামে ছবিগুলির সাম্প্রতিক হাল দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন—এ কি করেছে এরা। এ তো মার্ডারের মতো দেখছি অপরাধ।...

তবে ভাগ্যের কথা শ্রীমতী পদ্মজা যখন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল পদে প্রায় তাঁর কার্যকালের শেষ সীমায়, তখন এই বাংলার কয়েকজন গুণী লোক শ্রীমতী

পন্মজার কাছ থেকে রাজভবনের গুদামে অযত্নে রক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে কিছু ছবি চেয়ে নেন বা তাঁদেরকে বিলিয়ে দেওয়া হয়, যাই বলা হোক না কেন।

কিন্তু বাংলার ঐতিহাসিক রাজভবনে রক্ষিত ঐ ছবিগুলি রাজভবনে শোভা পেলেই মনে হয় বেশী মর্যাদাসম্পন্ন হতো।

লেডী রানু মুখার্জি তাঁর একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর জন্য যে পঁয়ষট্টিটি ছবি বেছে বেছে—রাজভবনের ঐ অন্ধকার গুদাম থেকে নিয়ে যান তার মধ্যে এই সুন্দর ছবিগুলিও আছে—সেণ্টপল্স ক্যাথিড্রালের ছবি ; রঙিন লিথো 'মাদার এণ্ড চাইল্ড ; এ ভিউ অফ এডিনবার্গ ক্যাসেল ১৯৩৮; আর্ট প্রিণ্টিং অব 'দি ডে অফ ওয়েডিং, রঙিন ছবি 'এ ভিউ অব লণ্ডন ফরম্ ল্যামবাথ,—১৭৯৫ ; রঙিন ছবি 'লেডী উইফ্ ফ্যান ১৬৪৯ ; রঙিন ছবি 'ক্রাইষ্ট ইন্ দি হাউস্ অফ মারথা—দি ন্যাশনাল গ্যালারী লণ্ডন ১৬১৭ ; 'এ ভিউ অফ ডিয়ার ইন দি জংগল ; প্রভৃতি।

১নং পার্ক ষ্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তেরোটী ছবি নিয়ে যাওয়া হয়।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভিউ অফ এ পার্ট অফ চৌরঙ্গী ; 'জেনারল ভিউ অব ক্যালকাটা ; 'ফ্রম দি এন্ট্রেন্স' টু দি ওয়াটার গেট অব ফোর্ট উইলিয়াম, 'প্রোসেশান অব চরকপুজো' ; এ ষ্টাচু অফ দি মারকুইস্ অব হেষ্টিংস ইন্ ট্যাংক স্কোয়ার (লালদিঘী) ; সেণ্ট পল ক্যাথিড্রাল ক্যালকাটা ; 'অ্যান ওল্ড ভিউ বিফোর দি আরথ কোয়েক ১৯৩৪ ; 'এ ভিউ অফ এসপ্ল্যানেড উইথ দি ভিউ অফ গভর্মেণ্ট হাউস—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিউরেটার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল যে তেরোটি ছবি রাজভবন থেকে নিয়ে যান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'অয়েল পেণ্টিং অফ লর্ড মেয়ো—লাইং হন ষ্টেট ; 'অয়েল পেণ্টিং অফ ওয়ারেন হেষ্টিংস ; 'অয়েল পেণ্টিং অব লেডী মাউণ্টবেটেন ; 'অয়েল পেণ্টিং অব কিং জর্জ ফিফথ ; রঙীন ছবি করোনেশন প্রসেশন অফ দেয়ার ম্যাজেষ্টি কিং জর্জ সিক্সথ্ এণ্ড কুইন এলিজাবেথ ; মিটিং অফ লর্ড ক্লাইভ অ্যাণ্ড নবাব মিরজাফর টু ডেস্ আফটার দি ব্যাটল অব পলাশী, প্রভৃতি।

এখানে মিটিং অব লর্ড ক্লাইভ অ্যাণ্ড নবাব মিরজাফর টু ডেস্ আফটার দি ব্যাটল অব পলাশী ছবিটি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

আমার কেন যেন মনে হতো এ ছবিটি দেখে, যখন এটা রাজভবনের থ্রোন রুমে টাঙানো থাকতো, যে এই ছবিটাই বোধ হয় সমস্ত রাজভবনের মধ্যে সবচেয়ে দামী ঐতিহাসিক ছবি। ১৭৫৭ সালের ২৫শে জুন পলাশীর যুদ্ধের দু'দিন পরে চক্রান্তদর্পী মিরজাফরের মুখের চেহারাটা এমনি হওয়া উচিৎ আর শঠতা বিশারদ লর্ড ক্লাইভ ঠিক যেন নিজের মনের গোপন রহস্য তার মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। সার্থক যে শিল্পী এটা এঁকেছেন।

আমি কতোবার যে, আমার রাজভবনের বিজড়িত ত্রিশ বছরের জীবনে, এ ছবির প্রতি অপাংগে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

আমার তখনকার সহকর্মী অনেক বন্ধু বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন আমি প্রায়ই এ ছবির কাছে আসি ?

আমি নীরবে তাদের কথার উত্তর এড়িয়ে গেছি।—কারণ এ ছবির ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস। কোনো কবি সাহিত্যিক বা মহিয়ান বক্তা যে কাজ হাজার পৃষ্ঠার লেখায় বক্তৃতায় ফুটাতে পারতেন যা তা কোন এক নাম না জানা বিদেশী শিল্পী কেমন সুন্দরভাবে তা ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এখনও আমার এই বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মাঝেই কেবলমাত্র ঐ ছবিটি দেখতেই আমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এ যাই। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজোউদ্দৌলার আত্মাকে যেন ছবিটার ধারে কাছে মিরজাফরের সেদিনের বেইমানিতে কাঁদতে শুনি। আমারও চোখ জলে ভরে যায়, কারণ আমি তো সিরাজের জন্মভূমির লোক। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর আমার জন্মভূমি।

এ ছাড়াও কিছু মূল্যবান রাজভবনের পুরানো দামী ছবি শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সময়ে দিল্লীতে ন্যাশনাল গ্যালারী অব মর্ডান আর্টস'-এ নিয়ে যাওয়া হয়। যে কতগুলি পুরানো ইংরেজ আমলের বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি দিল্লীতে ঐ সংস্থায় পাচার করা হয় তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—'অয়েল পেণ্টিং অফ দি তাজমহল অফ আগ্রা' 'পোর্টরেট অফ লেডী ইলিয়েণ্ট, 'হিন্দুমঠ ইন দি চিৎপুর বাজার, ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এখানে বোধহয় বলা অপ্রাসংগিক হবে না শ্রীমতী পদ্মজার আগের লাট প্রাতঃ—স্মরণীয় হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সময় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী এই বাংলার লাটভবন থেকে বেশ কয়েকটি দুশো সালাবু ঝাড় ও কয়েকটি এইসব অমূল্য ছবি তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার ভাই পণ্ডিত জওহরলালের তখনকার বাসস্থান দিল্লীর ত্রিমূর্ত্তি ভবনে নেবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তখনকার বাংলার লাট হরেন্দ্রকুমারের তীব্র বাধায় তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

এখনও রাজভবনের অন্ধকার ষ্টেয়ার কেসের তলায় গুদামে বহু মূল্যবান ওয়েল পেণ্টিং ও ফ্রেমে বাঁধানো ছবি কালের অমোঘ নিষ্ঠুর কশাঘাতেও অনেক দেশী রাজ্যপালদের নিষ্করুণ অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে বা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

রাজভবনের জনকয়েক শিল্পীমনা সামান্য কর্মচারীদের মধ্যে সে ছবিগুলিকে বাঁচাবার জন্য হাহাকারের অন্ত নেই। যখনই কোনো জরুরী কাজকর্মে রাজভবনের গ্রাণ্ড ষ্টেয়ার কেসের সেই বিখ্যাত সিঁড়ীর নীচের অন্ধকার গুদাম ঘরটি খোলা হয় তখনই কিছু সংবেদনশীল রাজভবনের কর্মচারী সেই অন্ধকার গুদামের মধ্যে ঢুকে ছবিগুলিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখে ছবিগুলি তখনও পুনরুদ্ধারের যোগ্য আছে কি না? না ড্যাম্প ও উঁয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

এই প্রসংগে একটি অশ্রুতপূর্ব অশ্রুসজল ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে [এর আগে আমি 'কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল'-এ রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার সম্বন্ধে বলেছি যে তিনি এই রাজভবনের কর্মচারীদের সামনে নানা অনুষ্ঠানে বেশ জোরের

করেক বারই বলেছেন যে বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা মরে গেছি বা পিছিয়ে পড়েছি এটা কিন্তু আসল ঘটনা নয়, এটা হিংসা পরায়ণ কতিপয় ভিন্ন প্রদেশী ভারতবাসীর মুখরোচক ঘটনা। তিনি বলতেন এই তো সেদিনও আমার ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ সারা ভারতবর্ষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে বাঙ্গালী এখনও মরে নি, বাঙ্গালীর পৃথিবীর মানুষকে দেবার এখনও অনেক কিছু আছে। তিনি প্রায় বলতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষের নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না সে যত চেষ্টাই হোক বা যেমন ভাবেই হোক। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই প্রসংগে মনে পড়ে সর্ব বিষয়ে সদা নিয়মনিষ্ঠ ও মিতব্যয়ী রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমারের কলকাতা রাজভবনের রাজ্যপাল হিসেবে পা দেবার পরই হয়তো মনে হয়েছিল যে স্বাধীন ভারতবর্ষ এই সর্বপুরান কলকাতার রাজভবনে স্বাধীনতার মহাজাগ্রিক নেতাজী সুভাষের কেন ছবি থাকবে না ? এই অমার্জনীয় সত্যলংঘন জাতির পক্ষে মহা পাপ। তিনি ছিলেন মহাতপস্বী জ্ঞানসাধক। চিরজীবন জ্ঞানের চর্চা করে গেছেন। তিনি জানতেন কারও বাড়ীতে কোনো ছবি বা মূর্তি রাখা মানে সেই ছবি বা মূর্তির আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য—ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য নয়। যদিও এর উলটোটাই দেখা যায় আজকাল ঘরে ঘরে।

তাই যে দেশ প্রায় দুশো বছরের পর সদ্য স্বাধীনতা পেল এবং যে স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক নেতাজী সুভাষ তাঁর ছবি যদি এই বৃটিশ নির্মিত ভারতবর্ষের আদি রাজভবনে না শোভা পায় তবে কোথায় পাবে। তাঁর হয়তো জানা ছিল যে স্বাধীন ভারতের কোন মিলিটারী ক্যাম্পে নেতাজী সুভাষের ছবি টাঙানো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অহিংসবাদী গান্ধী অনুসারী বেশ কিছু নেতাদের এন পছন্দ নয়। শোনা যায় সেই রকম ফরমানও নাকি জারি আছে অলিখিত ভাবে আমাদের শাসনতন্ত্রে। সত্যি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস। দুর্দ্ধর্ষ মহাপরাক্রমশালী আলেকজাণ্ডারের তথাকথিত সেই শ্লেষাত্মক বাণী আমাদের দেশ সম্বন্ধে এখনও এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে অবিশ্বাস্যভাবে সচল।

যে বীর সুভাষ নিজের জীবন তুচ্ছ করে সুদূর ভিনদেশে নানাভাবে আত্মগোপন করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সময়ে তদানীন্তন পরাক্রমশালী বৃটিশের হাত থেকে ভারতের জনজীবনকে পরাধীনতার মুক্তিপাশ হতে নিষ্ক্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, যে বৃটিশ ও তাদের প্রাণের দোস্ত আমেরিকা ও পশ্চিমী জাতিগুলির মনের গোপনে মহাক্ষোভ ছিল যে নেতাজী সুভাষই ভারতের স্বাধীনতাকে এতো এগিয়ে নিয়ে গেছে স্বাধীন আজাদ বাহিনীর অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতায়, তার ছবি এই কলকাতার রাজভবনে নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিরাট ভাবে আঁকিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার।

সেদিনের কথা ও তারিখটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—১লা জানুয়ারী, ১৯৫২ সাল।

দেশ সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা পাবার পরেও

গোটা দুই রাজ্যপাল অর্থাৎ প্রথম রাজ্যপাল রাজা গোপালাচারী ও দ্বিতীয় রাজ্যপাল কাটজু কলকাতার রাজভবনে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু অনেক নেতার ছবি যথা গান্ধীজী, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদির সমুজ্জ্বল ফটো বা ছবি কলকাতার রাজভবনে টাঙানো হলেও তাঁদের সময় কিন্তু ঐ দু'জনের একজনের একবারও মনে আসে নি নেতাজী সুভাষের ছবির কথা বা হয়তো তাঁর দেশ গৌরবের কথা। মনে পড়লেও কেন যে তাঁরা সুভাষকে কলকাতার রাজভবনের পাদপীঠে আনেন নি, তা আমার এখনও অজানা রয়ে গেছে।

আমি কিন্তু অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যখন উনিশশো বাহান্ন সালের ১লা জানুয়ারী দেখতে পেলাম যে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসুকে দিয়ে হরেন্দ্র কুমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হতে নেতাজীর একটি পূর্ণাবয়ব ধুতি চাদর পরা দীর্ঘ অয়েল পেণ্টিং আঁকিয়ে নিয়ে সেটা রাজভবনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক থ্রোন রুমের খোদ থ্রোনের উপর রেখে দিলেন।

হরেন্দ্রকুমার 'কলকাতার রাজভবনে' রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন পয়লা নভেম্বর উনিশশো একান্ন। তার প্রায় মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁর প্রথম কাজ হল কলকাতার রাজভবনে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব ধুতি চাদর পরিহিত একটি বিরাট অয়েল পেণ্টিং করানো।

বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে তখনকার রাজভবনে দেখেছি ভূরি ভূরি ইংরাজ লাট বেলাটের বিলাতের আঁকা এই-স্না বড় বড় দেয়াল জোড়া অয়েল পেণ্টিং। গান্ধীজী বা আরও কয়েক জন আমাদের দেশীয় নেতাদেরও দু'একখানা ছবি রাজভবনে টাঙানো দেখেছি কিন্তু সেখানে নেতাজী সুভাষ অনুপস্থিত।

তাই বোধহয় হরেন্দ্রকুমারের সজাগ দৃষ্টি আমাদের এই ইচ্ছাকৃত ফাঁককে রাজভবনের মাটিতে রাজ্যপাল হয়ে পা দিয়েই ধরে ফেলেছিলেন। তিনি রাজভবনে সুভাষকে ছবিতে নিজের মতো বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরেই এনেছিলেন। আনেন নি মিলিটারী পোষাকের বহিরাবরণে আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী হিসেবে।

কতোবার লক্ষ্য করেছি হরেন্দ্রকুমার দেশগৌরব এই সুভাষের ছবির দিকে একাগ্র-মনে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করে সাধারণত তারপর হয় তো বা অন্যান্য স্যুইটে কোনো ভি-আই-পির সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।

কিন্তু হায়! হরেন্দ্রকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর তেসরা নভেম্বর উনিশশো ছাপান্ন সালে শ্রীমতী পদ্মজা স্থায়ীভাবে বাংলার রাজ্যপাল হয়ে এসেই কলকাতা রাজভবনের অনেক কিছু বদলিয়ে দিলেন।

এবং ভাগ্যের কী পরিহাস যে নেতাজীর ছবিটাই তাঁর আদেশে স্বস্থানচ্যুত হয়ে প্রথমে উত্তর দিকের নির্জন স্টেয়ার কেসের একটি দেয়ালে এবং দিন কয়েক পরেই রাজভবনের অন্ধকার গুদাম ঘরে স্থানান্তরিত হলো।

কলকাতার রাজভবনে এলো প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন

পোজের ছবি। এলো গান্ধীজীর নানা ছবি। এলো সরোজিনী নাইডুর বিভিন্ন পোজের ছবি।

কলকাতার রাজভবন তখন সরগরম শ্রীমতী পদ্মজার দাপটে।

জওহরলাল নাকি বলেছেন কলকাতার রাজভবনকে আধুনিক ধাঁচে সাজাতে। সত্যিই নাকি দিল্লীতে কলকাতার কোন এক মহল থেকে কনফেডিনসিয়াল রিপোর্ট পেঁাছেছে যে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার গরীব দেশবাসীর টাকা নয় ছয় করে খরচ না করে কলকাতা রাজভবনকে গন্ধা-গন্ধা-গন্ধা অর্থাৎ অপরিষ্কার করে রেখেছেন।

শ্রীমতী পদ্মজা কলকাতার রাজভবনে তেসরা নভেম্বর উনিশশো ছাপান্ন সালে পা দিয়েই একটু এদিক-ওদিক রাজভবনের ঘুরেই মুখে বলতে লাগলেন গন্ধা-গন্ধা-গন্ধা অর্থাৎ কলকাতার রাজভবন নোংরা, নোংরা-নোংরা।

জানিনা তারই ফলশ্রুতির অন্যতম কারণ কিনা সুভাষের অতো বড় অয়েল পেন্টিং গুদামে স্থানান্তরিত। যদিও এখানে না বলা অন্যায় হবে যে শ্রীমতী পদ্মজা সেই সময় কলকাতা রাজভবনের অনেক দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক ফারনিচার, ছবি, মারবেল টপ টেবিল, আয়না, কার্পেট, ইত্যাদি জলের দরে অকসান বা নিলামে বিক্রী করে দিয়েছেন, যা হয়তো কলকাতার রাজভবনে থাকলে ভবিষ্যৎ দেশীয় ঐতিহাসিকদের মহামূল্যবান গবেষণার খোরাক যোগাতো, কারণ ইংরেজেরা এই কলকাতার রাজভবন বা গভর্মেণ্ট হাউস থেকেই সারা ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিল। এবং ১৯১১ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত এই কলকাতার রাজভবনেই ছিল ভারতের গভর্ণর জেনারেলের বাড়ী এবং কলকাতাই ছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী।

সে যাই হোক। ভাগ্যের কী দারুণ পরিহাস যে এই বাংলার লাট শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু জীবনে হয়তো কল্পনাও করতে পারেন নি স্বপ্নেও যে বাংলার রাজ্যপালের ভূমিকায় ভবিষ্যতে কখনও তাঁকে এই কলকাতার রাজভবনেই এমন এক মহা ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

শ্রীমতী পদ্মজা তাঁর অভিরুচী অনুযায়ী কলকাতার রাজভবনকে সাফসুতরো করে বেশ ঝকমকে করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন। রাজভবনের অনেক ইংরেজ গভর্ণর জেনারেলের ছবির লটে সুভাষের ঐ ঐতিহাসিক ছবিও রাজভবনের ষ্টের র-কেসের নীচেকার অন্ধকার গুদামে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই সব সরে যাওয়া ছবির দেয়ালে নূতন নূতন পোজের নেহেরু, গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু, ইত্যাদির ছবি সাজানো হল।

পদ্মজা বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে পার করে দিয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতমা ভি-আই-পি রাণী এলিজাবেথকে এই কলকাতার রাজভবনে ষাটের দশকের প্রথমে অত্যন্ত আপ্যায়ন সহকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলকাতার রাজভবন দেখিয়ে। তাঁর সময়ে আরও পশ্চিম দুনিয়ার অনেক ভি-আই-পি এসেছে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের দিল্লী পরিক্রমা শেষে এই কলকাতার রূপসী রাজভবনে। এসেছে চীনের প্রধানমন্ত্রী

চৌ-এন-লাই, এসেছে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট শাস্ত্রীমৎ জো জো প্রভৃতিরা।

জানিনা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো নিশ্চয়ই লুক্কায়িত সঙ্গোপনে কল্পনা করেছেন সুভাষ চন্দ্র বোসের ছবি কলকাতার রাজভবনে দেখবেন। কিন্তু তাঁদের সকলের মনের ইচ্ছা মনের গোপনেই রয়ে গেছে।

কারণ যস্মিন দেশে যদাচার—তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের ভারতবর্ষে জওহরলালের ছবিই প্রাধান্য পাবে। এটা ধ্রুব সত্য সাম্প্রতিক ভারতে প্রাধান্য পাচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাঁর পরলোকগতা মা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছবি। কিন্তু একেবারে সুভাষ চোখের অন্তরালে চলে যাবে এ হয়তো তখনকার দিনের কোনো কোনো ভ্রাম্যমান আন্তর্জাতিক নেতা বা ভি-আই-পিরা কল্পনাও করতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক কিছুটা আগে আমার এক সাচ্চা ইংরেজ সেনানীর সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার কোন বড়লোক বন্ধুর বাড়ীতে তখনকার যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট করনেল সেই সেনানীটি অকপটে স্বীকার করেছিল—we regard Subhas Bose deeply. আর একবার আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর মুখে এও শুনেছিলাম, জানিনা কথাটা সত্য কি মিথ্যা, যে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী যার সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তিনি যখন পঞ্চাশের দশকে সস্ত্রীক প্রতি বছর একবার করে বার্মার রেঙ্গুন শহরে আসতেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁদের মৃত পুত্রের সমাধিতে ফুলস্তবক অর্পণ করতে, তখন নাকি মিঃ এটলী কলকাতার কোন এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্তি করেছিলেন—It is I N A and Subhas Bose which made us to think how to make India free.

কলকাতার রাজভবনে কিন্তু পালে বাঘ পড়লো ঠিক ষাটের দশকের প্রথমার্ধে যখন নেতাজী কন্যা কুমারী অনিতা বোস দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে নিজের পিতৃভূমি কলকাতায় পদার্পণ করলেন। উঠেছিলেন তিনি এলগিন রোডের ঐতিহাসিক পিতৃভবনে।

কিন্তু তখনও বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা হয়তো ভাবতেও পারেন নি যে অনিতা স্বয়ং বাংলার লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে চাইবেন। একেই বলে ভবিতব্য···

শ্রীমতী অনিতা বোস কলকাতা ছেড়ে যাবার দিন দুয়েক পূর্বে হঠাৎ তখনকার বাংলার লাট পদ্মজার সঙ্গে দেখা করলেন। এবং শ্রীমতী পদ্মজাও তখন তা মঞ্জুর করলেন। কারণ যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল অনিতার সঙ্গে দেখা করেছেন ও ডিনারে ডেকেছেন সেখানে শ্রীমতী পদ্মজাকে অনিতাকেই ডাকতে হল।

অনিতা ঠিক সেদিন বেলা দশটার সময় কলকাতার রাজভবনে এলেন রাজভবনেরই পাঠানো গাড়ীতে চড়ে। বাংলার রাজ্যপাল পদ্মজা হাসি হাসি মুখে শ্রীমতী অনিতা

বোসকে ঘুরে ঘুরে কলকাতা রাজভবনের নানা স্যুইট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছেন। অনেকের মধ্যে তাদের সঙ্গে ঘুরছেন তখনকার রাজ্যপালের খাশ সেক্রেটারী শ্রীপিনাকী রঞ্জন সিন্‌হা এবং পদ্মজার ছোটবোন লীলাময়ী নাইডু।

হঠাৎ রাজভবনের দোতালার থ্রোনরুমে রুপোর বিরাট সিংহাসন, যেখানে রাজ্যপালদের শপথ নেওয়ানো হয়, সেখানে শ্রীমতী অনিতা রাজ্যপাল পদ্মজাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর বাবার ছবি তো এই রাজভবনে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। (এখানে বলা দরকার হরেন্দ্রকুমার সুভাষের বিরাট অয়েল পেণ্টিং, যা পূর্বে বলা হয়েছে, তা আঁকিয়ে রাজভবনের এই ঐতিহাসিক রুপোর সিংহাসনেরই উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, পরে পদ্মজা এটাকে সরিয়ে দেন)

শ্রীমতী পদ্মজার তখন হুঁস হয়েছে। তিনি তাঁর সেক্রেটারী মিঃ পিনাকী রঞ্জন সিন্‌হাকে একান্তে ডেকে তাড়াতাড়ি নেতাজীর ছবিটা ষ্টেয়ার কেসের গুদামঘর থেকে এনে রাজভবনের কোন দেয়ালে টাঙাতে বললেন। তিনি একটু আগিয়ে গিয়ে পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিতাকে বললেন রাজভবনে তাঁর পিতার ছবি আছে। পরে তিনি তা ওঁকে দেখাবেন।

এদিকে সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, লিফটম্যান, বেয়ারা সব ছোটাছুটি আরম্ভ করেছে রাজভবনের তখনকার ফার্নিচার সুপারভাইজার গোপীমোহন খামারুকে পাকড়াও করে কোনোমতে ধুলোধুসরিত নেতাজীর ছবিটা গুদাম ঘর থেকে কোনোক্রমে বের করে এনে রাজভবনের দোতালার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের বারন্দার এক থামের পাশে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো—তাও আবার পেরেকবিহীন না টাঙানো অবস্থায়।

এদিকে অনিতা ও রাজ্যপাল পদ্মজা রাজভবনের বিস্তীর্ণ বাগান ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে আবার রাজ্যপালের সেক্রেটারী ও লোকজনেরা যেখানে কাড়িডোরে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে পেঁছলেন আর শ্রীমতী পদ্মজা অনিতাকে হাসি হাসি মুখে সুভাষের বিরাট অয়েল পেণ্টিংটী দেখিয়ে দিলেন।

কন্যা অনিতা অপলক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ পিতার ঐ ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে বাঙ্গালী কল্যাণময়ী পিতৃহারা মেয়ের মতো সজল নয়নে মাথানত করে দু'হাত তুলে বাবাকে প্রণাম করলো।

কলকাতার রাজভবনের গুটিকয়েক কর্মচারী ছাড়া আর কেউই এ দৃশ্য দেখতেই পেল না।

কেউ জানতেও পারলো না আজ সমস্ত বাঙালী জাতি কতো বড় একটা অপমান অসম্মানের হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পেয়ে গেল।

* * * *

এই তো সেদিন ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮৭ পিতার ৯০ তম জন্ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে জার্মানির আসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক স্বামী মার্টিনের সঙ্গে ঐ

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা তিন সন্তানের জননী অনিতা বসু কলকাতায় এসেছিলেন।

কোন এক চতুর সাংবাদিক ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার বাবাকে (নেতাজীকে) প্রাপ্য স্বীকৃতি দেয় নি। এতে কী তাঁর কোন ক্ষোভ আছে? "দেবে কেন; সম্পূর্ণ ভাবাবেগহীন গলায় অনিতা প্রশ্ন করেন—বাবাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিলে যদি ভারতীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক সুবিধে হতো, তবে অবশ্যই দিতেন। তা ছাড়া ইতিহাস কি সব সময় যার যা প্রাপ্য তাই দেয়?" ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দেও অনিতা একবার কলকাতা ঘুরে গেছেন দিন কয়েকএর জন্য এসে।

* * *

যাক, এবার শেষ টানি কলকাতা রাজভবনের ঐতিহাসিক অয়েল পেণ্টিং এর কুলপঞ্জীতে।

কলকাতা রাজভবনের কর্মচারীদের দরদ ও অস্ফুট বিরূপ আলোচনা স্বয়ং রাজ্যপাল বা তাঁর খাশ সরকারী কর্মচারীকুলকে এই সব অবহেলিত ছবিগুলির প্রতি তাদের মমত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করাতে পারে না। শিল্পীমনা জনকয়েক খাস কর্মচারীরা নীরবেই ছবিগুলি ও কলকাতা রাজভবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত জিনিসগুলির সাম্প্রতিক অবহেলার জন্য মনে প্রাণে দুঃখবোধ করে—যেমন প্রত্যেক ভারতবাসীর দুঃখবোধ থাকা উচিৎ নিজের দেশের মহৎ শিল্প-সম্ভার বিদেশের বাজারে পাচার হয়ে বিক্রী হওয়ার জন্য। অর্থ দেশকে বড় করে না, তার শিল্প সাহিত্যই দেশকে সম্মান এনে দেয়।

তবে এখানে বলতে গর্ব অনুভব করি যে রাজ্যপাল ল্যানসলট ডায়াস ও রাজ্যপাল টি. এন সিং ঐ সব ছবির কিছু পুনরুদ্ধারের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলি আমেদ
বনাম
রাজভবনের মশককুলের অশালীন আচরণ

আমাদের দেশের সবচেয়ে নামী ও শ্রদ্ধেয় পুরুষ হচ্ছেন আমাদের ভারতের প্রেসিডেণ্ট।

থাকেন তিনি রাজধানী দিল্লীতে। কিন্তু কার্য পরম্পরায় তাঁকে মাঝে মাঝেই সারা ভারত এমনকি বিদেশ পরিভ্রমণেও যেতে হয়।

যদিও ভারতের শাসন কাঠামোতন্ত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীই সব।

তবে আমাদের সংবিধানে প্রেসিডেণ্টের অসীম ক্ষমতা আছে—জল, স্থল, বায়ু সমস্ত সেনাদের তিনি প্রধান। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন কারণ দেখিয়ে ভারতের তাবৎ প্রদেশের মন্ত্রী পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়ে সেই রাজ্যে প্রেসিডেণ্ট রুল চালু করতে পারেন। এমনকি তিনি যে ভারতের সর্বোচ্চ গণপরিষদ লোকসভা, তাকেও ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর ইচ্ছামতো তর্কাতীত ভারতের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীও নিয়োগ করতে পারেন। তার ইতিহাসের নজীর আছে উনিশশো উনআশি সালে লোকদল নেতা শ্রীচরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে বসানো।

এখন আসা যাক ভারতের প্রেসিডেণ্ট এলে কলকাতার রাজভবনে কী কী করা হয়।

এই রাজভবনে রাজ্যপালের যে নিজের খাস প্রেস আছে তা থেকে রাজ্যপালের মাসের পনেরো দিনের পর্যায়ক্রমে তাবৎ ট্যুর বা দিনকার দিন নানা ব্যক্তির সঙ্গে দেখা-শোনার বিশদ টাইম-ও বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদির কথা মাসের প্রথম তারিখেই ছাপা হয়ে বের হয়। তাকে বলে 'এনগেজমেণ্ট লিস্ট'। সেটা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বৃটিশ জমানা থেকেই। কেবলমাত্র রাজভবনের গুটীকয় অফিসাররাই তা হাতে পান বা জানতে পারেন। সেটা মাত্র একপৃষ্ঠার অনুষ্ঠানসূচী। উভয় দিকেই ছাপানো।

কিন্তু এই রাজভবনে যখন ভারতের প্রেসিডেণ্ট বা অন্য কোনো দেশের প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী দু'একদিনের জন্যে আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন এই রাজভবনের উপরিউক্ত প্রেস থেকে ছোট্ট একটা বই সিক্রেট মার্কা হয়ে বার করা হয়।

তাতে সেই বিশেষ অতিথি কখন রাজভবনে আসছেন এরোড্রাম থেকে, কখন রাজভবন থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বার হবেন, তাঁর সঙ্গে আর কে কে আসছেন, তিনি কার কার সঙ্গে রাজভবনে দেখা করবেন, তিনি বা তাঁর পার্টির লোকেরা কে কোন স্যুইটে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ লেখা থাকে।

এই ছোট্ট ক্ষুদ্র পুস্তকটির উপর ছোট্ট করে লেখা থাকে 'সিক্রেট'।

এই বই-এ যদিও প্রেসিডেণ্ট বা ঐ সব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরা কী খাবেন বা না

খাবেন তা লেখা থাকে না তবু প্রায়ই দেখা যায়, দিল্লী থেকে আগে ভাগেই কলকাতার রাজভবনে নোট লিখে জানিয়ে দেওয়া হয় কী কী খাবার এই গেষ্ট খেতে ভালবাসেন, কিসে কিসে শুকনো লংকার ঝাল কম দিতে হবে, ডালডার তৈরী রান্না উনি খাবেন কিনা, বা ওর কোন দৈহিক প্রেসার আছে কিনা।

এখন দেখা যাক প্রেসিডেণ্ট বা ঐ জাতীয় কোন মহাসম্মানীয় বিদেশের অতিথি রাজভবনে এলে পুলিশ বা মিলিটারী রাজভবনে কী কী ষ্ট্রাটেজীক্ ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। বুলগেনিন, ক্রুশ্চেফ, রানী এলিজাবেথ, হো-চি মিন ইত্যাদি নেতারা যখন রাজভবনে পদার্পণ করেছিলেন তখন মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট থেকে আগে ভাগে এই রাজভবনে প্রতি স্যুইট তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে গিয়েছিল কোন রকম নাশকতামূলক বোমা বা ঐ জাতীয় কিছু পদার্থ রাজভবনে লুক্কায়িত আছে কিনা। আর্ম ডিটেকটার যন্ত্র দিয়ে তারা রাজভবনের সব ঘর পরীক্ষা করেছিল।

এছাড়া ঐ রকম ভি. আই. পি রাজভবনে এলেই সেণ্ট্রাল সি-আই-ডি রাজভবনকে ঘিরে থাকে। এছাড়া আছে মিলিটারী পুলিশ, রাজ্যের সান্ত্রীধারী পুলিশ, পুলিশ সার্জেণ্ট, সাধারণ কনস্টেবল ইত্যাদি।

এইসব ভি. আই. পি-রা যখন রাজভবনে নিদ্রা দিচ্ছেন তখন কলকাতার এই প্রায় একশো বিঘের রাজভবনের আনাচে কানাচে, বাগানে ঝোপঝাড়ে মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে তারা সদা জাগ্রত প্রহরীর মতো কাজ করে চলেন।

এখন দেখা যাক প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ শুভেচ্ছা সফরে ইন্দোনেশিয়ায় যাবার পথে ২৫মে ১৯৭৫ রাত্রি ৯টায় সদল বলে কলকাতার রাজভবনে এলেন এবং পরের দিন সকাল ৯টায় রাজভবন ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার পথে জাকার্তা রওনা হয়ে গেলেন। এই যে বারো ঘণ্টা কলকাতার রাজভবনে তিনি সদলবলে অবস্থান করলেন, তখন রাজভবনের অভ্যন্তরের দৃশ্যটা কী।

2.th May 1975

9 P. M.	The President and party arrive calcutta Air port from Delhi AF Air Craft Tu—124
.9-10 P. M.	The President leaves Calcutta Air port for Raj Bhawan by car
9-45 P. M.	The President arrives Raj Bhawan Quiet Dinner
26 th May	Halt
7-40 A. M	The President leaves for Calcutta Air port
8-10 A. M	The President arrives Calcutta Air port
8-15 A. M	The President and party take off for Jakarta— I A F Air Craft A S 748

প্রেসিডেণ্টের এই পার্টীতে পনেরোজন সঙ্গী ছিলেন। ছিলেন মিসেস আবিদা

বেগম, তাঁর একপুত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ মিরধা ; এ ডি সি দু'জন, মিলিটারী সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী ; প্রেস সেক্রেটারী, সেকসন অফিসার ট্যুর, সিকিউরিটি অফিসার, স্টাফ ফটোগ্রাফার, ডাক্তার, ডাক্তারের টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেণ্ট, ট্যুর ক্লার্ক, পরিচারক বা ভ্যালেট, জুনিয়ার বাটলার বা বাবুর্চি ইত্যাদি।

এই সব ভি আই পি আসবার পূর্বে যে যে স্যুইট তাঁরা থাকবেন সেগুলি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘসা-মাজা করা হয়। বার বার এয়ারকনডিসানার চালিয়ে চালিয়ে দেখে নেওয়া হয় ঘর ঠিক ভি-আই-পির পছন্দ মতো ঠাণ্ডা হচ্ছে কিনা। কলিং বেলগুলি ঠিক কাজ করছে কিনা ? ঠিক মতো ঘরের বিছানা পত্তর সাজানো গুছানো হয়েছে তো ? বাথ টবে ঠাণ্ডা ও গরম জল ঠিক মতো আসছে কিনা, কার্পেটের ধুলো ঝাড়া হয়েছে ? ডানলোপিলোর গদী ফেটে যায় নি তো, সিটিংরুমে বই এর র‍্যাকে ঠিক ঠিক তাঁর পছন্দ মতো বই সাজানো হয়েছে কিনা ইত্যাদি।

এরপর আছে সিটিং রুমে 'কোয়াইট' ডিনার হলে কোন কোন সুদর্শন বাবুর্চি কী কী খাবারের থালা কোন কোন সময়ে প্যাণ্ট্রী থেকে নিয়ে যাবে। কী রকম করে দেবে বা পরিবেশন করবে, কতোটা দেবে, ডেপুটী বা হাউস কমট্রোলার কে কে সামনে থাকবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদিও এখানে বলে রাখা দরকার রাজভবনের প্যানট্রী তদারকি করবার জন্য যে অফিসারটি রাজভবনে সেই বৃটিশ আমল থেকে বহাল আছেন তাঁর অফিসিয়াল ডেসিগ্নেসন হাউস কমট্রোলার।

তাঁকে প্রতিদিন সকালে নিজে হাজির হয়ে বড় বড় ভি-আই-পিদের কাছ থেকে সেই দিনের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে তাদের পরের দিনের খাবার পাতে কী কী দেওয়া হবে তা রাজভবনের খাবারের চার্ট অনুযায়ী পূর্বাহ্নে লাল টিক দিয়ে নিতে হয়। এবং রাজ্যপালের ও অন্যান্য বড় ভি-আই-পিদের দু বেলা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজভবনের একতলায় তাঁর নিজের অফিসে টেলিফোনের সামনে উদ্বিগ্ন ভাবে হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়। কারণ কখন ওপর থেকে বাবুর্চিদের টেলিফোন বেজে ওঠে—স্যার, লাটসাহেব (হুজুর) গোসা হুয়া। বিরিয়ানীমে নিমক থোরা কমতি দেনা চাইয়ে। আউর স্যালাডভি উনকো পসন্দ নেহি হুয়ে। মিরচা থোরা যাস্তি মালুম হোতা হ্যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভীত সন্ত্রস্ত কমট্রোলার তৎক্ষণাৎ ইনটার কম ফোনে রাজভবনের প্যানট্রীতে বেশ উত্তেজিত হয়ে আজকের রান্নার দোষগুলি বলে দেন। কারণ লাট বা ভি-আই-পি বলে কথা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখি রাজভবনে সেই পুরানো বৃটিশ আমল থেকে স্বাধীনোত্তর দিনে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের যতো অফিসার আছেন তাদের মধ্যে খানা বাবু এই হাউস কমট্রোলারের প্রতিপত্তি ও সুযোগ সুবিধা অপরিসীম।

কথায় বলে "খেতে দেবার মুরোদ নেই, কিলমারবার গোসাই।" অর্থাৎ যে খেতে দেয় তার কোনো অপরাধই অপরাধ নয়। এমনকি বিশাল প্রাণী হাতীকেও যে

খেতে দেয়, দেখা শোনা পরিচর্যা করে সেই মাহুতকে হাতীও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

তেমনি রাজ্যপাল অধীনস্থ রাজভবনের সমস্ত কর্মচারীকেই কোনো কোনো সময় একটু আধটু বকাবকি করেনই কিন্তু এই খানা-বাবুর মুখ সব সময়ে রাজ্যপালের সোহাগে সদাহাস্যমুখ। রাজ্যপালদের কাছ থেকে নানা কৌশলে কাজও নানারকমের বাগিয়ে নিতে এরা সিদ্ধহস্ত।

বৃটিশ আমলে একজন গভর্ণর তো দিল্লীর ভাইসরয়কে ধরে জনৈক রাজভবনের প্রাক্তন খানা-বাবু মিঃ মুখার্জিকে 'রায় সাহেব' পদবী পর্যন্ত পাইয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় এই সব খানা-বাবু বা কমপ্ট্রোলারদের হাতেই রাজ্যপাল বা গভর্ণরদের নিজস্ব মদটদ ইত্যাদি খাবার হিসেবপত্র রাখতে হয়। সুতরাং সেইসব পারসোনাল হিসেবের কিছুটা খরচ গভর্মেণ্টের রোজকার খাই খরচের হিসেবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে রাজ্যপালেরা নিশ্চয়ই তাদেরকে স্নেহের চক্ষে দেখবেন। এটা তো স্বাভাবিকই...।

এবার আসা যাক রাজভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট বা অন্যদেশের প্রধান-মন্ত্রী বা প্রেসিডেণ্ট এলে বাইরে থেকে পথচারীরা তা কী করে বুঝতে পারবেন।

দেশের আপামর জনসাধারণতো খবরের কাগজ পড়ে না—পড়বার পয়সা কৈ—বা সকলেরই তো নিজস্ব রেডিও, টেলিভিশন নেই যে তাতে খবরের পূর্বাহ্নে জানতে পারবে কবে কোনদিন কোথাকার প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী কলকাতার রাজভবনে আসছেন।

বিয়ে বাড়ীতে, বা কোনো কিছু পুজো অর্চ্চনার সময় গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীর সদর দরজায় যেমন দু'টি সদ্যছিন্ন বাচ্চা কলার গাছ রাখা হয় শুভকামনা করে তেমনি রাজভবনে উপরিউক্ত ভি-আই-পি এলেই—সে সামান্য দু'চার ঘণ্টার জন্য হলেও—দু'জোড়া ঘোর-সওয়ার কলকাতা মাউনটেনেড পুলিশ কনসটেবলারি থেকে নীল নিশান উড়িয়ে এই রাজভবনের মেন দুটি গেট—উত্তর ও দক্ষিণ—সতর্ক পাহারা দেবে।

এছাড়া অন্যদেশের প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী রাজভবনে এলে তাঁদের দেশের জাতীয় পতাকা ভারতীয় অশোক চক্রমার্কা জাতীয় পতাকার সঙ্গে গাটছড়া হয়ে উড্ডীন থাকে ভি আই-পিরা যে স্যুইটে থাকেন তার জানলা দিয়ে।

১৯৬৯ সালের পর থেকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট, বা গভর্ণরের নিজস্ব ভিন্ন পতাকা দেশের সংবিধান থেকে লোপ পেয়েছে। এখন রাজ্যপাল, প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী সকলেরই অশোক চক্র মার্কা জাতীয় পতাকা।

এখন আসুন এঁদের সঙ্গে কেমন করে রাজভবনে বাইরের অতিথি বা দর্শনার্থীরা দেখা করে তার আলোচনায় আসা যাক।

৮ রাজভবনে কনফিডেনশিয়াল এনগেজমেণ্ট লিস্ট রোজকার রোজ প্রতিদিন রাজ্যপালের খাশ প্রেসে ছাপা হয়। এটাও সেই পুরাতন বৃটিশ কানুন। এই এনগেজমেণ্ট লিস্ট রাজভবনে পনেরো দিনের মধ্যে কবে কে ভি-আই-পি আসছেন, কতোদিন রাজভবন থাকবেন, রাজ্যপাল কখন কার সঙ্গে দেখা করবেন, কোন এ-ডি-সি

ভি-আই-পিকে এরোড্রাম বা কোন রেলওয়ে ষ্টেশন (হাওড়া বা শিয়ালদা) থেকে কটা বেজে কতো মিনিটে আনতে যাচ্ছেন, বা স্বয়ং রাজ্যপাল কখন কোথায় যাচ্ছেন তার পুংখানুপুংখ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ থাকে।

দর্শনার্থীদের আবেদন মতো পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয় সিডিউলড্ টাইম। অবশ্য যদি রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক থাকেন।

তারপর সেই দর্শনপ্রার্থী বা তাঁরা এসে রাজভবনের উত্তর গেটে রাজভবনের পুলিশ থানায় গাড়ী থামিয়ে তাঁদের রাজভবনের নিমন্ত্রণ পত্র দেখিয়ে নেন। তাঁদের গাড়ী চলতে থাকে রাজভবনের মধ্যের রাস্তার গ্রাভেলস্-এর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে।

ইতিমধ্যে রাজভবনের পুলিশের ইনস্পেক্টর ফোনে রাজ্যপালের এ-ডি-সি কে জানিয়ে দেন কোন দর্শনার্থী এসেছেন। এ-ডি সি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে মারবেল হল থেকে স্যালুট করে মিলিটারী কায়দায় আগত অতিথিটিকে রাজভবনের দোতালায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তাঁর নিজস্ব সিটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসান। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের সংলগ্ন রাজ্যপালের ষ্টাডি—যাকে রাজ্যপালের নিজের অফিস বলা হয়—সেখানে গিয়ে রাজ্যপালকে আগত অতিথিটির কথা বলেন এবং তাঁকে নিয়ে আসার কায়দা মাফিক অনুমতি রাজ্যপালের কাছে যাচ্ঞা করে নেন। পরে রাজ্যপালের অনুমতি পেলে অতিথিটিকে রাজ্যপালের সম্মুখে নিয়ে হাজির করে নিজে স্বয়ং ঘর থেকে রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে বের হয়ে আসেন।

সবই যেন সেই দুশো বছরের বৃটিশ শাসিত জমানার পুনরাবৃত্তি।

কখনও কখনও আবার তেমন ভি-আই-পি মার্কা বড় গেষ্ট এলে রাজভবনের তিনতলার রাজ্যপালের নিজের স্যুইটের সিটিংরুমে অতিথি অভ্যাগতদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যদিও সেখানেও একই নিয়ম। সেই এ-ডি-সি। সেই নীচের তলার মারবেল রুমে অতিথিকে আহ্বান। সেই এ-ডি-সি'র সিটিংরুমে প্রথমে বসানো অতিথিকে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার আসা যাক প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট এলে কলকাতার রাজভবনের কোথায় সাধারণতঃ কনফারেন্স বা ঐ জাতীয় শলাপরামর্শ হয়।

কলকাতার প্রায় নব্বইটি বৃহৎ বৃহৎ ঘরযুক্ত প্রায় একশো বিঘে জমিবেরা এই সুন্দর কলকাতার রাজভবনটির প্রায় প্রত্যেক চেহারা ও মেজাজ সেই ১৮০৩ সালের লর্ড ওয়েলেস্লী নির্মিত রাজভবনের মতই এখনও রয়ে গেছে। কেবলমাত্র বদলাবার মধ্যে বদলিয়েছে দু' একটি বৃটিশ আমলের স্যুইটের নাম। ব্যস। আর সব ঠিক হ্যায়।

যেমন রাজভবনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে তিনতলায় যে স্যুইটটির নাম বৃটিশ আমলে ছিল এন্ডারসন স্যুইট সেটার এখন নাম হয়েছে পি, এম স্যুইট বা প্রাইমমিনিষ্টার স্যুইট। যদিও কস্মিনকালে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি বিলাসবহুল দোতালার প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইট ছেড়ে কখনও ওখানে থাকতে দেখি নি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি রাজভবনের যতোগুলি স্যুইট আছে অর্থাৎ ডাফরিন স্যুইট, এনডারসন স্যুইট, ওয়েলেসলী স্যুইট, কার্জন স্যুইট, কর্ণওয়ালিশ স্যুইট, প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইট ইত্যাদি সবগুলিই কিন্তু সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ ভাইসরয়দের বা রাজপ্রতিনিধির সাময়িক বা দীর্ঘদিনের বাসস্থান ছিল।

সেই সব প্রকোষ্ঠে একাকী নিভৃতে চাবি খুলে সন্তর্পণে কোনো শীতের রাত্রের নির্জন নিশীথে ঢুকলে এখনও যেন সেই সব ফেলে আসা দিনের স্মৃতি মনকে উচ্ছল করে তোলে, মন আলোড়িত হতে থাকে—লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক-এর সতীদাহ প্রথা নিবারণ লর্ড কর্ণওয়ালীশের মন্ত্রণা বা শলাপরামর্শের ইঙ্গিত যেন এখনও সেই সব স্যুইটে শুনতে পাওয়া যায় সন্তপর্ণে কান খাড়া করলে।···

এবার আসা যাক রাজভবনের কনফারেন্স রুম বা কাউন্সিল চেম্বারের কথায়।

কলকাতা রাজভবনের দোতালায় উত্তর-পূর্ব কোণে এই কাউনসিল্ চেম্বার। কাঠের গ্যালারী করা এই বিশাল ঘরে ওই বৃটিশ আমল থেকে আজও পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং সাধিত হয়েছে। এর ইতিহাস আমি এই বই-এর অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছি। তাও আবার বলছি এখানে মিটিং করতে দেখেছি মিঃ ভুট্টোকে, মিঃ ক্রুশ্চেফ, মিঃ বুলগেনিনকে, কর্ণেল নাশেরকে, ইন্দিরা গান্ধীকে, লালবাহাদুর, মোরারজী দেশাই, জওহরলালকে ইত্যাদি।

আবার ফিরে আসি পুরানো কথায়—প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদের পার্টীরা রাজভবনে কে কোথায় স্থান পেল। এঁদের থাকবার জন্য রাজভবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দামী তিনটি স্যুইট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ ও আবিদা বেগমের জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইট আর অন্যান্যদের জন্য ডাফরিন স্যুইট ও ওয়েলেস্লী স্যুইট।

এক একটা স্যুইটে থাকে চারটি করে বৃহৎ বৃহৎ ঘর কার্পেট মোরা, আছে ফোন, বাথরুম, গিজার, বাথটব, চান করবার টেলিফোন সাওয়ার বা ঝরণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে একটু বাড়তি কথা বলে রাখা দরকার কলকাতার রাজভবনে সেকেণ্ডক্লাশ গেষ্ট রুমও আছে যেগুলি রাজভবনের একতলার মেন্ বিল্ডিং-এর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। এখানে এবার ঠাঁই পেয়েছিলেন প্রেস ফটোগ্রাফার, বাবুর্চি, ভ্যালেট ও ডাক্তারের সঙ্গী ভদ্রমহোদয়।

পাঠক, পাঠিকাদের অনেকের হয়তো জানতে ইচ্ছা হচ্ছে রাজভবনের স্যুইটগুলির ঘরের নম্বর কতো। প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্যুইটের ঘরগুলির নম্বর ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ; ডাফরিণ স্যুইটের নঃ ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২ ; ওয়েলেসলী স্যুইটের নং ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, এ ছাড়া আছে রাজভবনে এ্যানডারসন স্যুইট নং ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫। মারকো ড্রইংরুম ইয়েলো ড্রইংরুম, বাবা কামরা, গভর্ণরের স্যুইট ইত্যাদি সবগুলি ঘর মিলিয়ে প্রায় নব্বই, পঁচানব্বইটা রাজভবনে সুবৃহৎ ঘর।

এখন দেখা যাক প্রেসিডেণ্ট বা ঐ জাতীয় কোন সম্মানীয় অতিথি রাজভবনে এলে গেলে পুলিশ বা মিলিটারী কনভয় কেমন করে ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে।

প্রথমে থাকে লাল আলো লাগানো একটা পুলিশ ভ্যান, তারপর তিন সারিতে তিনজন করে নয় জন মিলিটারী পুলিশ সবুজ মিলিটারী মোটর বাইকে, তারপর জনা ছয় কলকাতার পুলিশ সার্জেন্ট লাল মোটর বাইকে, তারপর প্রেসিডেন্টের গাড়ি রাজ্যপালের সঙ্গে, এরপর পর পর বিভিন্ন গাড়ীতে ভি-আই-পি ও এ-ডি-সিরা, জীপে তারপর মিলিটারী একজন মিলিটারী উচ্চপদস্থ অফিসার, তার সামনে আবার তিনটি মিলিটারী সবজে মোটর বাইকে তিনজন মিলিটারী পুলিশ, তারপর হেল্‌থ্‌ সারভিসের রেডক্রশ মার্কা ভ্যান এবং সর্বশেষে সবুজ নিশানওয়ালা পুলিশ ভ্যান অর্থাৎ অল ক্লিয়ার।

দমদম এরোড্রাম থেকে হেলিকপটারে ময়দানের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের হেলিপ্যাডে নামলে এসব কোন কিছুরই দরকার পড়ে না।

কিন্তু সম্মানীয় রাষ্ট্রপ্রধান অতিথিদের জন্য রাজভবনের উত্তর ও দক্ষিণ গেটে নীল নিশান হাতে ঘোরসওয়ার চার জন ঠিক মোতায়েন থাকতেই হবে। লেখক ওয়াজেদ আলীর—"সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে।" যা বৃটিশ আমলের সুরু থেকে এই রাজভবনে চালু ছিল। এবং যার সম্বন্ধে লিখিত বই আছে ভাইসরয় লর্ড কার্জনের—কোন গেট দিয়ে কী পর্য্যায়ের সম্মানীয় অতিথি কলকাতার রাজভবনে ঢুকবে, কোন ইয়ারমার্কড স্যুইটেই বা থাকবেন, বা তার সম্মানে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কতবারই বা তোপ দাগা হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন পিছনের দৃশ্যপটে ফিরে দেখা যাক। রাজভবনে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিষ্টার বা ঐ জাতীয় কোনো ভি-আই-পি এলে তাঁদের সঙ্গের অনুচরেরা তখন যা যতোদিন ঐ সকল মাননীয় অতিথিবৃন্দ রাজভবনে থাকেন তখন তাঁরা কী করে সময় কাটান। এ সকল তথ্য সকলেরই জানতে ইচ্ছে হয়।

আমার দীর্ঘদিনের রাজভবনের বিজড়িত জীবনে, যেটা নাকি পুরো প্রায় ত্রিশ বছর হবে, তাতে দেখেছি যে এই সকল আগন্তুক ষ্টাফরা প্রায়ই সুযোগ সুবিধা বুঝে রাজভবনের অশোকচক্র মার্কা গাড়ী নিয়ে ফাঁক বুঝে কলকাতা ভ্রমণে বের হন। যেমন রাজ্যপালের এ-ডি-সিরা আগন্তুক মাননীয় অতিথিদের তৎসম পর্য্যায়ের এ-ডি-সি দের নিয়ে কলকাতার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। রাজভবনের রাজ্যপালের ডাক্তার আগন্তুক ডাক্তার বা ঐ সমপর্য্যায়ের লোকের সঙ্গে ডাক্তারি বা নিজের ডাক্তারি জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার গল্প ফেঁদে বসেন। লাটের আই-এ-এস সেক্রেটারী রাজভবনের নানা দিক নিয়ে আগন্তুক অতিথির সম পর্যায়ের সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যান।

কলকাতার রাজভবনে র‍্যাঙ্ক-এ র‍্যাঙ্ক-এ ছয়লাপ। এখানে গেজেটেড অফিসারের বউরা ভুলেও অ-গেজেটেড রাজভবনের কর্মচারীর বাড়ী পা মাড়াবে না। আবার লিফটম্যান, দপ্তরী, রেকর্ড সাপ্লায়ার তারাও ঝাড়ুদারের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে সংকোচ বোধ করবে। আর রাজভবনের কেরানীকুলের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সমানে সমানে, সমানে অসমানে, উঁচুতে নিচুতে এদের মধ্যের মনুষ্যত্বের যে ভেদাভেদ দেখেছি তাতে সব সময়েই মনে পড়েছে বাংলার বিখ্যাত পুস্তক যাযাবরের "দৃষ্টিপাত"-

এর কথা—নিউ দিল্লীর কোন এলাকার বাসিন্দা জানতে পারলেই তাঁর সোসাল ষ্টেটাস বা চাকরী জীবনের মাইনের পরিমাণ কতো তা অনায়াসেই বোঝা যাবে।

রাজভবনে হয়তো কোয়ার্টারের এলাকা ভাগ করা নেই, তবু ছোট শিশুদের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ষ্টেটাসের ভেদাভেদ তাদের গারজেনদের চাকরী মোতাবেক, তা ভবিষ্যৎ জীবনের রাজভবনের প্রজন্মের শিশুদের কী যে অপরিসীম ক্ষতি সাধন করে চলেছে তা যাঁরা দু'চারদিনের জন্যও কলকাতা রাজভবনের কোন কর্মচারীর কোয়ার্টারে থেকে গেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন।

রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং কে দেখেছি হোলীর দিন বা মাঝে মধ্যে রাজভবনের ব্যানকোয়েট হলে পাতা পেড়ে একসঙ্গে ঝাড়ুদার বা লিফটম্যানের সঙ্গে ভাত ডাল, তরকারির পংক্তিভোজে খেতে; দেখেছি রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেবকে সুইপারদের বাল্মিকী ফেসটিভ্যালে সস্ত্রীক হাস্যবদনে ৯ নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ-এ এসে পুজোর প্রসাদ গ্রহণ করতে, দেখেছি রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জিকে রাজভবনের চাপরাশি খানসামা অফদার বাবুর্চি ইত্যাদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের পুত্র কন্যাদের লেখাপড়ার খবরা-খবর নিতে—দূরে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ব্যাটন হাতে দাম্ভিক এ-ডি-সি।

কিন্তু কখনও দেখিনি (এক দুর্গাপূজা প্রাঙ্গণে ছাড়া) যে রাজ্যপালের সেক্রেটারী, এ-ডি-সি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিরা কখনও রাজভবনের সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলছেন বা তাদের সুখ দুঃখের খবরাখবর নিচ্ছেন।

রাজভবনের অতিথি এলে সব চেয়ে যারা কষ্টে পড়ে সেই হতভাগ্যেরা হচ্ছে রাজভবনের মোট তেরো জন লিফটম্যান। সারারাত্রি ধরে ঠায় লিফটের দরজায় দরজায় তাদের ঘুমচোখে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কারণ রাত্রির কখন কোন প্রহরে বেড়িয়ে যাওয়া কোন অতিথি কলকাতায় তার দেশওয়ালি "মোলাকাতি" সেরে আবার কখন রাজভবনে প্রত্যাবর্তন করবেন, তার ঠিক ঠিকানা প্রায়ই থাকে না।

আগেই বলেছি এবার তো রাজভবনে ২৫শে মে উনিশশো প'চাত্তর, প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ রাত্রি ৯টা ৪৫ মিঃ এসেই তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষ প্রিন্স অব ওয়েলস্ সুইটে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব নির্ধারিত দেখা সাক্ষাৎ কর্মসূচী অনুসারে একে একে দু'চারজন লোক আসতে লাগলো।

প্রথমেই এলেন খদ্দর ধারী ও দিনরাত্রে সানগ্লাস পরিহিত স্বনামখ্যাত কংগ্রেসী শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এসেই তিনি ঢুকে গেলেন নিঃশব্দে প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলি আমেদের কক্ষে। এঁরা দীর্ঘদিনের কংগ্রেসের পুরাতন বন্ধু সুতরাং নিভৃতে কী কী আলোচনা চললো উভয়ের মধ্যে তা কাক পক্ষীও টের পেল না। তাঁরা প্রায় আধঘণ্টা শলাপরামর্শ করলেন।

পরে একে একে আরও দু' তিনজন এলেন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। সেগুলি নিছক সৌজন্যমূলক না কোনো কিছুর শলাপরামর্শ তা সঠিক জানতে পারলাম না।

এদিকে রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং অনুজ্ঞা দিলেন প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদকে তিনি অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ভোর ৪টা, ৪-৩০টার সময় রাজভবনের ফুলে প্রস্ফুটিত বাগান দেখাবেন।

লিফটম্যানেরা যারা রাত্রি দু'টোয় ভি-আই-পি উঠিয়েছেন লিফটে, তাদের প্রায় জেগেই সেই রাত্রি কাটাতে হলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিফটের দরজায়—কারণ কখন ভোর হয়ে যায়, বা চারটে বেজে যায়। একবার লিফটের সামনে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লে তো জেগে ওঠা দায়।

একে মে মাসের গরমের দীর্ঘ রাত, তায় আবার রাজভবনের মশার কামড়। কিন্তু না রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ, না প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ অতো ভোরে রাজভবনের বাগান দেখতে রাজভবনের একতলায় কেউ পদার্পণ করলেন না।

তারপর যখন প্রেসিডেণ্ট ফকুরুদ্দীন আলী আমেদ সকাল ৭-৪০ মিনিটে সদলবলে রাজভবন ছেড়ে চলে গেলেন দমদম এরোড্রামের দিকে গাড়ীর কনভয় হাঁকিয়ে, তখন পরিশ্রান্ত বিধ্বস্ত ঐ সকল লিফটম্যানদের চোখে দেখলাম অশ্রুধারা নেমেছে, কিন্তু মুখে দেখানো কাষ্ঠ হাসি।

অতিথি সেবা যে ভারতের গরীব লোকেদের ভাগ্যের লিখন। সেখানে প্রিভিলেজড্ ক্লাস ধনবানের সমবেদনা সূচক মুখের আ···হুর তালিকা অতি নগন্য।

* * *

এবার আসি রাজভবনের মশককুলের অশালীন আচরণের কথায় প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদের সঙ্গে তাঁর সেই কলকাতার ট্যুরে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সালে।

সেই কোন যুগে বাঙ্গালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—'রাতে মশা, দিনে মাছি; এই নিয়ে কলকাতায় আছি।' ······সে যুগের পর নিশ্চয়ই অনেক যুগ পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই কলকাতার স্বাস্থ্যলিপির ভাগ্যাকাশে বিশেষ কিছু এর রদ-বদল হয়নি।

মাঝে কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থাৎ চল্লিশের দশকে এই সব জ্বালাতনে মশা মাছি কীট পতঙ্গের উপদ্রব সামান্য কিছুটা প্রশমিত ছিল। তাও সাময়িক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিদেশী মিলিটারীর প্রয়োজনে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে কলকাতার তথাকথিত খোলা হাইড্রেন বা নর্দমায় বা কলকাতা রাজভবনের দুটি এঁদো পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে ডি-ডি-টি স্প্রে করার দরুণ মশা-মাছির উপদ্রব কিছুটা কম ছিল। কিন্তু তারপর আবার যথা পূর্বং তথা পরং।

দরিদ্র এই ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো জন-দরদী প্রতিষ্ঠান তারপর আর গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ডি-ডি-টি ছড়াচ্ছে না, বা মশা মারার তেল হাইড্রেনের ঝাঁঝরিতে ঢেলে দিচ্ছে না। কলকাতা কর্পোরেশনের অবস্থাও তথৈবচ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, এই অবস্থা।

কলকাতা করপোরেশন তো মাঝে মাঝেই স্রেফ জবাব দিয়ে বসে—বিদেশ থেকে

আনা মশা মারার তেল অপ্রতুল, সুতরাং কলকাতার সব এলাকার মশা মারা সম্ভব নয়।...কিন্তু কলকাতার রাজভবন ?

তার ভাগ্যেও কী এতোটা অবহেলা। হ্যাঁ তাই হলো। মহান ভারতবর্ষের সম্মানীয় প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ ও তাঁর স্ত্রী আবিদা বেগম ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সাল, বেলা বারোটায় দমদম এরোড্রাম থেকে হেলিকপটারে উড়ে এসে রাজভবনের অদূরে ব্রিগেড প্যারাড গ্রাউণ্ডে এসে নামলেন।

তাঁদের সঙ্গে একই হেলিকপটারে বাংলার তখনকার রাজ্যপাল লেডী ও লাট ডায়াস।

এই দিন রবীন্দ্রসদনে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের উৎসব ও বিকেলে উল্টোডাঙার অতুল্য ঘোষের 'বিধান শিশু উদ্যানের' উদ্বোধন ইত্যাদি বেশ জাঁক-জমক ভাবেই সম্পূর্ণ হলো।

রাতে হলো গভর্ণরের ষ্টাডীতে ছোট্ট ডিনার পার্টী—মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ওঁর বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী মায়া রায়, রাজ্যপাল ডায়াস ও লেডী ডায়াস, প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ ও তাঁর স্ত্রী আবিদা বেগম ইত্যাদি মিলিয়ে জন কুড়ি ভি-আই-পি ব্যক্তির খাওয়া দাওয়ার আয়োজন।

খাবার দাবার সবই প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলীর মনপশন্দ দেওয়া হলো—

কাশ্মিরী বিরিয়ানি
মোগলাই পরোটা
শাহী টুকরা
মুগর মাখানি
কাবাব
রসমালাই
মিঠা পান

সবই তো বেশ ভালোভাবে কাটলো। কোথাও কোনো কিছুর গণ্ডগোল দেখা গেল না। রাজ্যপাল ডায়াসের মুখে বেশ খুশি খুশি ভাব—প্রেসিডেণ্টের মতো সম্মানীয় ভি-আই-পির কোনো অসুবিধে হয়নি এই ট্যুরে।

বাইরের সব ভি-আই-পি নিমন্ত্রিত অতিথিরা যে যার গাড়ীতে বা রাজভবনের মটরে নিজের নিজের বাড়ী অভিমুখে রওনা হলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। রাত্রের ঘুম নিশ্চয়ই তাঁদের ভালো হয়েছিল।

রাজ্যপাল ও লেডী ডায়াস প্রেসিডেণ্ট ও মিসেস প্রেসিডেণ্টকে শ্রদ্ধার সঙ্গে—উইশ—শুভরাত্রি—জানিয়ে রাজভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত আকাশবাণীর দিকে তিন তলায় তাঁদের সংরক্ষিত স্যুইটে চলে গেলেন। সব প্রায় ঠিক ঠাক।

প্রেসিডেণ্ট ও স্ত্রী আবিদা এসে ঢুকলেন রাজভবনের সব চেয়ে দামী দোতালার উত্তর পশ্চিম কোণের প্রিন্স অব ওয়েলেস স্যুইটে। রাজকীয় কামরায় অপেক্ষমাণ রক্ষী, সি-আই-ডি, এ-ডি-সি প্রভৃতিরা ভারতের প্রেসিডেণ্ট দম্পতীকে সসম্মানে মাথা

ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালো। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনের প্রিন্স অব ওয়েলেস্ স্যুইটের বেডরুমের অটোমেটিক স্প্রিং দেওয়া দরজা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

রাত তখন ১১-৪৫ মিঃ

হঠাৎ ফেব্রুয়ারীর শীতের নিশুতি রাতে কলকাতার রাজভবনের ঘুম যেন চমকিয়ে উঠলো। রাত তখন প্রায় ১-৩০ হবে। প্রেসিডেন্ট ও মিসেস আবিদা বেগমের কিছুতেই চোখে ঘুম আসছে না। ভীষণ মশা ঢুকেছে প্রিন্স অব ওয়েলেস-এর বেড রুমে সুক্ষ্ম তারের জালে ঘেরা মস্কিউটো প্রুফ দরজা থাকা সত্ত্বেও। তাদের ঘরে মশার কামড়ে একদণ্ড তিষ্ঠনো দায়।

প্রেসিডেন্ট ফকরুদ্দীন আলি আমেদ অতো রাতে ড্রেসিং গাউন পরে দ্রুতপদে ঘুমন্ত লিফটম্যানের কাছে ছুটে এলেন। শুরু করে দিলেন হাঁক ডাক……

যথারীতি রাজভবনের লিফটম্যান, পুলিশ, এডিসি রাতের রাজভবনের পি-বি-এক্স-এর টেলিফোন অপারেটার সবাই তখন ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে।

সবাই তারা ভাবছে এত রাতে কী করা যায়। কোন অফিসারকে ফোন করা যায় এর সুরাহার জন্য। রাজভবনের সবাই যে ঘুমিয়ে পড়েছে এই সমস্ত দিন খাটা-খাটুনির পর।

রাজভবন পি বি এক্স থেকে ঘন ঘন ফোন যাচ্ছে রাজভবনের ডেপুটী সেক্রেটারী তথা হসপিটালিটীর কর্তা মিঃ ব্যানার্জির কাছে, রাজ্যপালের সেক্রেটারীর কাছে, ইনজিনিয়ার মিঃ সরকারের কাছে—এর এক্ষুণি কোন বন্দোবস্ত করুন। নচেৎ প্রেসিডেন্ট খুব রেগে গেছেন। প্রেসিডেন্ট ও মিসেস প্রেসিডেন্ট এত নাকি রাগান্বিত হয়ে পড়েছেন যে মুহুর্মুহুঃ বলছেন, এই যদি কলকাতা রাজভবনের আতিথেয়তার লক্ষণ হয়, তবে এবার থেকে কলকাতায় এলে তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামে উঠবেন রাজভবনের বদলে। কারণ তিনি তো স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর নিয়মতান্ত্রিক সর্বাধিনায়ক।

এত রাত্রে সবাই রাজভবনে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

কলকাতার রূপসী রাজভবনের ঘুম যেন এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কর্মচারীদের কেউ কেউ বিরক্ত। কেউ আবার এই ঘটনায় মজা পাচ্ছেন। কেউ বা উপরওয়ালাদের এই উপরি পাওনা জব্দে বেশ অনেকটা পুলকিত—ঠিক হয়েছে, গরীবের তো ভগবান আছেন। আমরা মরবো খেটে আর ওনারা নেবেন ইনাম। দেখ এবার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং কী পর্যন্ত করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সবাই উদ্বিগ্ন কিন্তু কিছু করতে অপারগ। কারণ একে রাত তখন ১-৩০টা, তার উপর মাঘ মাসের এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। সবাই ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে ভয়ে জড়োসড়ো।

শেষে অনেক চিন্তা ভাবনা করে রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাঁর বাড়ী থেকে একটা ছোট্ট নেটের সাদা মশারী আনা হল।

কিন্তু সেটা টাঙানোরও ঝামেলা অনেক। কারণ খাস বৃটিশ আমলে রাজভবনে

ছবি দেওয়া বেশ সুন্দর-সুন্দর মেহগিনী কাঠের বড় বড় পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কের মাথা থেকে নেটের মশারীর দড়ি টানলেই বাচ্চাদের দোলনার খাটের মতো তার নেটের মশারী ঝুলে পড়তো ঘরের মেঝে অবধি। তার উপর আবার বৃটিশ লাটেরা কায়দা করে ঐ সব পালঙ্কের মাথায় নেটের মশারীর ভেতর ছোট্ট ইলেকট্রিক ফ্যান লাগিয়েছিল।

তাতে হতো কি বিছানায় মশাও ঢুকবে না, এবং খাটে শোওয়া ব্যক্তির গায়েও হাওয়া লাগবে।

তাকে বলা হতো "মশকিউটো হাউস"। সে সব অনেক দিনের কথা। অনেক দিনের ইংরেজদের ফেলে আসা পুরানো ঐতিহ্য।

১৯৫৬ সালের ৩রা নভেম্বর শ্রীমতী পদ্মজা নতুন বাংলার রাজ্যপাল হয়ে এসে সেই সব পুরোনো দিনের ঐতিহ্যময় মেহগিনী কাঠের পালঙ্ক ও কলকাতা রাজভবনের মানানসই অনেক পুরাতন ঐতিহ্যময় জিনিষ অক্সনার 'ম্যাকানজি লয়াল'কে দিয়ে মাটির দামে নিলামে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। পূর্বেই সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

তার বদলে রাজভবনের ঘরে ঘরে এসে শোভিত হচ্ছে আধুনিক ছিমছাম ইংলিশ খাট, ডানলোপিলোর গদি, গাঢ় রং করা সোফা সেট, রং করা চেষ্টার ড্রয়ার, ডিভান আলমারী ইত্যাদি।

সেই বৃটিশ জমানার সুন্দর মেহগিনী রং করা আবলুশ কাঠের খাট, আলমারি, চেয়ার, পালঙ্কের বদলে এখন রাজভবনে নানা রং বেরং-এর নানাবিধ বিখ্যাত পাঁচতারা হোটেল ও রেস্তোরার মতো চেয়ার, টেবিল, সোফা, ডিভানের ছড়াছড়ি।

সে যাই হোক রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা যখন রাজভবনের ঘরে ঘরে ইংলিশ খাট আনালেন রানী এলিজাবেথের ষাটের দশকের ভিজিটের সময়, তখন হয়তো কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত পল্লী এই ডালহাউসী স্কোয়ারের রাজভবনে মশা বা মাছির উপদ্রব ছিল না, কিন্তু এখন এই রাজভবন ও তার চারিপাশে এতো আবর্জনা ও এতো নোংরা যে দিনে দুপুরে এখানে রাজভবনের এস্টেটে দেশী মদ বিক্রী হয়, জুয়া খেলার আড্ডা তো এখানে রাজভবনের পুলিশের নাকের ডগায় হচ্ছে।

রাজভবনের খাশ কর্মচারীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে হয়তো চারশো জন কিন্তু এখানে বেনামে বাড়ী ভাড়া বা ঘরভাড়া দেয়, সে উপর তলার কর্মচারী থেকে ছোট্ট খুদে মেথর, পিওন, ঝাড়ুদার, মালী পর্যন্ত প্রায় অনেকেই।

ফলে এখন এমন হয়েছে যে সমস্ত ডালহাউসী স্কোয়ারের বাসিন্দার প্রায় একুনে অর্ধেকের বাসস্থান এই রাজভবনের নানা কোয়ার্টারে।

তার ফলস্বরূপ রাজভবনের নিজের রাজ্যপালের ক্যাম্প পোস্ট অফিসে এতো সব অপরিচিত পার্সেল বা রেজিষ্ট্রী চিঠি বা এমনি চিঠি আসে যার চৌদ্দ আনাই ঠিক মতো ব্যক্তির হাতে গিয়ে পৌঁছায় না।—কার ঠিকানা কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। আবার ঠিকানাও ঠিক মতো সব সময়ে বোঝা যায় না।

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বা একসাইজ ডিপার্টমেন্টে দরবার করলেও এর কোনো

প্রতিকার পাওয়া যায় না। তারা বলেন—রাজ্যপালের বিনা অনুমতিতে নাকি রাজ্যপালের এসটেটে 'রেড' বা তল্লাশী করা আইন বিরুদ্ধ সেই বৃটিশ জমানা থেকে।

এটা নাকি রাজ্যের পুলিশ আইনে অলিখিত আইন মোতাবেক নিষিদ্ধ ধারা।

সুতরাং যেখানে এতো লোক, এতো আবর্জনা, এতো নোংরা সেখানে ভারতের প্রেসিডেণ্ট বা তাঁর স্ত্রী আবিদা বেগমকে মশার কামড় তো একটু আধটু খেতেই হবে।

প্রাণী জগতের ইতরকুল কলকাতার মশা-মাছিরা তো জানে না কে স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি বা কে রাজভবনের উটকো বাসিন্দা।

শেষে অবশ্য অনেক কেরামতি করে তবে প্রেসিডেণ্টের ঘরে মশারী টাঙানো হল। এবং অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে গভীর রাতের এতো কাণ্ড কিন্তু রাজ্যপাল ডায়াস বা লেডী ডায়াসকে রাজভবনের কোন উর্ধতন কর্মচারী তাঁদের ঘুম ভাঙিয়ে জানাতে সাহস করে নি। কারণ চাকরী যে বড় বালাই।

তাও আবার খোদ লাটসাহেবের চাকরী—রাজভবনের ফ্রি ফারনিসড্ কোয়ার্টার, নো লোডশেডিং, ব্যারাকপুরের লাটবাগানের আনাজপাতি, টেষ্ট ক্রিকেটের টিকিট, বা হয়তো কখনও সখনও রাজভবনের ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রি দিয়ে নিজের পরিবারের একটু আধটু উপরি পাওনা বেগার কাজও করিয়ে নেওয়া চলে।

বাংলার রাজ্যপাল ও রাজভবনের দুর্গাপুজা

কলকাতা কেন সমগ্র পশ্চিম বাংলার ক'জনেই বা জানে যে এই কলকাতার সুন্দর রাজভবনে প্রায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে অর্থাৎ সেই দেশ স্বাধীন হবার সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বৎসর মহাধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যদিও বছর দুই এটা কলকাতা দূরদর্শন মারফৎ বেশ ফলাও করে দেখানো হচ্ছে।

লাটের দুর্গাপুজো কলকাতার যে কোনো নামী দুর্গাপুজোর চেয়ে কম জৌলুষ-পূর্ণ নয়, এটা হয়তো অনেকের জানা নেই।

এই দুর্গাপুজোয় থাকে নানা রকমের ইলেকট্রিক লাইটের সুদৃশ্য খেলা, থাকে কলকাতার সব চেয়ে বিখ্যাত ডেকরেটার দিয়ে পুজো প্রাঙ্গণ সজ্জা, থাকে বিখ্যাত বিখ্যাত চলচ্চিত্র ছবির প্রদর্শনী, থাকে নামী রেডিও ও টি-ভি আর্টিষ্ট দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুন্দর মাইফেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী যখন কলকাতার এই অসামান্যা রূপসী রাজভবন তৈরী করান তখন হয়তো কোন ইংরেজ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি যে এই কলকাতা রাজভবনের গভর্ণর এস্টেটের অন্তর্গত ছয় নম্বর ওয়েলেসলী প্লেসের বিরাট প্রাঙ্গণে কালের কুটিল গতিতে একদিন এখানে মা দুর্গা তাঁর পুত্র কন্যা—কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে সদলবলে পুজো গ্রহণ করতে আসবেন তাও সংবৎসর।

এখানে জানিয়ে রাখি অফিস পাড়ার রাজভবন চত্বরের আশে পাশে সমগ্র ডালহৌসী স্কোয়ারে মাত্র দুটি দুর্গাপুজো হয় এখন পর্যন্ত।

একটা হচ্ছে খোদ রাজভবনের চত্বরে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে। আর একটা এই কিছুকাল ধরে—১ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের কেন্দ্রীয় অফিসের এক অবিবাহিত কেয়ারটেকার মিঃ ব্যানার্জির নিজের একান্ত ঘরোয়া পুজো। ঐ অফিসের একটু ছোট্ট আঙ্গিনায় নমোঃ নমোঃ করে।

কলকাতাবাসী মাত্রেরই সকলেরই জানা আছে যে দুর্গাপুজোর সময় নিদেনপক্ষে অন্তত সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই কয়দিন সদাচঞ্চল অফিসপাড়া এই ডালহৌসী স্কোয়ার (এখন বি-বি-ডি বাগ) একেবারে খাঁ খাঁ করে।

ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মিনি, রিক্সা, অটো, কিছুরই তখন দাপট থাকে না। যেন মনে হয় দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তারাও নিজেদের স্ব স্ব আস্তানায় কিছুটা সুস্থির হয়ে দম নিয়ে নিজেরা হাসি-ঠাট্টা করে—তাদের ভাবখানা এই রকম যেন অফিস পাড়া ডালহৌসীতে আজ বেরুলেও চলে, না বেরুলেও চলে, সোয়ারী তো পাওয়া যাবে না।

অর্থাৎ পুজোর ক'দিন ডালহৌসী পাড়ায় শুধুমাত্র রাজভবনের ঢাকির উচ্চস্বরে

ঢাক ও কাঁসির আওয়াজ আর তার মাঝে মাঝে নীচু স্বরে লাউড স্পীকারে রবীন্দ্র-সংগীত চলে একটানা দিনরাত্রি নদীর স্রোতের মতো—যে ছিল আমার স্বপনচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি, ওগো বুঝিতে পারিনি।

বাঙালীদের জাতীয় পুজো এই দুর্গোৎসব, যেমন খৃষ্টানদের বড়দিন, বিহারীদের ছট্‌পুজো, উত্তর প্রদেশের দেওয়ালী, কেরালার ওনাম, মহারাষ্ট্রীয়ানদের গণেশ পুজো ও মাদ্রাজীদের পংগল ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশ সদ্য স্বাধীন হবার পর উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনোরোই আগষ্ট চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রথম পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকেই কলকাতা রাজভবনের আবাসিকদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো যে যখন দেখা যাচ্ছে এই নূতন রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারী মাঝে মাঝেই রাজভবনের একতলার ঐতিহাসিক মার্বেল হলে ভাগবৎ কীর্তনের আসর বসাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে সত্যনারায়ণ পুজোরও ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন এই রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারীকে ধরে দু মাস বাদেই এই স্বাধীন ভারতের এই কলকাতার রাজভবনে প্রথম আনুষ্ঠানিক দুর্গাপুজো শুরু করতে হবে।

আর হলোও তাই।

রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী তার ষ্টাফদের এক কথায় এই দুর্গাপুজোর সম্মতি দিয়ে দিলেন এবং ভারত স্বাধীন হবার পর সেই ১৯৪৭ সালের দুর্গাপুজো আজও সাড়ম্বরে কলকাতার রাজভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, নিষ্ঠা সহকারে, অতি ধুমধামে, অতি জৌলুষে।

দুর্গাপুজোর দীর্ঘ ছুটিতে ডালহাউসী স্কোয়ারের সদাচঞ্চল জীবনে এই পুজোর দিনগুলি এই অঞ্চলের চারিপাশের অধিবাসীদের বেশ আনন্দ দান করে।

এবং এও সত্য এখন ডালহাউসী স্কোয়ার সেই বৃটিশ জমানার মতো জনবিরল নয়, এখানে বহু বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে একত্রে। খুঁজলে দু'একজন দলছুট চীনা ও জাপানীরও খবর মিলবে।

আর এ ছাড়াও এই লাটবাড়ীর লাটের দুর্গাপুজো দেখতে স্বদেশী বহু গণ্যমান্য লোক সাহেব-সুবো এ কদিন এখানে প্রতিমা দর্শনে আসেন।

এখন সে সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলি।

প্রথমেই বলি যে, যেহেতু স্বয়ং রাজ্যপাল পুজো কমিটির চিরস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, সেহেতু প্রথা করে প্রায় প্রতি দুর্গাপুজোর মহাঅষ্টমীর দিন রাতে সন্ধ্যারতির সময় অবশ্যই তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে এই পুজো দেখতে আসবেন। থাকেনও প্রায় ঘণ্টা খানেক। অনেক সময় আরও বেশ কিছুক্ষণ।

তবে এখানে বলা দরকার যে বাংলার গভর্ণর সেই ইংরেজ জমানা থেকে এখন পর্যন্ত বছরে দু'বার—এপ্রিল ও অক্টোবর—রুটিন মাফিক হিল ষ্টেশন দার্জিলিং পরিভ্রমণে যান। সুতরাং কোনোবার পুজো যদি অক্টোবরের শেষাশেষি পড়ে তখন গভর্ণর ও তাঁর অফিসের কিছু ষ্টাফ হয়তো বা এই পুজোতে সেবার থাকতে পারেন না।

কিন্তু মজার কথা, যেহেতু প্রতিদিন দমদম এরোড্রামে বাগডোগরাগামী প্লেনে পাইলটের জিম্মায় গভর্ণরের নিত্যদরকারী চিঠিপত্রের মেল ব্যাগ পৌঁছে দেবার নিয়ম আছে, তাই দুর্গাপূজোর সময় তখন অবশ্যই তার সঙ্গেই রাজ্যপালের চিরাচরিত নির্দেশ মতো প্রতিদিনের দুর্গাপূজোর কিছু শুকনো প্রসাদ ও পূজোর আশীর্বাদি ফুল পাতা একটি অন্য প্যাকেটে পাঠানো হয়। এর অন্যথা কখনও হতে দেখা যায় নি। আমি তো পারতপক্ষে দেখিনি।

যখন আবার রাজ্যপাল ঐ পূজোর সময় স্বয়ং কলকাতায় থাকেন তখন আবার অনেক সময় শিক্ষাপ্রদ অনেক জিনিষ ও চোখে পড়ে এই পূজোর দৌলতে।

যেমন আমার কলকাতা রাজভবনের দীর্ঘদিনের বিজড়িত জীবনে আমি মাত্র আঙ্গুলে গোনা দু'জনকেই মাত্র স্বচক্ষে দেখেছি যে স্বয়ং রাজ্যপাল হয়ে, রাজভবনের সবকিছু তুচ্ছ প্রটোকল স্বইচ্ছায় ঝেড়ে ফেলে, রাজভবনের সেই মেন বিল্ডিং থেকে সটান নিজ পায়ে হেঁটে এসে রাজভবনের পূজো প্রাঙ্গণে পূজোর আরতি দেখতে এসেছেন।

সঙ্গে অবশ্যই সিকিউরিটি পারসোনালেরা দূরে দূরে থেকে তাঁকে লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু রাজ্যপালের প্রটোকলের দোহাই এ রাজ্যপাল সামান্য এটুকু হাঁটা পথ এই পূজো প্রাঙ্গণে এয়ার কনডিসনড্ গাড়ীতে চড়ে আসেননি যা অন্যান্য সব রাজ্যপালদের বেলায় চাক্ষুষ দেখেছি। এবং যা দেখে মনে প্রাণে বেশ দুঃখও পেয়েছি—"ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।"

এই দু'জন রাজ্যপাল হচ্ছেন মানুষ হিসেবে সদা হাস্যময় এবং প্রাণ পুরুষ পুণ্যশ্লোক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এবং রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

সালটা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় একটি সাংস্কৃতিকদল সেবার চীন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন।

সেই দলের দলপতি বা লীডার ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্র, এম-এ, বি-এল। আবার সেই দলেরই অন্যতম মাননীয় সভ্য ছিলেন সেদিনের ও সর্বকালের ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রবাদপুরুষ পরলোকগত বিখ্যাত গায়ক ডি. ভি. পালুশকর।

দেখা যেতে লাগলো যে যখনি চীনের কোন বৌদ্ধমঠে বা গুম্ফায় এই ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলটি মহান বুদ্ধকে প্রণামের জন্য মঠের ভেতর ঢুকছেন তৎক্ষণাৎ ডি ভি পালুশকর পায়ের জুতো খুলে তবে মঠের মধ্যে প্রবেশ করছেন। উনি ছাড়া দলের সবাই কিন্তু জুতো পায়ে বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে কার্পেটের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে দ্বিধাহীনভাবে চলাফেরা করছেন।

পালুশকরজী কিন্তু প্রত্যেক মঠে যথা পূর্ব তথা পরং—এই অবস্থা। জুতো খুলে মঠে ঢুকছেন, ভক্তিভরে মূর্তিকে প্রণাম করছেন, মঠের বাইরে আসছেন, জুতো পরছেন, আবার দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্য মন্দিরে ঢুকছেন। কিন্তু সব সময়ে সদা হাস্য মুখ।

হঠাৎ বার বার এই দৃশ্য দেখে সেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের চীনা গভর্ন-মেন্টের পরিদর্শক পালুশকরজীকে এর পর জুতো সমেত মঠেঢুকতে অনুরোধ জানালেন। পালুশকরজী মুহূর্তমাত্র দেরী না করে তাঁকে উত্তর দিলেন—আমার দেশে আমার মা চিরদিন বলতেন গীর্জায়, মঠে, মন্দিরে, দেবালয়ে, মসজিদে যেখানে যখন প্রণাম করতে ঢুকবে তখন সকল সময়ে জুতো মন্দিরের বাইরে খুলে তবে ভেতরে ঢুকবে—পায়ে মোজা থাকলেও থাকতে পারে তাতে অসম্মানের কিছু নয়। মঠে মন্দিরে মসজিদে—মা সর্বদা বলতেন—ভগবান অধিষ্ঠান করছেন তাই আমার পরোলোকগত মায়ের কথা স্মরণ করে আমি আমার মাকেই সম্মান করছি। তা ছাড়াও আমি ভারতবাসী বুদ্ধের দেশের লোক—এটাই আমাদের রীতিনীতি।

চীন পরিদর্শক অধ্যাপকটি পালুশকরজীর এই কথা শুনে সাশ্রুনয়নে পালুশকরজীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি মহান ভারতীয়। বুদ্ধের দেশের লোক। তুমি আমার ভগবানকে ঠিক ঠিক চিনেছ।

আর ওদিকে দূরে দলের অধিনায়ক মিঃ মৈত্র ও তাঁর ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলবল তখন ক্যানটন্ শহরের সুদূর পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে সায়হ্ন সূর্যের রং-এর খেলা দেখতে মশগুল।

* * *

রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং তো আমার সামনেই উচ্চপদস্থ রাজভবনের একজন কর্মকর্তা কর্মচারীকে বলেই ফেললেন—মা'র কাছে সন্তান যাবে পুজোতে দর্শন করতে তাও আবার গাড়ী চেপে। তা হয় না মিঃ মুখার্জী। আমি খোদ বারাণসীর লোক। তিন পুরুষ ধরে আমাদের বাস ৬৬ নং ঈশ্বর গাংগী রোড, বারাণসী।

নিজের মা-কে দেখে দেখেছি সেই বৃদ্ধ বয়সেও চিরকাল খালি পায়ে কাক ডাকা প্রত্যুষে ধীরে ধীরে গঙ্গা স্নান সেরে মন্দিরে মন্দিরে পুজা দিয়ে ফিরতে। আমি আমার রাজভবনের দুর্গা মায়ের দর্শনে হেঁটে হেঁটেই যাবো। গাড়ীর কোন প্রয়োজন নেই। বৃটিশ জমানার চাপানো রাজ্যপালের কোনো প্রটোকল আমি এখানে মানবো না, মানা উচিতও নয়।

কথাগুলি শুনে আমার মনে পড়ে গেল এই রাজভবনেরই জনৈক রাজ্যপালের খৃষ্টান সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জি আই-এ-এস-এর কথা—হ্যাঁ, আমি এই দুর্গাপুজার চাঁদা নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু আপনারা চাঁদার রিসিট বই-এ লিখবেন এই টাকা দুর্গাপুজার চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি না। লিখবেন For decoration purpose of Puja. অন্য কিছু কিন্তু নয়।

কথাগুলি শুনে ভেবেছিলাম, হায়, তুমি সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জি। তোমাতেও তোমার রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমারের কতো পার্থক্য। তোমরা দুজনাই খৃষ্টধর্মাবলম্বী

তোমাদের উপাধিও প্রায় এক। কিন্তু তোমাদের মধ্যে দৃষ্টির উদারতার কতো তফাৎ।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারকে যখন দুর্গাপূজার প্রসাদ দিতে গেছি তখন তিনিও তাঁর সাধ্বী পত্নী বঙ্গবালা সেই প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে তবে গ্রহণ করেছেন। আর সেই রাজভবনের খৃষ্টান সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জি তিনি যেন ধর্মের আবিল পঙ্কিলে কোথায় যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর দম্ভের কথা—আমার চাঁদাটা লিখবেন ফর ডেকোরেশন পারপাস, পূজার জন্য নয়।

কে বুঝাবে একজন ভারতীয় দাম্ভিক খৃষ্টান আই-এ এস সেক্রেটারীকে যে ধর্ম ও পূজা একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার ভিন্ন পথ মাত্র। সেখানে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমানের কোনো জাতি ভেদ নেই, নেই কোনো অহেতুক ছ্যুৎমার্গের ছলা কলার বাহ্যিক প্রয়োজন।

এখন বলি রাজভবনের দুর্গাপূজার কেমন ভাবে চাঁদা ওঠে বা কী রকম ভাবে এখানকার অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হয় বা পূজার কতোদিন আগে থেকে এর আরম্ভের যোগাড় যন্ত্রের সূচনা হয়।

অনেকের হয়তো জানা নেই যে খোদ রাজভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে দোতালায় একটা বিখ্যাৎ কাঠের গ্যালারী করা সর্বাঙ্গ সুন্দর বৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে বৃটিশ জমানা থেকে যাকে বলা হয়ে আসছে কাউন্সিল চেম্বার।

এই সেই বৃটিশ আমলের বিখ্যাত কাউন্সিল চেম্বার যেখানে পৃথিবীর হেন কোন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ বা গ্রেট পারসোনালেটি নেই যাঁরা এখানে কোনো না কোনো সময়ে কূটনৈতিক শলাপরামর্শের বা নানা রকম মিটিং-এর আসর না বসিয়েছেন।

বৃটিশ জমানার দুশো বছরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, না হয় ছেড়েই দিলাম গর্ভণর জেনারেল ডালহাউসী, কর্ণওয়ালিশ, বেণ্টিক, কার্জন বা হেষ্টিংস-এর কথা কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর এখানে এই কাউন্সিল চেম্বারে মিটিং করতে দেখেছি ক্রুশ্চেভ্, বুলগেনিন, জওহরলাল, এলিজাবেথ, চৌ-এন-লাই, কর্নেল নাসের, মার্শাল টি টো, হো চি মিন, মোরারজী দেশাই, প্রেসিডেণ্ট ফকরুদ্দীন আলী আমেদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান, মাদার টেরেসা, মিস হেলেন কেলার প্রভৃতি কাকে না।

এই তো সেদিন সাতের দশকে এই কাউন্সিল চেম্বারে মিটিং করতে দেখেছি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে।

এখানে মিটিং করেছেন বা শলাপরামর্শের জন্য মিলিত হয়েছেন নানা দেশের পৃথিবীর নানা প্রান্তের লোক জন। আসতে কেবল দেখিনি মার্কিন মুল্লুকের হোমড়া চোমড়াদের। তবে আমেরিকার ম্যাকনামারা একবার এসেছিলেন ওয়ার্লড

ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে রাজ্যপাল ধর্মভীরার সময়ে ষাটের দশকের শেষদিকে।

প্রতি বছর আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে রাজ্যপালের সেক্রেটারীকে চেয়ার পারসন করে এই এখানেই কাউনসিল চেম্বারে সপ্তাহে সপ্তাহে রাজভবনের দুর্গা পুজার সম্মিলিত মিটিং হয়ে থাকে।

রাজভবনের প্রায় প্রতিটি কর্মচারী আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের এই দুর্গাপুজার মিটিং এ যোগদান করেন। হয় সেখানে নানারকমের আলোচনা। কে কতো টাকা চাঁদাআদায় করবে। কাকে কাকে চাঁদার বই দেওয়া হবে এবার। কে এবার পুজোর সেক্রেটারী হবে। রাজ্যপাল কতো চাঁদা দেবেন, সেক্রেটারীই বা কতো বা অফিসের অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীরাই বা কতো চাঁদা দিতে পারেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রতি বছরেরই প্রায় ঠিক থাকে রাজ্যপাল দেবেন দুশো টাকা, রাজভবনের অন্যান্য অফিসারেরা একদিনের বেসিক পে, অন্যান্য রাজভবনের কর্মচারীবৃন্দ দশ, পনেরো, পঁচিশ, ত্রিশ টাকা যে যা পারে।

চাঁদার বিল বই প্রায় সময়েই রাজভবনের খাস নিজস্ব প্রেস ১নং লারকিন লেন থেকে ছাপা হয়ে থাকে।

এবং এই মিটিংগুলির মাধ্যমেই প্রায় ঠিক হয় কলকাতার অমুক অমুক মিনিষ্টার, ডাক্তার, এামব্যাসী পারসোনাল, নানা ধরনের গণ্যমান্য লোকের কাছে যাওয়া হবে। তাঁদের স্ব-ইচ্ছায় এই পুজোতে চাঁদা নেবার জন্যই নয়, যাওয়া হবে আমন্ত্রণ জানাতে।

এমনকি রাজভবনের চতুর্দিকে যে দোকান পাসার আছে, আছে সি টি ও অফিস, টেলিফোন ভবন এ জি-বির কেয়ার টেকার, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর সিকিউরিটি অফিসার ইত্যাদি তাঁরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই পুজোতে চাঁদা দিয়ে যান।

বেশ কয়েকজন কলকাতার নাম করা ডাক্তার তো পুজোর আগে ভাগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একশো টাকা করে চাঁদা অগ্রিম এই পুজোতে পাঠিয়ে দেন।

রাজভবনের মন্ত্রীনিবাসে একদা বহুদিনের বাসিন্দা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাড়ী থেকেও এই পুজোতে চাঁদা আসে। এবং এও শোনা যায় যে স্বয়ং বিধান চন্দ্র রায় ও জীবিতকালে এই পুজোতে চাঁদা পাঠিয়ে দিতেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের চাঁদা মিলিয়ে প্রায় হাজার দশেক টাকা এই রাজ্যপালের পুজোতে ওঠে।

তা ছাড়া আসে ব্যারাকপুরের লাট সাহেবের বিশাল বাগান থেকে ফল ফলারী, নারকেল. লেবু, আতা, বেল জামরুল, কলা, পেঁপে, মোসাম্বী, বাতাবী লেবু ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আসে ঝুড়ি ঝুড়ি ভর্তি টাটকা লাল গোলাপ, গন্ধরাজ, শিউলী, টগর, জবা, কাঁটচাপা, সন্ধ্যামনি প্রভৃতি ফুল।

আসে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কলাপাতা, তুলসীপাতা, যবের শীষ, নানা রকমের আনাজপাতি—বেগুন, টমেটো, আলু, গাজর, কাঁচালঙ্কা, উচ্ছে, পটল, পাতিলেবু প্রভৃতি।

রাজ্যপালের খাস ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট লেগে যায় প্যাণ্ডেলে ঝাড়বাতি, টিউব লাইট, ফ্যান লাগাতে অসীম উৎসাহে।

এখানে বলা হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না যে রাজভবনে সেই বৃটিশ আমল থেকে এখনও সব রকমের কাজের লোকজন চাকুরীতে বহাল রয়েছে যথা আছে ধোবা, নাপিত, রাজমিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, কামার, ছুতোর, ম্যাসেঞ্জার, পিওন, ড্রাইভার, খিদমৎগার, মালী, মজদুর ইত্যাদি। এরাও সবাই এক যোগে এই পুজোতে হাত লাগায় যখন যার যে রকম প্রয়োজন হয়।

রাজভবনের বৃটিশ আমলের তখনকার বিদেশ থেকে আনা সুন্দর সুন্দর নক্সা করা তাঁবুগুলি এই সেদিন জলের দরে বিক্রী হয়ে যাবার পর এখন আর রাজভবনের কর্মচারীরা নিজেরই সেই সব তাঁবুর সুন্দর সুন্দর কাপড় দিয়ে অভূতপূর্ব মনোমুগ্ধকর পুজো প্যাণ্ডেল রচনায় আগের মতো নিজেরা হাত লাগান না। এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনেকের বেশ মনোকষ্টও আছে।

এখন কলকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত প্যাণ্ডেলওয়ালাদের ডাক দেওয়া হয় রাজ্যপালের এই অতুলনীয় দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেল তৈরী করবার জন্য। রাজভবনের কাজ তাই অনেক কম খরচেও তাঁরা এগুলি করে দেন।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেণ্টের লোকরঞ্জন শাখা দুর্গাপুজায় এখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নানারকম নাটক মঞ্চস্থ করে। এই তো সেবার হল তাঁদের বিখ্যাত মৌহুয়া নাটক।

রাজভবন এস্টেটের এই বিরাট দুর্গাপুজো প্রাঙ্গণে কলকাতাস্থিত নানা বিদেশী দূতাবাস থেকে এখানে অল্প দৈর্ঘের নানারকম সুন্দর সুন্দর ফিল্ম দেখানো হয়।

বিনা পারিশ্রমিকে যেমন কলকাতা আকাশবাণীর ও দূরদর্শনের অনেক নামী শিল্পী রাজভবনের এই দুর্গাপুজায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজ্যপালকে গান শুনিয়ে যান, তেমনি দেখা যায় কলকাতার পৃথিবী বিখ্যাত অনেক ম্যাজিসিয়ানও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে এখানে ম্যাজিক দেখিয়ে যান।

রাজ্যপালের পুজাকমিটি তাঁদের কে হয়তো সামান্য কিছু প্রেজেণ্টেশন বা উপহার দিয়েই সে যাত্রায় রাজ্যপালের মুখ রক্ষা করেন।

মাঝে মাঝে এই পুজোর ক'টা দিনের মধ্যে কোন একদিন সঠিক বেছে নিয়ে অর্থাৎ সেদিন রাজ্যপাল এই পুজোপ্যাণ্ডেলে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে রাজী থাকেন

সেদিন এই রাজভবনেরই ছেলে মেয়েরা তাদের বাবা মায়ের উৎসাহে উদ্দীপনায় কিছু একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবার চেষ্টা করে—রাজ্যপালের সঙ্গে কিছুটা মুখোমুখি পরিচিত হবার জন্য।

কিন্তু ভারি মজার হয় এই অনুষ্ঠানগুলি।

যেহেতু রাজ্যপাল বলেছেন ঐ অনুষ্ঠানে তিনি কিছুক্ষণ কাটাবেন, আর যায় কোথায়। সবাই, সে রাজ্যপালের সেক্রেটারী থেকে লোয়ার ডিভিসন কেরানী পর্যন্ত খালি চেষ্টায় থাকে তার ছেলে মেয়ে, বা শ্যালীকা শ্যালক বা ঐ সম্পর্কের কেউ যে সেই বিশেষ সময়টা গাইবার বা আবৃত্তি করবার বা নাচবার চান্স পায়।

এ ব্যাপার নিয়ে অনেক সময়ই দুর্গাপূজার ঠিক আগে অফিসে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত প্রায় হয়ে যায় এই প্রোগ্রাম ঠিক করা নিয়ে—এও বহুবার দেখেছি।

একবার হলো কী মিঃ খাস্তগীর যিনি রাজভবনের টেলিফোনে আবহেক তাঁর চেনাজানা অনেককেই বলে বেড়ান যে তিনি রাজ্যপালের অ্যাসিসটেন্ট্ সেক্রেটারী—আসলে কিন্তু তিনি গভর্ণরের জুনিয়র হেড অ্যাসিসটেনট—তিনি আগামী বছরে যেহেতু রিটায়ার করছেন সুতরাং এবার রাজ্যপালের সামনে তাঁর বড় মেয়েকে আগে ভাগে গান করাবেনই, যদি তাঁর গান শুনে রাজ্যপাল তার চাকরীর একসটেনসন বা নিছক মেয়েটির এখানে একটা চাকরী জুটিয়ে দেন। মেয়েটি কিন্তু সত্যি সত্যিই ভাল গান গায় ও ধর্মতলা কনভেনট থেকে সদ্য পাশ করা। চাকরী তার অবশ্য এখানে হয়েছিল।

একবার তো নিজের কানে শুনেছি কোন এক পদস্থ কর্মচারী তাঁর মেয়ের এই রকম একটা গানের শেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজ্যপাল ধাওয়ানকে আগবাড়িয়ে বললেন—স্যার এই পূজোর পর আমি এই নভেম্বরে রিটায়ার করছি।

চতুর রাজ্যপাল ধাওয়ান সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন মিঃ বোস খালি চাকরী থেকে কেন, সবাইকেই সময় হলে এ পৃথিবী থেকেই রিটায়ার করতে হবে। এতে আর বলবার কী আছে। রিটায়ার করে সুস্থ থাকুন এটাই আমি আশা করছি।

রাজ্যপালের কথাটা আমি তাঁর পাশে ছিলাম বলেই শুনতে পেলাম না হলে প্যাণ্ডেল সুদ্ধ লোক রাজ্যপালের এ কথা শুনে হয়তো একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠতেন।

মিঃ বোস করুণ চোখে রাজ্যপালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে অবশ্য কেন জানিনা সেই মিঃ বোস এক বছর রাজ্যপালের দয়ায় একসটেনসন পেয়েছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড তিনি অফিসে বাইরে সকলকে ডেকে ডেকে বলে বেড়াতে লাগলেন যে যেহেতু তিনি রাজ্যপালের এসেনসিয়াল হ্যাণ্ড তাই রাজ্যপাল তাঁকে ছাড়তে চাইছেন না, তাঁর চাকরী করবার আদাও ইচ্ছা নাই।

কিন্তু যেটা প্রায় কলকাতা রাজভবনের বেশ কিছু কর্মচারীর শালীনতাবিহীন অভদ্র আচরণ বলে মনে হয় সেটা হচ্ছে এখানে আপার ডিভিসন ক্লার্ক রাজভবনের চৌহদ্দির বাইরে বলে বেড়ায় তিনি গভর্ণরের পি, এ, হেড অ্যাসিসটেন্ট বলছেন সেক্রেটারী, পি, এ, বলছে-পি আর ও, ট্র্যানসপোর্ট মুনসী বলছে গ্যারাজ সুপারিনটেনডেনট, চাপরাশি বলে লিফটম্যান, ওয়ার্ক অ্যাসিসটেনট বলছে ইনজিনিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য্য ব্যাপার রাজ্যপালের খোদ ক্যাম্প পোষ্টাপিসে যখন ঐ রকম ভুয়ো ডেজিগনেসন দিয়ে চিঠি পত্র বা জিনিষের পার্সেল আসে তখন খোদ রাজভবনে হৈ চৈ পড়ে যায়। কিন্তু দোষী ব্যক্তিটী তখন অমলান ভাবে মিথ্যা বলে যান— আমি কেন কাউকে আমার ঐ রকম বাড়িয়ে ডেজিগনেসন বলতে যাবো। আমি যা আছি আমি তাই। আমি আপার ডিভিশন ক্লার্ক।

একবার হলো কী তখন গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ মজুমদার আই-এ-এস। ভীষণ কর্মনিষ্ঠ, সৎ ব্যক্তি। কিন্তু অফিসের নিয়ম কানুনে সাক্ষাৎ পাক্কা বৃটিশ। বাঘা লোক। অফিসে পান থেকে চুণ খসলেই রেগে টং।

তাকে রাজভবনের পি-বি-এক্স থেকে টেলিফোন অপারেটার একটা বাইরের লোকাল ফোন ধরিতে দিল—স্যার কে যেন চাইছে বাইরে থেকে মিঃ দত্ত বলে গভর্ণরের খোদ সেক্রেটারীকে। আমি তো জানি মিঃ অমুক দত্ত এখানকার হেড অ্যাসিসটেনট। দয়া করে আপনি ফোনে একটু কথা বলুন।

আর যায় কোথায়। সেক্রেটারী মিঃ মজুমদার ফোনে তো ভদ্রলোককে যা তা বললেনই, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ দত্তকে ডেকে এমন কড়া কথায় কড়কিয়ে দিলেন যে তারপর এ রকম মিথ্যে ফোন অনেকদিন আর রাজভবনে আসা বন্ধ হলো। ভেতরের ব্যাপার কিন্তু রাজভবনের টেলিফোন অপারেটারদের ভীষণ রাগ ছিল ঐ হেড এ্যাসিসটেনটু হামবাগ মিঃ বি দত্ত-এর ওপর। মিঃ দত্ত তার পোষ্টের বলে প্রায়ই টেলিফোন অপারেটরদের মাস মাইনের বিলে অনেক কিছু পাওনা গণ্ডা কেটে দিতেন।

কলকাতার এই রাজভবনে সেই বৃটিশ আমল থেকে সুপারিনটেনডেনটের ছড়াছড়ি।

কেউ গুদাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেউ গ্যারাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেউ গাডেন্ড সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেউ বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গভর্ণর'স এসটেটেন।

এঁদের কিন্তু মাইনের স্কেল বা অফিসিয়াল পজিশন একের সঙ্গে অন্যের ঠিক আসমান জমির ফারাক। কেউ হয়তো শুধুই ফোর্থ ক্লাশ ষ্টাফ আবার কেউ বা এঁদের মধ্যে এ ক্লাশ গেজেটেড অফিসার।

কিন্তু আসলে যিনি চাকরীর বড় পজিশনে আছেন তিনি কিন্তু চুপচাপ। কিন্তু যাঁরা একটু খাটো পজিশনের মানুষ এই রাজভবনে চাকরী করে তাদের কিন্তু বাক-ফট্টাই বেশ লম্বা চওড়া। তাই এই রাজভবনে চাকরী করে যাঁরা

এখানে স্বেচ্ছায় কোয়ার্টার নেননি—বাইরে থেকে অফিসে আসেন—তারা মাঝে মধ্যে এই সব মিথ্যে ঘটনা শুনে ধিক্কারে মুখ ফসকে বলে ফেলেন—রাজভবনের বাসিন্দারা ভাজছে হয়তো ঝিঙে, বড়াই করে বলছে কিন্তু পটল ভাজছি। যত্তো সব হামবাগের দল।

যাক যা বলছিলাম। গভর্ণরের সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা।

তখন শান্তি স্বরূপ ধাওয়ান বাংলার রাজ্যপাল। উনিশো শো সত্তর সাল। আটই অক্টোবর মহাষ্টমী পুজো হচ্ছে রাজভবনে। তিনি সদলবলে সন্ধ্যার সময় পুজো প্রাংগণে এসেছেন রাজভবনের পুজোর সন্ধ্যারতি ও তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে।

রাজ্যপালের সামনে কে আগে গান গাইবে তার জন্য আবৃত্তিকার ও গাইয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে এবং সুচতুর রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেব সেটা মনে মনে টেরও পাচ্ছেন।

হঠাৎ সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন তাঁরই সামনে মঞ্চে তাঁরই এক ডেপুটী সেক্রেটারী বই হাতে রিসাইটেসন জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন। আর তখন মাইকে ঘোষিত হচ্ছে এবার ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শা-জাহান কবিতা রিসাইটেসন করে শুনাচ্ছেন।

মিঃ ব্যানার্জি সবেমাত্র দু' লাইন কবিতাটি বই দেখে বলছেন আর রাজ্যপাল ধাওয়ান তখন সটান উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন—মিঃ ব্যানার্জি রিসাইটেসন করছেন না, কবিতাটি পড়ে শুনাচ্ছেন এটা বলাই বোধ হয় এখানে সমীচীন হবে।

আর যাবে কোথায়? চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। মঞ্চের তড়িঘড়ি ড্রপসীন ফেলে দেওয়া হল।

খানিক পরে ড্রপসীন উঠলে ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ ব্যানার্জী নিজেই নিজের ভ্রম সংশোধন করে করুণ কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, শা-জাহান কবিতাটি পড়ছি, রিসাইট করছি না। রাজ্যপাল ঠিকই ধরেছেন। রিসাইট করা মানে স্মৃতির থেকে সেটা মুখস্থ বলা। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

প্রাংগণ শুদ্ধ লোক ডেপুটীর কথায় হেসে উঠলো। এই ডেপুটী সেক্রেটারীর বাচ্চা কুচো কাচাকে সরিয়ে দিয়ে গভর্ণর ধাওয়ানকে আগে ভাগে সামনে এসে আবৃত্তি শোনানোর তৎপরতাকে উপস্থিত রাজভবনের অনেকেই বে-পছন্দ করছিল। তাঁদের কথা হলো—যেন বুড়ো গরু সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকেছে।

এবার রাজভবনের এই পুরাতন প্রায় পঞ্চাশ বছরের দুর্গাপুজোর জনৈক পুরোহিত মশায়ের একটা অশ্রুসজল কাহিনী বলি।

সালটা ছিল ১৯৭৫। দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিন। তখন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন পদ্মভূষণ মিঃ এ এল ডায়াস। তিনি মহাষ্টমীর দিন সস্ত্রীক সন্ধ্যাবেলায় এই পুজো প্যাণ্ডেলে নিয়ম মাফিক দুর্গা ঠাকুরের আরতি দেখতে আসবেন এটা আগে থেকেই সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। রাজ্যপালের দৈনিক

এনগেজমেন্ট লিস্টেও যথারীতি সেই রকম ভাবে সময়ের নির্দেশ ছাপা আছে।

কিন্তু হঠাৎ রাজভবনের পুজা প্রাঙ্গণে রাজ্যপালের সেক্রেটারী মারফৎ খবর এসে পৌঁছুল যে যেহেতু রাজ্যপাল ডায়াস সন্ধ্যের সময় সস্ত্রীক তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ী নিউ আলিপুরে এক নিমন্ত্রণে হঠাৎ যাবেন স্থির করেছেন বলে পুজো প্যান্ডেলে সন্ধ্যার আগেই তিনি যেতে চান।

হৈ হৈ ব্যাপার। রাজ্যপালের বসবার জন্য সিংহাসন আদলের চেয়ার [যেটা নাকি কলকাতায় এখনও রাজ্যপালের কোথাও অনুষ্ঠান থাকলে অবশ্যই রাজভবন থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।] আর বৃটিশ জমানায়, এটা তো একেবারে আবশ্যিক ছিল। এখন যদিও এর ব্যাপারে মাঝে মাঝে গলতি থেকে যায়। সব সময়ে এটা মানা হয় না। এর থেকেই বোধ হয় ইংরেজী কথা হয়েছে চেয়ারের মর্যাদা তা রাজভবন থেকে আনা হলো। লাল কার্পেট বিছানো হলো রাস্তার ঠিক যেখান থেকে হেঁটে রাজ্যপাল সস্ত্রীক পুজো প্যান্ডেলে আসবেন। বেশ কয়েকখানা সুন্দর রেক্সিনের গদি আঁটা চেয়ারও রাজভবনের বল রুম থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হলো—রাজ্যপালের সেক্রেটারী এ-ডি-সি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এঁদের বসবার জন্য।

দু চার বাক্স ঠান্ডা কোকাকোলা (তখনও ভারত থেকে পৃথিবী বিখ্যাৎ কোকা-কোলা কোম্পানীকে বদনাম দিয়ে হঠিয়ে দেওয়া হয়নি) সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনের উল্টোদিকের একটি দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে মজুত করা হলো। রাজভবনের পুলিশের সিকিউরিটি চারিদিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। এ ছাড়া তো রইল সাদা পোশাকের সি-আই-ডি আনাচে কানাচে। রাজভবনের দুর্গাপুজার দেখনাই কেতাদুরস্ত আটসাট ব্যাপার সবই তো করা গেল।

কিন্তু এদিকে মহাগন্ডগোল বাধিয়ে বসলো স্বয়ং পুরোহিত ঠাকুর—বোধিসত্ত্ব আচার্য মশায়। সবে তিনি এই বছর চারেক হলো রাজভবনের দুর্গাপুজা করছেন বেশ সুসংহত সুষ্ঠাচারে ও নিয়মনিষ্ঠাভাবে। নিজে তিনি কাব্যতীর্থ তার উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাশ। পুজোর স্তোত্র ও উচ্চারণ করেন বেশ মোটা ভারী গলায় সুর করে অনেকটা কলকাতা রেডিওর মহিষাসুর মর্দিনির সূত্রধর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের অনুকরণে।

বোধিসত্ত্ব বাবু এমনিতে বেশ দিল খোলা হাসিখুশি বেঁটে ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভারী জেদী একরোখা মানুষ।

এই রাজভবনের দুর্গাপুজা এর পূর্বে বোধিসত্ত্ব বাবুর বাবা সাংখ্যবেদান্ততীর্থ গণেশচন্দ্র আচার্য মশায় এতোদিন একনাগাড়ে বহু বছর করে আসছিলেন। তা প্রায় গত পঁচিশ ত্রিশ বছর হবে। তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ার পর রাজভবনের পুজো কমিটি কোন রকম বিতর্কিত ঝক্কি-ঝামেলায় না গিয়ে পন্ডিত গণেশ আচার্যের বড় ছেলে এই বোধিসত্ত্ব বাবুকে দিয়েই এতোদিন পুজো চালিয়ে আসছেন। বাপ ছিল নিরীহ,

শান্ত মাটির মানুষ কিন্তু ছেলে হয়েছে রাশভারী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক।

বোধিসত্ত্ব আচার্য রাজ্যপাল ডায়াসের সস্ত্রীক এই পুজো মন্ডপে বিকাল-বেলায় আগমন ও রাজ্যপালের তল্পিধারী পুজা কমিটির আদেশ যে রাজ্যপাল পুজো প্যান্ডেলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের যথারীতি সন্ধ্যা আরতি শুরু করবার আদেশ—এতে তিনি ভীষণ গররাজি হলেন।—তাঁর মত মায়ের আরতি সন্ধ্যা বেলায়। লাট আসবে বলে আরতির সময় এগিয়ে নিয়ে আসা তা কিছুতেই চলবে না।

রাজভবনের পুজামন্ডপে হৈ হৈ ব্যাপার। কী করা যায়। কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। লাট তো কিছুক্ষণের মধ্যেই পুজা প্রাঙ্গণে গাড়ীতে করে এসে পড়বেন। পুজো কমিটির মাতব্বর গোছের কিছু রথী মহারথীদের মাথায় হাত।

কেউ আর পুরোহিত বোধিসত্ত্ব আচার্যকে বাগে আনতে পারছে না।

সবাই বলছে—দিন না পুরুত মশায় একটু নমোঃ নমোঃ করে মায়ের আরতি পর্বটা চুকিয়ে। জানেন তো লাট বলে কথা। ইত্যাদি।

শেষে পুজা কমিটীর কোন এক ধড়িবাজ লোক, সেক্রেটারীর বউ, ডেপুটীর বউ, এ-ডি-সি'র বউ ইত্যাদি মহিলাদের ধরে এনে পুরুত ঠাকুরের সামনে দাঁড় করালেন। ঐ মহিলারা বলতে লাগলেন—দেন না পুরুত মশায় অসময়েই আরতিটা করে, জানেন তো সব প্রায় ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। আর আমাদের স্বামীদেরও তো চাকরী বলে কথা। পশ্চিম বাংলার লাটের অসম্মান মানে আমাদের সকলের অসম্মান।

কিন্তু পুরোহিতের এক গোঁ—লাট তো কেবল পশ্চিম বাংলার, দিল দুনিয়ার তো নয়। আর আমার মা দুর্গা তিনি তো দিন দুনিয়ার মালিক। আমি এই অসময়ে মন্ত্র পড়ে সন্ধ্যারতি কিছুতেই করতে পারবো না। আমাকেও তো সংসারে ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। পুজোতে কিছু ত্রুটি হলে আপনাদের লাট কী তখন আমাকে বাঁচাবেন ?

বেশ তো—বোধিসত্ত্ববাবু একনাগাড়ে বলে চলেছেন—লাট সাহেব তাঁর নিজের টাইম মাফিক আসুন। প্রতিমা দেখুন। আমি না হয় তাঁদের সস্ত্রীকের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দেব। ব্যস।

তবুও কেন জানিনা শেষ অবধি রাজভবনের কার কল-কাঠিতে পুরুত ঠাকুর সেই বিকাল বেলায়, যদিও মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট হয়ে সস্ত্রীক লাট ডায়াসের সামনে মায়ের অসময়ে সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করলো।

এরপর রাজ্যপাল ডায়াস আরতি দেখে ও কোকাকোলা খেয়ে রাজভবনের অশোক স্তম্ভ মার্কা বিরাট এয়ার কনডিশন এ্যামপেলা গাড়ী করে পুজা প্রাঙ্গণ থেকে নিউ আলিপুরে ভোজ খেতে বেরিয়ে গেলেন।

আর এরপর পুরুত ঠাকুরের সে কী কান্না পুজো মন্ডপে—আমার বাবা মাত্র

চার বিঘে জমি ও তার সঙ্গে একটা মাটির বাড়ী ও আমার দুটি অবিবাহিত বোন এই রেখে গেছেন বাগনানে আমাদের জন্য। এই আমাদের সম্বল। আমরা পুজোরী ব্রাহ্মণ, কখনও কোনো পুজোর কোন রকম অনাচার করি না। সকল প্রতিমাকে ভগবান জ্ঞানে সন্তুষ্ট করেই আমাদের সংসার চলে। আমার বাবারও মত ছিল তাই।

জানিনা আজ কী অনাচার করলাম। নির্দিষ্ট জিনিষ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করাই সব পুজোর প্রথা। কেন আমি এর অন্যথা করবো গভর্ণর আসবে বলে। পুজো সেক্রেটারী কুন্ডুবাবুর ধমকানি—আপনাকে আর কখনও রাজভবনে পুজো করতে ডাকা হবে না—এই শাসানিতেই আমি আজ আরতি করলাম। নচেৎ কিছুতেই করতাম না।

তাছাড়াও আমার সঙ্গে এই পুজোতে সাহায্য করতে আমার যে ছোট মেয়ে এসেছে সে হঠাৎ কুন্ডুবাবুর ধমকানি শুনে আমার হাত ধরে বললো—বাবা আরতিটা করে দাও না। তাও তো এই রাজভবনের দুর্গা পুজো করেই আমার মা, ভাই, দিদি, পিসিরা তুমি আমরা সারা বছরের কাপড়, গামছা, চাল, নারকেল, সিঁদুর থালা বাসন ইত্যাদি পাই। দক্ষিণাও তো এঁনারা ভালই দেন। এটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি আরতি না করলে। তবে তো আমরা না খেয়ে মরবো। আমার ছোট্ট মেয়ের যুক্তিপূর্ণ এই অনুরোধ আমি আর ঠেলতে পারলাম না। অসময়ে তাই আরতি করতে হলো রাজভবনের পুজো কমিটির ধমকানিতে। আর এটাও সত্য এই পুরোহিতগিরি ছাড়া আর তো কোনো দ্বিতীয় বৃত্তিই আমি জানি না। তাছাড়া অনেক তো দেখলাম অনেকের চিঠি নিয়ে চাকরীর সুপারিশে, এদিক ওদিক গিয়ে, কিছুই তো হলো না।

কান্নায় জড়ানো পুরোহিত বোধিসত্ত্ব আচার্যির মুখ থেকে কথাগুলি শুনে আমার হঠাৎ কেন যেন মনে পড়তে লাগলো আর একটা ছবি—আমাদের এই রাজভবনের সম্মুখেই উত্তর পশ্চিম কোণে সেন্ট জর্জ চার্চের প্রধান পুরোহিত বা বিসপুকে তো আমি গত ত্রিশ বছর আমাদের রাজভবনের কোয়ার্টারের সম্মুখ দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় প্রিমিয়ার পদ্মিনী ফিয়েট গাড়ী হাঁকিয়ে ভব্য সভ্য হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখি। তিনিও তো পুরোহিত। তবে এতো তফাৎ কেন?

আর আমাদের দেশের এই দরিদ্র পুরোহিতদের কী কোনোদিনই একটু স্বচ্ছল অবস্থা হবে না?

সব সময়েই কী ধনী লোকেরা এখানে লোক দেখাতেই দান ধ্যান করবে? সমাজে কে খেতে পাচ্ছে না, পেটের জ্বালা কার কতো তীব্র তার কী কোনো খবরই নেবে না?

পাঠক পাঠিকারা হয়তো মনে করছেন যে কলকাতা রাজভবনের দুর্গাপুজোর ইতিবৃত্ত জানতেই তাঁরা আগ্রহী—অন্য কিছুতে নয়। তবে এসব কথা এখানে কেন?

কিন্তু এখানে বলা হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না যে সাদামাটা দুর্গাপুজোতো কতোই চারিদিকে হচ্ছে এই বিশাল কলকাতার আনাচে কানাচে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে,

বাংলার বাইরে তাও অনেক, এমনকি ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা জাপান প্রভৃতি দেশে যেখানে বাঙ্গালী প্রবাসীরা রয়েছে।

দুর্গাপুজোর কেবলমাত্র ষষ্ঠীর বোধন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এইসব মামুলি তিথির পুজো অর্চনার কথা লিখলেই তো আর সবকিছু হলো না, এর মধ্যে যদি কোন সজীবতাই না থাকে, কোন ঘটনার চমৎকারিত্ব বা অন্তরের গভীর স্নেহের স্পর্শের রঙই বা না থাকে তবে আর তা নিয়ে সাহিত্য বা রম্য রচনাই বা কী হলো।

এই প্রসংগে মনে পড়ে ১৯৪৬ সালের এক শীতের সন্ধ্যায় একবার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বনফুল-এর ভাগলপুরের তাঁর তখনকার সদ্য নব নির্মিত নতুন বাড়ীর গৃহ-প্রবেশের দিনে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলাম।

তখন সেদিন তাঁকে নানা আলোচনার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে মোদ্দা কথায় তফাৎ কী?

হেসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—গরু দুধ দেয় এটা সাংবাদিকের নির্ভীক ভাষা। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা হবে গরু মাতৃরূপিনী।

তাঁর সেদিনের সেই উপদেশ আজও ভুলতে পারিনি। মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে সর্বক্ষণের জন্য।

তাই এই রাজভবনের দুর্গাপুজোর বর্ণনায় বেশ কিছু মজাদার মজাদার ঘটনার উল্লেখ করছি। নচেৎ গরু দুধ দেয়—অর্থাৎ ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী যথারীতি পুজো হলো তাই লিখে দিতাম।

* * * *

যাক যা বলছিলাম। কলকাতা রাজভবনের দুর্গাপুজোর আর একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক এই যে এখানে এই রাজভবনে কর্মচারী কর্মচারীতে যে অর্থ ও পদমর্যাদার ন্যক্কারজনক বিভেদের উন্নাসিকতা আছে তা এই দুর্গাপুজোর কদিন আর থাকে না। অন্ততঃ পারতপক্ষে তা দেখতে পাওয়া যায় না।

বিহারী দারোয়ান, বাঙ্গালী বাবু, নেপালী ম্যানেজার, খৃষ্টান অফিসার, হিন্দু সেক্রেটারী, মুসলমান বাবুর্চি চাটগাঁয়ের খিদমৎগার, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টেলিফোন অপারেটার ইত্যাদিরা সবাই এখানে কাঁধে কাঁধ দিয়ে এই দুর্গাপুজোয় পাল খাটায়, মণ্ডপ সাজায়, প্রসাদ বিলোয়, থিয়েটার যাত্রায় অংশ নেয়, গানের আসর করে, ধুনুচী নাচে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজভবনে তখন কোনো বিদেশী ভি আই পি অতিথি বা ভারতেরই অন্য কোন প্রদেশের রাজ্যপাল কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখবার জন্য এলে—দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার রাজভবন ভর্তি থাকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্যপাল ও নানা দেশের এইসব নানা ভি-আই-পি গেস্টে—এঁরা তাঁদের সম্মানের সঙ্গে এই রাজভবনের দুর্গাপুজো মণ্ডপে নিয়ে আসে, কোকাকোলায় আপ্যায়িত করে, প্রসাদ দেয়, পুষ্পার্ঘ্য বিলোয়।

ডালহৌসী স্কোয়ারের নির্জন রাস্তা মাঝ রাত্রি পর্যন্ত তখন লোকের ভীড়ে জমজমাট থাকে।

রাজভবন, টেলিফোন ভবন, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস, মন্ত্রি নিবাস, উনি সেক্রেটারিয়েট অফিস, এ জি বেংগল, এ্যাসেম্বলী হাউস ইত্যাদি সকল জায়গার ছেলেমেয়ে প্রবীণ প্রবীণারা এই দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে সকলে একত্রিত হয়ে পুজা মন্ডপে গল্পগুজব করে।

এখানকার মহিলারা এই এলাহী পুজোর ফল-পাকুড়, নৈবিদ্য, কলাপাতা, আনাজ ইত্যাদি কাটা থেকে ভোগের রান্না পর্যন্ত দিনরাত খেটে করেন।

সাধারণ লোকের সঙ্গে দর্শনার্থী হিসেবে সেই সব অনুষ্ঠানে প্রায় প্রতিবারই কলকাতার বিভিন্ন কনস্যুলেটের হাই ডিগনেটারিসরাও উপস্থিত হন।

এমনকি তখন বাংলা গভর্নমেন্টের ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর বাস কলকাতার নানা দর্শনীয় ঐতিহ্যময় জিনিসের সঙ্গে এই রাজভবনের পুজো দেখাতে বিদেশীয় অতিথিদের এই পুজা প্রাংগণে নিয়ে আসেন—এ যে খোদ বাংলার লাটের পুজো।

কলকাতা আগত বিদেশীরা কেউ মুভি ক্যামেরা, কেউ বা সাধারণ ক্যামেরায় এই প্রতিমার অজস্র ছবি তোলেন। ভারতবাসীর কায়দায় তাঁরা আবার ভক্তিভরে হাত তুলে এই প্রতিমাকে প্রণাম করতেও ভোলেন না।

প্রতিমার সুমুখে রাখা প্রণামীর বাক্সে বেশ কিছু দেশী মুদ্রা প্রণামী বাবদ ফেলে দিতে তাঁরা কখনও ভুলে যান না।

মহা উৎসুক হয়ে এই সব বিদেশীরা জিজ্ঞাসা করেন গণেশের হাতীর মতো মুখ কেন? কেন বা দুর্গা ঠাকুরের দশ হাত? কার্তিকই বা কে? লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা ঠাকুরের কে? অসুর অমন কালো কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি—

পুরুত ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে গঙ্গার মন্ত্রপুতঃ শান্তি বারি তাদের মাথায় ছিটিয়ে দিলে তাঁরা সম্ভ্রমভরে মাথা নত করে—দোভাষী গাইডের অনুরোধে।

তাই তো মনে জাগে পৌত্তলিকতায় বহু স্বদেশী ভারতীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর উন্নাসিকতাও এই একই বিষয়ে বিদেশীদের এই সহনশীলতা, সত্যই এটা দেখবার জিনিষ।

কলকাতা রাজভবনে ত্রিশ বছরের বিজড়িত জীবনে বরাবর দেখে এসেছি যে যেহেতু রাজভবনের পুজো মহাসমারোহে ও এই ডালহাউসী স্কোয়ারের নির্জন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সেইজন্য কলকাতার বাগবাজার থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত কিছু কিছু কলকাতার তথাকথিত বনিয়াদী পুরানো পরিবার এই রাজভবনের দুর্গাপুজো নিজেদের গাড়ী করে প্রতিবছর অন্ততপক্ষে সন্ধি পুজোটা দেখতে এই রাজভবনে আসেনই—সে সন্ধিপুজো অধিক রাত্রেই হোক বা দিনের বেলায় হোক।

এও চোখে পড়েছে জনৈক ভদ্রলোকের ছোট্ট কন্যা প্রতিবার আমাদের এই রাজভবনে সন্ধিপুজো দেখতে এসেছে সেই ছোট্টবেলা থেকে, তাকেই হয়তো একবার সবিস্ময়ে

দেখলাম সদ্য নূতন সিমন্তনী হয়ে হাসিমুখে রাজভবনে পূজোর সময় এসেছে সন্ধিপূজো দেখতে সদ্যবিবাহিত স্বামীর সঙ্গে সলজ্জিত ভাবে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে।

দেখেছি সদ্য বিধবা শাদা থান পরা মাকে নিয়ে বিরাট নূতন কেনা কনটেসা গাড়ীতে করে ছেলে মা'র দু'হাত ধরে এই রাজভবনের সন্ধিপূজো দেখতে এসেছে আর তখন মায়ের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ধারে অশ্রু বর্ষণ হচ্ছে প্রতিমার সামনে। বলতে শুনেছি সেই নবীন সুদর্শন যুবককে—বাবা, মা আমাদের পূর্ববঙ্গের রাজশাহীর বাড়ীর তিন পুরুষের পারিবারিক দুর্গাপূজো ছেড়ে সেই ১৯৭৭ সালে দেশ বিভাগের পর নিঃস্ব হয়ে এই কলকাতা আসবার পর থেকেই এই রাজভবনের শান্ত পরিবেশের এই ঘরোয়া দুর্গা পূজোকেই খুঁজে নিয়েছিলেন নিজেদের ফেলে আসা বাস্তু ভিটায় পূজার শোক ভুলবার জন্য।

বেশ গত কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধ বাবাকে অনেক করে বুঝিয়েছি যে ভগবান যখন এখন আমাকে ঠিকমতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তখন সেই পুরানো পারিবারিক পূজো আবার এই কলকাতায় আরম্ভ করুন—ছেলে বলেছে বৃদ্ধ পিতাকে।

কিন্তু বাবার সেই একই গোঁ—দেখিব খোকা, আজকের বিভক্ত বাংলা আবার এক হবে। তখন আমরা আবার দেশে ফিরে গিয়ে বাস্তু ভিটের সেই পুরানো তিন পুরুষের দুর্গাপূজো আবার আরম্ভ করবো। বলেছেন—আমার সোনার বাঙ্গলা আমি তোমায় ভালবাসি ; তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

বাবাকে যুক্তি দেখিয়েছি—যুবকটি বলে চলেছে—সে হয়তো তোমার জীবনে হবে না। বাবা তাতেও হার মানেন নি, উত্তর দিয়েছেন—বেশ তো, তুই যখন সবই বুঝিস, তবে একবার চেষ্টা করে আমার ফেলে আসা বাস্তুভিটার চণ্ডীমণ্ডপ থেকে আমার মায়ের প্রতিমা গড়বার সেই তিন পুরুষের পুরাতন কাঠের কাঠামোটাই নাহয় কোনক্রমে এখানে আনিয়ে দে, সেই পুরানো প্রতিমার কাঠামোতেই এখানে প্রতিমা গড়ে প্রাণভরে পূজো করি।

বৃদ্ধ আরও উল্লসিত হয়ে বলে চলেছেন—খোকা, তুই তো গভর্নমেণ্টের একজন বড় পদস্থ অফিসার। এটাও কি করা যায় না পূর্ববাংলা গভর্নমেণ্টকে বলে।

বৃদ্ধের উত্তর তাঁর এই যুবক ছেলেটি কিছুতেই দিতে পারে নি।

যুবকটি বলে চললো—গত বছর নভেম্বর মাসে হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে এই সুস্থ সুন্দর পুরানো পরিবেশে এনেছি একটু হয়তো সান্ত্বনা দেবার জন্য। যদি মা এই পূজোতে একটু শান্তি পান।

রাজভবনের দুর্গাপূজোর একজন পুরাতন বৃদ্ধ কর্মকর্তাকে হঠাৎ তাঁদের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে দেখে সদ্য বিধবা সেই ভদ্রমহিলা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। পূজোর ছোটদের ভীড়ের জটলা তখন ধীরে ধীরে সেখান থেকে অদৃশ্য হচ্ছে আর যুবকটি মায়ের হাত তখন শক্ত করে ধরে রেখেছে। তার চোখেও তখন জল।

এবারে আমি উনিশশো ষাট সালে রাজভবনের দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী দিনের একটি অতি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি।

তার আগে বলে নিই যে ডালহাউসী স্কোয়ারের রাজভবনের এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর (চল্লিশ বছরের) দুর্গাপুজো দেখবার জন্য কলকাতার সাধারণ জনমানুষ যতো না জড়ো হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ভি-আই-পি এই পুজো দেখতে আসেন।

কলকাতার অনেক বড় বড় ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, হাইকোর্টের জজ, বিভিন্ন মন্ত্রী বা কিছু সংখ্যক এই কলকাতার বিজনেস ম্যাগনেট ইত্যাদিরা লাটসাহেবের এই পুজোতে তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁদা পাঠানই তাছাড়া তাঁরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ পুজোর ক'দিন প্রতি সন্ধ্যায় এই পুজোমণ্ডপে হাজির হনই।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেণ্ট বা ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট বা কলকাতার নানা হাই-কমিশনার অফিস বিদেশী টুরিষ্টদের এই কলকাতার দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে থাকেন। এই সব বিদেশী অতিথিদেরও এই লাটসাহেবের দুর্গাপুজো দেখানো হয়ে থাকে।

এবার আমি ১৯৬০ সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর বুধবার সেই মহাঅষ্টমী দুর্গা-পুজোর সন্ধ্যার আরতির ঘটনার বর্ণনায় যাচ্ছি।

কলকাতা রাজভবনের মেন গেটের সামনেই কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে সমগ্র কলকাতার সবচেয়ে পুরানো সম্ভ্রান্ত হোটেল স্পেনসেস। আর রাজভবনের পূর্ব দিকে ট্রাম রাস্তার পাশেই সমগ্র এশিয়ার অন্যতম প্রধান হোটেল গ্রেট ইষ্টার্ণ। আর তার ঠিক দক্ষিণ দিকে বড় রাস্তার উপর বৃটীশ যুগে আর একটা বিখ্যাত হোটেল ছিল—মিনি ফারপো, না কী যেন বেশ নাম ছিল।

তবে দেশ স্বাধীন হবার পর মিনি ফারপো উঠে গেছে আর এই বছর পাঁচেক আগে উঠে গেল কলকাতার সেই প্রাচীন বিখ্যাত হোটেল স্পেনসেস্।

এই সেই স্পেনসেস যেখানে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সদ্য প্রত্যাগত বিলাতী ব্যারিষ্টার মাইকেল মধুসূদনকে দেখতে এসেছিলেন।

এই সেই স্পেনসেস যেখানে কথা সাহিত্যিক শংকর এর বস্ বিখ্যাত দয়াল ব্যারিষ্টার ফ্রেডারিক নোয়েল বারওয়েল সাহেব বাস করতেন। আর এই সেই স্পেনসেস হোটেল যেখানে এই সেদিনও দেখেছি বিখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা-বেলায় বেশ কিছু সাহিত্যিক বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে নানারকম আহার্য্য ও পানীয় গলাধঃকরণ করতেন জমিয়ে বসে।

যেহেতু ডালহাউসী স্কোয়ারের স্পেনসেস ও গ্রেট্ইষ্টার্ণ হোটেল খুবই অভিজাত ও আবাসিক সেই জন্য শীতের মরশুমে বা বড়দিনের সময় বা দুর্গাপুজোর একটানা ছুটীর দিনে ডালহাউসী স্কোয়ারের এই নির্জন পাড়ায় কলকাতার অনেক সাবেকী বনেদী লোককে দেখেছি সেই সময়ে দু'চারদিনের জন্য এই সব হোটেলে অস্থায়ী আবাসিক হতে—জানিনা বোধহয় তাঁদের নিজের পাড়ায় পুজোর মাইকের উপদ্রব বা জন-কোলাহলের গণ্ডগোল থেকে দিন কয়েক একটু দূরে থাকবার তাঁদের অভিলাষ।

সেদিন ছিল অষ্টমী। উনিশশো ষাট সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার স্পষ্ট মনে আছে।

তার আগের দিন সপ্তমী দুপুরে রাজভবনের চত্বরে রটে গেল তখনকার সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস সেন রাজভবনের পুজামণ্ডপে এসে প্রতিমা দেখে গেছেন, চোখে অবশ্য ছিল তাঁর সান গ্লাস, সঙ্গে লোকও দু'একজন ছিল এবং তিনি উঠেছেন— স্পেনসেস হোটেলে।

আর যায় কোথায়। রাজভবনের খালি পুজামণ্ডপেই নয়, কোয়ার্টারে কোয়ার্টারের অন্দরমহলেও জোর জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো যেমন করে হোক শ্রীমতী সেনকে একবার চাক্ষুষ দেখতেই হবে।

এমনকি রাজভবনের কোয়ার্টারের কলেজে পড়া এ্যাডভানস্‌ড্‌ স্মার্ট বেশ কিছু মেয়ে তারা তক্ষুণি স্বয়ং গিয়ে স্পেনসেসের তৎকালিন অন্যতম মালিক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী মিঃ এস সিং-এর কাছে গিয়ে দোতালায় চড়াও হয়ে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলো— বলুন না সিং অ্যাংকেল। চিত্রাভিনেত্রী মিসেস সেন কী আপনার হোটেলে উঠেছেন। আজ সন্ধ্যায় উনি কী আমাদের রাজভবনের পুজামণ্ডপে যাবেন? তাহলে আমরা ও'নার সম্মানে একটা ছোট ফ্যাংশান এর বন্দোবস্ত করি।

এই পুজোর সময় সিমলা, কাশ্মির দার্জিলিং ইত্যাদি ছেড়ে উনি যখন আমাদের মধ্যে এই পাড়ায় এসেছেন তখন একটা কিছু করা দরকার।

স্পেনসেসের অন্যতম মালিক এই পাঞ্জাবী এস সিং ও তাঁর ফ্যামিলী রাজভবনের পাড়ায় এই চত্বরে অনেকদিন রয়েছেন। তখন তিনি স্পেনসেসের অন্যতম ভারতীয় মালিক। তার ওপর সবাই জানে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর স্পেনসেসের দোতালার ফ্ল্যাটে সাঁইবাবার ভজন হয় এবং সেই ভজনে এই পাড়ার মেয়ে বউরাই—ভজন গান করে এবং প্রতিমাসের, চতুর্থ রবিবারে, ভোরবেলার যে সাঁইবাবার ভজনের দল ডালহাউসী স্কোয়ার পরিক্রমা করে, তাতেও এই মেয়েরা থাকে।

সুতরাং তখনপ্রায় বৃদ্ধ মিঃ সিং অ্যাংকেল কী করে এই মেয়েদের মিথ্যা কথা বলেন। তবু যেহেতু তিনি এই হোটেলের মালিক তাই কথাটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন— আমি তো হোটেলের প্রোপ্রাইটার। আমাকে কিন্তু এসব খবর রাখতে হয় না বা আমি রাখি না। তবে আমি আমার ঘরের ইনটারকম ফোনে ফোন করে দিচ্ছি একতলায় আমার হোটেলের ম্যানেজার মুড়িয়াল বাসুকে। ওখানে গেলে তোমরা সব খবর পেয়ে যাবে। গরু হারালেও গরুর খবর দিতে পারেন আমার এই ম্যানেজার। খুব কাজের লোক তিনি।

মেয়েরা তো ও'র ঘর থেকে বেড়িয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাযি করতে লাগলো—ওরে বাপরে। ঐ পাঁড় মাতাল, গুণ্ডা ম্যানেজার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মুড়িয়াল বাসুর কাছে।

ঐ বদমাইশটার সামনে যাবো। না, না, তার চেয়ে সবাই চল পালিয়ে যাই। ও অভিনেত্রী-টেত্রীদের খবর জেনে আমাদের কোনো দরকার নেই।

মেয়েদের মধ্যে কলকাতা ইউনিভারসিটিতে ইংরেজীতে এম-এ পড়া মেয়ে রেখা ঘোষ খুব সাহসী ও চটপটে বলে রাজভবন অঞ্চলে বিখ্যাত। সে কিছুতেই দমলো না। সদম্ভে বললো, কী আর করবে ঐ মাতালটা। যাই, একলাই আমি যাচ্ছি, তোদের যেতে হবে না—বলে তো সে চলে গেল।

আর অন্যান্য মেয়েরা স্পেনসেসের গেটের ভেতর এক পা, বাইরে এক পা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো—কী হয়, কী হয়। অর্থাৎ বেগতিক দেখলেই এক ছুটে রাজভবনের পুজো প্যাণ্ডেলে পালিয়ে যাবে।

রেখা ঘোষ কিছুক্ষণ বাদেই বেরিয়ে এলো হোটেল ম্যানেজার মুড়িয়েল বাসুর কাঁচের পাল্লা দেওয়া ঘর থেকে, মুখ ভীষণ কাঁচুমাচু করে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে —ম্যানেজার মুড়িয়াল বাসুটা এতো পাজী জানিস। আমার কথা শুনে বলে কিনা—যাও খুকি বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। আমি নিশ্চয়ই তোমার এই জরুরী প্রশ্নের জবাব দেবো—অভিনেত্রী মিসেস সেন এখানে আছেন কি না? খবরটা তোমার চেয়ে তোমার বাবার বয়সী লোকদেরই বেশী জানার দরকার তো।

যাই হোক সেদিন আর মিসেস সেন সন্ধ্যারতি দেখতে পুজো প্যাণ্ডেলে এলেন না।

রাজভবনের মেয়ে বউরা এমনকি দুর্গাপ্রতিমা দর্শনার্থী পথচারী দু'চারজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও মনমরা। হতাশ হয়ে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ঠায় অভিনেত্রী মিসেস সেনের আগমন অপেক্ষায় চাতকের মতো অপেক্ষা করে শেষে ঠাকুরের রাত্রের ভোগের দু'খানা করে লুচী ও একটু আলু ভাজা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে যে যার আস্থানায় ফিরে গেল।

পরের দিন মহা অষ্টমী। সকালের পুজো খুব হৈ চৈ করে ঢাকের বাজনার সঙ্গে হয়ে গেছে।

আগেই খবর ছিল সন্ধ্যায় আরতি দেখতে আসবেন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। তাই পুজো প্রাংগণ সুন্দর-সুন্দর চেয়ার বেঞ্চ দিয়ে সাজানো হতে লাগলো।

পুজো কমিটির সকলেই খুব ব্যস্ত। দুপুরের ভোগের প্রসাদ ছেলেরা তাড়াতাড়ি সব পলিথিনের প্যাকেটে ভরে বাড়ী বাড়ী দিয়ে আসছে। কিছু উৎসাহী যুবকও দুটি প্রসাদের প্যাকেট কোন ফাঁকে নিয়ে স্পেনসেসের মালিক ও ম্যানেজারকে হাতে গুজে দিয়ে এসেছে।

উদ্দেশ্য যদি কিছু স্কুপ নিউজ ওখানে মিসেস সেনের সম্বন্ধে জানতে পারে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কিছু সুবিধে হয় নি।

পুজো মণ্ডপে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। রাজভবনের চত্বরে চত্বরে ঢাকের বাজনায় আর কান পাতা যায় না। আলোয় আলোকময় চারিদিক।

ঢাকীর ঢাকের সামনে কিছু উৎসাহী ভলেনটিয়ারেরা মাইকটা বসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ঢাকের বাজনা ময়দান পেরিয়ে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে।

রাজভবনের পূজো প্রাংগণের চত্বরে ফুচকা, আলুকাবলি, চুরান, ফট্‌ফাট থেকে মায় ভাঁড়ে করে চা, সিঙারা, পানতোয়া অবধি বিক্রী হচ্ছে।

হঠাৎ খবর এলো রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা এক্ষুণি আসছেন পূজো প্রাংগণে গাড়ী করে মায়ের আরতি দেখতে।

রাজভবনের সিকিউরিটি পুলিশ তাড়াহুড়ো যে যার জায়গায় দাঁড়ালো আগেভাগে রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা তাঁর সেক্রেটারী শ্রী পিনাকী রঞ্জন সিন্‌হাকে ও এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন পন্থকে নিয়ে পূজো প্রাংগণে ঢুকলেন। রাত তখন সাড়ে সাতটা।

দুর্গা প্রতিমার আরতি ঢাকীর বাদ্যের সঙ্গে যথারীতি আরম্ভ হলো।

রাজ্যপাল প্রতিমার ঠিক সামনে রাজভবন থেকে আনা সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে আরতি দেখতে লাগলেন। ভলেনটিয়ারেরা কাজে অকাজে রাজ্যপালের সামনে দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিলো। কেউ ধুনুচিতে অতিরিক্ত টিকা দিতে লাগলো, কেউ লাগলো জলন্ত পঞ্চ প্রদীপ পুরোহিত মশায়ের হাতে এগিয়ে দিতে, কেউ বা ঢাকীর ছেলের হাত থেকে কাঁসি কেড়ে নিয়ে কাঁসি বাজাতে লাগলো জোরে জোরে ইত্যাদি।

আধ ঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আরতি শেষ হলো।

শান্তিজল মাথায় নিয়ে এবং কিছু প্রণামী পুরোহিত মশায়ের হাতে সেক্রেটারী পিনাকি রঞ্জন সিন্‌হার মারফৎ দিয়ে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা রাজ্যপালের নির্দিষ্ট গাড়ী এ্যাম্‌পেলা চড়ে রাজভবনের নির্দ্দিষ্ট নিজের সুইটের দিকে ফিরে গেলেন।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা বেড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সংগে জমায়েতের ভিড়ও পাতলা হতে আরম্ভ করলো।...

হঠাৎ স্পেনসেস হোটেলের দিক থেকে একটা বিরাট সাদা রং-এর এ্যামবাসাডার গাড়ী এসে তখন পূজো মণ্ডপে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ী থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন স্পেনসেসের দুর্ধর্ষ ম্যানেজার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মুড়িয়েল বাসু, মালিক বৃদ্ধ সিংজী সাহেব, একজন স্যুটেড বুটেড লম্বা চওড়া ভদ্রলোক ও তাঁর সংগে চোখে কালো সান গ্লাসের আড়ালে অভিনেত্রী শ্রীমতী সেন।

সদলে তাঁরা বিশাল রাজভবনের পূজো মণ্ডপের প্রতিমার সামনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হাতজোড় করে শ্রীমতী সেন দুর্গা প্রতিমাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করে পুরোহিতের প্রণামীর থালায় মোটা অংকের একটা নোট প্রণামী দিয়ে পুরোহিতের হাত থেকে কিছুটা ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে মুখে ও মাথায় দিয়ে গটগট করে গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

গাড়ী চলে গেল এসপ্ল্যানেডের দিকে।

আর স্পেনসেস হোটেলের মালিক সিংজী সাহেব তখন পূজো কমিটির হোমড়া চোমড়াদের মধ্যে একজনকে প্যানডেলের এক কোনায় ডেকে নিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে

দুঃখ করতে লাগলেন—হ্যাঁ মশায় সত্যিই অভিনেত্রী মিসেস সেন স্বামীকে নিয়ে এই পুজোর হুল্লোড় থেকে বাঁচবার জন্যে ও এই রাজভবনের দুর্গাপুজো নিরিবিলিতে উপভোগ করবার আগ্রহে আমার এই স্পেনসেস হোটেলে উঠেছিলেন দু'চারদিন থাকার জন্য। আপনাদের উৎসাহী ছেলেমেয়েরা তা আর কি হতে দিল ?

ঐ যে দেখলেন সাদা রং-এর বিরাট এ্যামবাসাডার গাড়ী চলে গেল ওতেই উনি আর ওর স্বামী আমার হোটেল ছেড়ে বিরক্ত হয়ে আজ নিজেদের বাড়ি বালীগঞ্জে চলে গেলেন। আমাকে অনেক কথাও শুনতে হলো।...

সব শেষে দিচ্ছি ১৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার উনিশশো আশি সালে রাজভবনের দুর্গাপুজার সপ্তমীর দিন লাটের ব্যারাকপুরের বাগান থেকে এই পুজোর জন্য দৈনন্দিন কী কী জিনিষ এসেছে তার এক দিনের হিসাব ঃ—

শুকনো নারকেল = ৫০ টী
ডাব = ১০ টী
পাকাকলা = ৩২ টী
সফেদা = ২৫ টী
শশা = ৪ কেজি
কলাপাতা = ৫ বাণ্ডিল
বাতাবি লেবু = ১৫ টী
পুজার ফুল ও তুলসী পাতা = দু' বাক্স।

কলকাতার রাজভবনে রাশিয়ান ভি-আই-পি

কলকাতার এই প্রায় একশো বিঘে ঘেরা নয়নাভিরাম সুন্দর এই লাটবাড়ী তৈরী হয় আঠারো শো তিন খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলীর একান্ত প্রচেষ্টায় ও আগ্রহে।

তারপর এই দুশো বছর ইংরেজ শাসনে এখানে তেমন বিদেশীয় ভি-আই-পি-দের পদার্পণ হয়নি এখন সাম্প্রতিক কালে যেমন হচ্ছে।

সেই ১৯১১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড ও ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস—এ'রাই সে সময়ের সবচেয়ে বড় ভি-আই-পি ছিলেন কলকাতার এই সুন্দর রাজভবনে।

যদিও বোধহয় তখন ভি-আই-পি কথাটির উদ্ভব হয় নি। তখন বলা হত বেশ গণ্যমান্য লোককে সম্মানীয় ব্যক্তি বা হিজ হাইনেস। ইত্যাদি।

এখনকার মতো বাংলা ভাষার মধ্যে তখনও চল হয়নি ভি-আই-পি, গুরু বা হেভী দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালের ঝাল লংকা দেওয়া অতি আধুনিক নানা রং বেরং এর রকমারি বিশেষণ।

এ ছাড়া এই রাজভবনে সেই বৃটিশ আমলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি হাতের আঙুলে গোনা যায় জনাকয়েক তথাকথিত মহানায়কের পদধূলি পড়েছিল।

যদিও অনেকের মুখে কথা প্রসংগে শুনি সে কি মশায় মহাত্মা গান্ধী যে কখনও কলকাতার রাজভবনে এসেছেন তাতো আমাদের জানা নেই।

হ্যাঁ গান্ধিজী উনিশশো প'য়তাল্লিশ সালের জুলাই, আগস্ট মাসের কোনো এক সময়ে তখনকার বাংলার গভর্ণর আর জি কেসীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এই কলকাতার রাজভবনে। যদিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নয়, কেসীর সাদর আমন্ত্রণের তাগিদে।

এবং আজকেও ভাবতে ভালো লাগে সেদিনকার সেই অস্ট্রেলিয়া সম্ভূত বনেদী বংশের সাহেব গভর্ণর কেসী মহাত্মা গান্ধীকে সেদিনের বিদায়ের কালে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন খুব মিহি খদ্দরের একটি কাপড়ের প্যাকেট।

গান্ধী যদিও কখনও মিহি খদ্দর ব্যবহার করতেন না, তবু হাসি মুখে তিনি গভর্ণর কেসীর হাত থেকে সেই খদ্দরের কাপড় ও সম্মান সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের পনোরোই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার পর এই কলকাতার রাজভবনে এতো ভি আই পি নিত্য নূতন আকছার আসছেন যে সকলের সব সময়ে নামও মনে থাকে না। ডাইরীতেও সব সময় লেখা হয়ে ওঠে না।

পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তে হয়তো কোনো একটি ছোট্ট দেশ স্বাধীন হলো, তার কর্ণধার ভারত ভ্রমণে একবার আসবেনই। আর ভারত ভ্রমণ মানে ভারতের রাজধানী দিল্লী আর দিল্লী এলে কলকাতাকে কী ছাড়া যায়।

ব্রিটীশ জমানার তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা—লন্ডনের পরই তার স্থান। তা ছাড়া বিদেশীরা জানে এটা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের দেশ এবং নেতাজী সুভাষের বীরত্বের কথাও অনেকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

যাই হোক দেশ স্বাধীন হবার পর যে সব ভি-আই-পি কলকাতার এই সুন্দর রাজভবনে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের স্মৃতি এখনও আমার মনে গাঁথা আছে। কারণ আগেই আমি বহুবার লিখেছি যে সেই ছোট্ট বেলা থেকে দিনকার দিন ডাইরী লেখা আমার একান্ত অভ্যেস।

ডাইরী লেখা আমাকে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো সাহায্য করেছে এই রম্যরচনার সঠিক দিনক্ষণ লিপিবদ্ধ করবার ব্যাপারে সঠিক ভাবে।

কিন্তু কেন জানিনা এখনও আমার পাঁচের দশকে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ২৯শে নভেম্বর সেই সর্বপ্রথম কলকাতার এই রাজভবনে পদার্পণ করা প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও তাঁর সহ সাথী সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান মিঃ ক্রুশ্চেভের কথা এখনও মনের পর্দায় মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এই প্রথম কলকাতার রাজভবনে রাশিয়ান ভি-আই-পি আসছে তাই তার মাস খানেক আগে থেকেই রোজ রোজ আত্মীয়-স্বজনের নিয়মিত চিঠি আসতে লাগলো— তোর ওখানে কলকাতা রাজভবনের কোয়ার্টারে দু' চারদিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। ইচ্ছে রাশিয়ান ভি-আই-পি জীবনে প্রথম স্বচক্ষে দেখা।

রাশিয়ার লোক তো আগে মনে হচ্ছে কলকাতায় দেখিনি। খালি সাহেবদেরই দেখেছি কলকাতায় তবে তার মধ্যে দু' চারজন রাশিয়ান থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমেরিকান বা বৃটীশ সাহেব থেকে রাশিয়ানরা কতো তফাৎ তা তো জানা নেই তাই চাক্ষুষ বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেফকে দেখতে চাই।

কী করা যায়? আত্মীয় বলে কথা। আর আমার বৃদ্ধা মা, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী যিনি বিখ্যাত বিপ্লবী চারণ কবি মুকুন্দ দাশের প্রথম সারির শিষ্যা ছিলেন তিনি প্রায়ই বলতেন—আত্মীয়রা মেরেও যায় আবার ফিরেও চায়। সুতরাং আত্মীয়দের সঙ্গে জীবনে সম্পর্ক ভালো রেখো। তাই তাঁদের চিঠির উত্তর দিতে হলো—হ্যাঁ আসতে পারো। তবে ইতিমধ্যে অমুক অমুক আত্মীয়রা আসবেন লিখেছেন। সুতরাং মাটিতে শতরঞ্চি পেতে শুতে হতে পারে। কোয়ার্টারে আমার জায়গার খুব অনটন।

রাশিয়ান ভি-আই-পি বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেফ কলকাতায় আসছে। উঠবেন রাজভবনে। কলকাতার রাজভবনে হৈ হৈ ব্যাপার। ঘরদোর ঝাড় পোঁছ হচ্ছে। রাজভবনের প্রায় উননব্বইটী ঘরের বাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার, গীজার, কার্পেট, সোফা ইত্যাদি ঝেড়ে মুছে সুন্দর পরিষ্কার করে তোলা হচ্ছে।

ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুও আসবেন কলকাতায়—ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক মিটিং হবে। তাছাড়া শুধু কলকাতায় কেন এর পূর্বে রাশিয়ান লোকেরা কেমন দেখতে, তাঁদের হাঁটা চলাই বা কেমন, বলবার ভাষা কীরকম,

তাঁরা খাওয়াদাওয়া কী করেন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের কম লোকেরই ধারণা আছে।

রাশিয়ানরা ফ্যাসিস্ত হিটলারকে হারিয়ে দিয়েছে সুতরাং বীরের পূজা পাবার যোগ্য তারা—এও কলকাতা নগরবাসীর এক বড় অংশের মানসিক ইচ্ছে। ইংরেজ ও আমেরিকান তো ঢের ঢের বছর ধরে দেখা গেছে, ওদের কথা বাদ দাও। ওদেরকে চিনি, ওরা কী খায়, কীভাবে চলে, কী ভাষা বলে, তাও জানা হয়ে গেছে। এখন রাশিয়ান মেহেমান দেখবো। তাদেরকে চিনবো—এই হলো তামাম কলকাতার অবস্থা। কলকাতার রাজভবন সাজানো হয়েছে আলোয় আলোকময়।

সমস্ত রাজভবনের অফিসের বাবুদের পরপর তিনদিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজভবন এখন কেন্দ্রীয় সি-আই-ডি এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। একটা কানামাছিও যাতে বিনা চ্যালেঞ্জে রাজভবনের মধ্যে ঢুকতে না পারে তার কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজভবনের কোণে কোণে, বাগানের ঝোপে ঝাড়ে। রাজভবনের সকল কর্মচারীদের আইডেন্টিটি কার্ডের ওপর স্পেশাল ছাপ পড়েছে কেন্দ্রীয় সি-আই-ডির।

এর আগেও দু' একবার নামী ভি-আই-পি রাজভবনে এসেছেন কিন্তু তাতে রাজভবনের কেরানী কুলকে অফিসের একটানা তিনদিনতো নয়ই অধিকন্তু মোটেই ছুটি দেওয়া হয়নি ইমারজেনসি কাজের জন্য। কিন্তু এবার হলো বিশেষ ব্যবস্থা।

যতক্ষণ রাশিয়ান ভি-আই-পি রাজভবনে থাকছেন ততক্ষণ রাজভবনের কেরাণী বাবুদের অফিসে হাজির হতে দেওয়া হবে না। এটা হয়তো বা সিকিউরিটীর দোহাই-এ।

এতে কিন্তু রাজভবনের কেরাণীকুলের ভীষণ আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। বিশেষত তাঁদের অন্দরমহলের গিন্নীদের পরিবারে। কিন্তু তাঁদের স্বামীরা টুঁ শব্দটী করছেন না। চাকরী বড় বলাই।

সে ক'দিন কলকাতার রাজভবনে আলোর ফুলঝুরি। রাজভবনের মেন বিল্ডিং-এর ছাদের কোণায় কোণায় কতকগুলি হাজার পাওয়ারের ফ্লাড লাইট দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কালো গাড়ীতে গাড়ীতে জীপে রাজভবনের চত্বর ছয়লাপ।

কলকাতার পুলিশ আগের থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল দমদম এরোড্রাম থেকে রাজভবন, এই প্রায় কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা কেমনভাবে ব্যারিকেড করতে হবে—কতো পুলিশ ফোর্স দিতে হবে ভীড় সামলাবার জন্য—কতোগুলো ওয়্যারলেশ ভ্যান প্রস্তুত থাকবে মিটিং চলাকালে, কতোগুলি মোটর বাইকে সারজেন্ট থাকবে কতোগুলি মিলিটারী পুলিশ থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু উনিশশো পঞ্চান্ন সালের উনত্রিশে নভেম্বর ঐ আগমণের দিনে কলকাতা পুলিশের সব পূর্বকল্পিত ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেল।

গাড়ীর মিছিল দমদম এরোড্রাম থেকে ক্রুশ্চেভ বুলগেনিন ও তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়কে নিয়ে ঠিকই আসছিল, লোকজন পথের দু'ধারে কাতারে কাতারে দুপুরের কিছুটা পড়ন্ত রোদে রাশিয়ান ভি-আই-পিদের বেশ ভালভাবেই

সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল—ফুলের মালা ছুঁড়ছিল, হিন্দী-রুশী ভাই ভাই শ্লোগান তুলছিল কিন্তু বিবেকানন্দ রোড ও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এর মোড়ে ফুটপাথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ক্রমাগত ভীড়ের চাপ সইতে পারলো না।

জনগণ পুলিশের ব্যারিকেড ও কর্ডন ভেঙ্গে একদম রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের গাড়ির সামনে এসে পড়লো।

রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শবান নেতারা বোধহয় মনে প্রাণে এটাই চাইছিলেন।

বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ তথাকথিত সমস্ত প্রটোকল ও পুলিশের সিকিউরিটি জলাঞ্জলি দিয়ে কলকাতাবাসীদের সঙ্গে গাড়ীতে বসে বসেই আনন্দে করমর্দন করতে লাগলেন।

এদিকে ডালহাউসী স্কোয়ারে অপেক্ষমান জনগণ ও রাজভবনের ভেতর মেহেমান সবাই বিশেষ উৎকণ্ঠা নিয়ে উদগ্রীব—ওঁদের গাড়ী এখনো আসছেনা কেন? বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ কোথায় গেলেন? মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ই বা করছেন কী? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার ও বঙ্গবাসী দু'তিনবার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দোতালায় রাজভবনের গ্রাণ্ডষ্টেয়ার কেসে পাতা লাল কার্পেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অপেক্ষমান রাস্তার মেন নর্থ গেটের সামনের জনগন হৈ হৈ করে উঠলো—কেন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার ওঁদের আনতে যান নি? ঐ ভীড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো—প্রধানমন্ত্রীকে আনতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীই যাবেন, আর প্রেসিডেন্টকে আনতে যাবেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট বা রাজ্যে হলে সে দেশের রাজ্যপাল। এটাই কন্‌ভেনসন্‌। সব দেশেরই।

অধীর অপেক্ষমান পথচারী কে যেন তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—সব সময় তা মানা হয় না! আমরা নিজের চোখেই তা অনেকবার দেখেছি। অন্যান্য দেশ বিদেশেও এটা হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলে চলেছেন—আর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে ওনাদের তো দিল্লীতেই ভেট হয়েছে আঠারো তারিখে সর্বপ্রথম। আর জওহরলালজী তো আগামীকালের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের মিটিং-এর আগে আসছেনই। এ কথাই এখানে ওঠে না। ভিতরের কথা যা কানাঘোষা শুনছি তা হচ্ছে রাজ্যপাল হরেন মুখার্জির বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভকে দমদমে গিয়ে অভ্যর্থনা করবার আন্তরিক মনের বাসনা ছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সে গুড়ে বালি দিয়েছেন। তিনি রাজ্যপালকে অনুরোধ করে গেছেন রাজভবনেই থাকতে। ডাঃ বিধান রায় একাই ওঁদের আনতে গেছেন। প্রচুর ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন টিপ্পনী কাটলো—কেমন তরে জানলেন মশায়?

এদিকে সঙ্গে সঙ্গে তখন হঠাৎ সামনের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দিকে হৈ হৈ রব উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মিশমিশে কালো কলকাতা পুলিশের প্রিজন ভ্যান হঠাৎ তাড়বাড় রাস্তার ভিড় কাটিয়ে নর্থ মেন গেট দিয়ে হুড়মুড় করে রাজভবনে ঢুকে পড়লো।

রাজভবন এসটেটে ৯ নং গভর্মেণ্ট প্রেস নর্থের তিনতলার ছাদ লোকে লোকারণ্য। দেশ থেকে আগত আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অধীর অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রাশিয়ান নেতাদের চাক্ষুষ দেখবার জন্য।

কিন্তু হঠাৎ ভীড়ভেঙে রাজভবনের সম্মুখের রাস্তায় ঠেলাঠেলি আরম্ভ হলো। লোকজন দৌড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? রাজভবনের দিকে চেয়ে লোকজন সকলে দেখলো ঐ কালো প্রিজন ভ্যানটা রাজভবনের গ্র্যাণ্ডষ্টেয়ার কেসের সিঁড়ির সামনে দাঁড়ালো আর তার থেকে নেমে ডাঃ বিধান রায়, বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ সিঁড়ি ভেঙে গ্রাণ্ডষ্টেয়ার কেসের ওপরে রাজভবনের ইয়লো ড্রইং রুমে ঢুকছেন।

আর রাজ্যপাল সস্ত্রীক হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি বিদেশীয় অতিথিদের অভ্যর্থনায় সেখানে করজোড়ে দণ্ডায়মান।

পরে শোনা গেল ও দৈনিক সংবাদপত্রে বেরুল ডালহাউসী স্কোয়ারের মিশনরো-র মুখে জনগণের ভীড়ের চাপ এতো হয়েছিল যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বুদ্ধি করে বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভকে হঠাৎ সামনের একটা পুলিশের কালো প্রিজন ভ্যানে উঠিয়ে নিজেও তাতে চড়ে পড়েন। আবার অনেকের মত না ডাঃ রায় দোসরা গাড়ীতে এসেছেন।

যাই হোক সেদিনের মতো ডালহৌসী স্কোয়ারে জনগণের ভীড়ের চাপ কোনদিন আর দেখিনি সে রাণী এলিজাবেথ, বা চৌ-এন-লাই বা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আগমনের সময়েও।

এখন আসা যাক কলকাতার রাজভবনে এই রাশিয়ান নেতৃদ্বয় ও তাঁদের সঙ্গে আগত প্রায় বিশ পঁচিশজন সঙ্গী সাথীদের কৌতুহলদ্দীপক নানারকম আচরণের কথায়।

সত্যি কথা বলতে গেলে নিসংকোচে বলতে পারি যে স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে এই কলকাতার রাজভবনে কতো তো ভি-আই-পি দেখলাম, কিন্তু রাশিয়ান অতিথিদের মতো দিলখোলা, হাসিখুশী ভদ্র অভ্যাগত বিদেশী অতিথি খুব কমই দেখেছি।

ইংরেজ, আমেরিকান, চাইনিজ, বর্মী, তিব্বতী, জার্মাণ, আরবী প্রভৃতিরা এসেছে এখানে দলে দলে, কলকাতার রাজভবনে থেকেছে, খেয়েছে, হৈ-হুল্লোড় করেছে কিন্তু রাশিয়ান ভি-আই-পি পঞ্চাশের দশকে সেই বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের সঙ্গে ও সত্তরের দশকে মাত্র রাতটুকুর জন্য অতিথি রাশিয়ান প্রেসিডেণ্ট পদগরনির সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না।

প্রথমে একটা ঘটনা নিয়েই আরম্ভ করি।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের দলে ইংরেজি জানা ভি-আই-পি খুব কমই ছিল। মাত্র একুনে জনা চারেকের মতো। একজন মহিলা ইংরেজী ইনটারপ্রেটার মিস সফিয়া মিশানভ না কে? আর পুরুষদের ভেতর আরও জনা তিন—সকলের নাম ঠিক স্মরণে নেই।

তবে আগাগোড়া দেখেছি এই সুন্দরী মিস মিশানভেরই সব জায়গায় প্রাধান্য

পেতে। যাই হোক এ ছাড়া দলে যে লেডী টাইপিস্ট ও অন্যান্য ভি-আই-পিরা ছিলেন তাঁরা না পারেন ইংরেজী বলতে, না বুঝতে। মহা ফ্যাসাদ।

রাজভবনের হাউসহোলডের লোকেদের এ রকম কিমভূতকিমাকার পরিস্থিতিতে আগে আর কখনও পড়তে হয়নি। এর আগেও তো অনেক বিদেশী ডেলিগেশন এসেছে কিন্তু এই রাশিয়ানদের সামলাতে, তাদের কথা বুঝতে, কলকাতার রাজভবনের সকলে হিমসিম।

চা বা আইস্‌ড কফি কখন কখন গেস্টদের দিতে হবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—কতবার আর ইনটারপ্রেটার সফিয়া মিশানভকে ডাকা যায়—শেষে তার সুরাহা করে দিলেন রাজভবনের প্যানট্রীতেই একজন বিচক্ষণ কর্মী সলিল সরকার মশায়। তিনি করলেন কী হাতে একটা চামচ ও খালি কাপ নিয়ে ঘরে ঘরে টুং টাং করে বাজাতে লাগলেন আর ডান হাতের আঙ্গুল খুলে এক, দুই, তিন, চার দেখাতে লাগলেন।

তাতে বেশ কাজ হলো। ওরাও আঙ্গুল তুলে নির্দেশ দিল বিকেল তিনটের সময়।

আবার ওদের ময়লা জামাকাপড় তাড়াতাড়ি ড্রাইওয়াশ করতে হবে কিনা তা জানবার জন্য লোহার ইস্ত্রি হাতে রাজভবনের ধোবী মহাবীর ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগলো। তাতেও বেশ সফলতা এলো। ময়লা জামাকাপড় পাওয়া গেল।

কিন্তু সব চেয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল সু পালিশ নিয়ে। তার কারণ সেই বৃটীশ আমল থেকে রাজ্যপালের সব জিনিসেরই নোকর আছে, নাই কেবল জুতো পালিশ-ওয়ালা। কেন তা আমার আজও জানা হয়নি অনেক অনুসন্ধান করেও।

সাধারণত রাজভবনে ভি-আই-পি এলে নর্থ গেটের পুলিশ দিয়ে রাস্তার কোন জুতো পালিশওয়ালাকে ভিতরে এনে নেওয়া হয়। কিন্তু অসুবিধে হলো সেই তিনদিন ডালহাউসী স্কোয়ার থেকে যতো ভিখিরী নাকারী, কাগজ কুড়ানেওয়ালা মায় ফুটপাথের জুতো পালিশওয়ালাদেরও হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেষে অনেক পয়সা কবুল করে মেট্রো সিনেমার নিচ থেকে একজন আধ বুড়ো গোছের জুতো পালিশওয়ালা ধরে এনে নর্থ গেটের থানার সামনে সব সময়ের জন্য মোতায়েন করে রাখা হলো।

সে মাঝে মাঝেই জুতোর ব্রাশ ও জুতোর কালি নিয়ে রাজভবনের কোন খাস পিওনের সঙ্গে ঘরে ঘরে ঘুরে ভি-আই-পিদের জুতো পালিশ করে দিতে লাগল। সমস্যা মিটল।

এখন সেই দিনের বিরাট মিটিং-এর কথায় আসি।

মিটিং আরম্ভ হলো ঠিক দুটোর সময়—তারিখ ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৫। স্থান কলকাতা ময়দানের বিরাট ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। কলকাতায় শুধু আকাশবাণী (টি-ভির কলকাতায় প্রথম সেন্টার হয় ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট) সঙ্গে সঙ্গে জন-নেতাদের ভাষণগুলি সারা দেশে রীলে করতে লাগলো।

সে দিনের জনসভায় প্রথমে কলকাতা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী বুলগেনিন ও

ক্রুশ্চেভকে প্রথম সম্বর্দ্ধনা জানান তখনকার কলকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

এর পর বক্তৃতা দিতে মঞ্চে ওঠেন মিঃ ক্রুশ্চেভ। তিনি তখন সমগ্র রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টীর প্রধান সেক্রেটারী। সুতরাং সমগ্র রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব।

তাঁর রাশিয়ান বক্তৃতার ইংরেজী ইনটারপ্রেটার হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা অপূর্ব লাবণ্যময়ী তন্বী সুন্দরী মহিলা শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভ।

ক্রুশ্চেভ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—

Esteemed Dr Mookherjee, Governor of West Bengal
Esteemed Dr Roy, First Minister of West Bengal
Esteemed Mr Ghosh, Mayor of Calcutta

Allow me to thank you for the exceptionally warm and friendly reception you have extended us representatives of the Soviet Union, your unselfish friend and brother (stormy applause).

আমাদের এই দেশে স্বল্পকালের জন্য এসে আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছি যে আপনারা আমাদের সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের রাখীতে সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে থাকতে চান। আমাদের এই উভয়দেশের ভ্রাতৃত্বের ভালবাসা বহুকালের সুদূরে প্রসারিত (করতালি)······আপনাদের এই মহান ভারতবর্ষ এখন সদ্য স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতাই আপনাদের অগ্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ। সারা পৃথিবীর ঔপনিবেশিকতাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে আজ যে এশিয়ার জনগণ একসাথে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এতেই আমরা সবিশেষ উৎফুল্ল······

পরগাছার মতো আজও অনেক দেশ অন্য দেশের কিছু অংশকে পদানত করে রক্ত চুষে খাচ্ছে। পর্তুগালের কথাই ধরুন না কেন, যারা আপনাদের ভারতের নায্য ভূখণ্ড গোয়াকে ছেড়ে দিতে চাইছে না।······ (করতালি)। এশিয়াবাসীদের ঐক্যবদ্ধতা নৈতিকভাবে আজ সারা বিশ্বের ঔপনিবেশিকতাবাদকে ভীষণভাবে আঘাত হানছে।

পশ্চিমবাংলার রাজধানী আপনাদের এই মহান কলকাতায় আমরা এসেছি এবং আমরা এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বাঙ্গালী আপনারাই সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক আত্মোৎসর্গ করেছেন। (জনগণের আকাশ ফাটানো করতালি)।······

অনেক দেশের এটা মোটেই পছন্দ নয় যে ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত জনগণের মৈত্রী দৃঢ়ভাবদ্ধ হোক, এবং তারা সকল সময়ে চাইছে এটা ভেঙে যাক। তারা চান না পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণ এক হোক ও পৃথিবী শুভ ভ্রাতৃত্বের আলোকে আলোকিত হোক······অনেক দেশের গভর্ণমেণ্ট যেমন চান যে তাদের দেশের ভাবধারা বা জীবন

প্রণালী অন্যান্য দেশ অন্ধভাবে অনুকরণ করুক, আমরা সোভিয়েত জনগণ কখনই তা মনে করি না। নিজের নিজের দেশের প্রাচীন স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠুক এটাই আমাদের কাম্য।

আণবিক ও হাইড্রোজেন যুদ্ধ একেবারে পৃথিবী থেকে বন্ধ হোক এবং অন্যান্য সকল মজুদ অস্ত্র ভাণ্ডার আস্তে আস্তে বিলোপ পাক, এটাই আমরা চাই। (করতালি)। কিন্তু দুঃখের কথা পশ্চিমী দুনিয়ার কাছ থেকে আমরা এ বিষয়ে মোটেই সহযোগিতা পাচ্ছি না। সে দেশের একচেটিয়া পুঁজীবাদী যুদ্ধবাজরা এটা মোটেই পছন্দ করেন না……। সর্বক্ষণের এটাই আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যে অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে রুখে দেওয়া ও সর্বপ্রকার আণবিক যুদ্ধ বন্ধ করা। কেবল মাত্র মৌখিক ভাবে নয় আমরা মন প্রাণ দিয়ে চাই পৃথিবীতে আর যেন যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বলে না ওঠে। করতালি……

আপনাদের প্রিয়দর্শিনী শহর এই কলকাতায় আসতে পেরে আমরা আরও উৎফুল্ল ও গর্বিত এই জন্য যে এই শহর সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনগরী। আমরা আরও আনন্দিত এখানে এসে কারণ এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত লেখক ও ভারতমাতার শ্রেষ্ঠতম মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। করতালি……

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সোভিয়েত জনগণের আত্মার আত্মীয় ও চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু। (করতালি…) সারা সোভিয়েত দেশ সব সময়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথকে স্মরণ করে ও তাঁর রচনাবলীর একনিষ্ঠ ভক্ত। করতালি……

আমাদের দেশের অন্যতম মহান সন্তান জিবাসিম্ লেবেডফ এখানে এই কলকাতায় সেই কবে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই শহরেই জনাকয়েক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের নিয়ে এই শহরে প্রথম বাংলা থিয়েটারের পত্তন করেন।…

বন্ধুগণ পরিশেষে আবার আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রতি আপনাদের এই অভূতপূর্ব উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য। সোভিয়েত জনগণের প্রতি আপনাদের এই ভালবাসা আমাদের জাতীয় জীবনে মহামূল্যবান। আবার বলছি আপনারা ও আমরা ভাই ভাই—হিন্দী রুশী ভাই ভাই। (আকাশ ফাটানো করতালি)।……

আমাদের ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন—ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে—দিন দিন বেড়ে উঠুক ও সুদৃঢ়বদ্ধ হোক এই কামনা করি। করতালি……পৃথিবী যুদ্ধশূন্য শান্তিময় হোক। (আকাশ ফাটানো করতালি)……

* * * *

সর্বশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতা দিলেন—

আমাদের ভারতের এই মহান রুশী বন্ধুরা—বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ—বারো দিন আগে আঠারোই নভেম্বর ১৯৫৫ আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লীর মাটিতে প্রথম পা দিয়েছেন ও আমাদের সেখানকার জনগণের দ্বারা আন্তরিকভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। তারপর থেকে আমাদের এই রুশী বন্ধুরা ক্রমাগত আমাদের এই বিশাল দেশের

নানা শহর ও গ্রাম গঞ্জের আপামর জনসাধারণের সংগে ক্রমাগত দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা করেই চলেছেন।

তাঁরা এখন এসেছেন আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে মহান ও বড় শহর এই কলকাতায়। আর আপনারা পশ্চিমবঙ্গবাসী তাঁদের হার্দিক সওয়াগত জানাতে কলকাতার এই বিগ্রেড ময়দানে যে বিশাল জনসমুদ্রের সমাবেশ করেছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। ভারতীয় আমরা আমাদের কাছে নানা জাতির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এমন কিছু নুতন কথা নয়। যুগ যুগ ধরে আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি-এর প্রধান পরিচায়ক। প্রায় দু' হাজার দু' শো বছর আগে এই ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তান সম্রাট অশোক সমগ্র মানুষের এই সহ অবস্থানের বাণী পাহাড়ে পর্বতে, গ্রামে গঞ্জে, মহীরূহে শিলালিপীতে খোদিত করে রেখে গেছেন। সেগুলি আজও অক্ষয় অমর হয়ে জ্বলজ্বল করে বিরাজিত। সম্রাট অশোকের উদাত্ত বাণী ছিল সকলের সকল ধর্মকেই সমান সম্মান করতে হবে। নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং অপরের ধর্ম নিকৃষ্ট এই আত্মম্ভর মনোভাবে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। ভারত যুগ যুগ ধরে এই মহান আদর্শেই আদর্শবান।

সোভিয়েত রাশিয়ার এই মহান অতিথিদের আমাদের দেশবাসী যে রকম আন্তরিক সম্মান ও আতিথেয়তা দেখাচ্ছে তাতে বিদেশী আমাদেরই কিছু কিছু বন্ধু রাষ্ট্র অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে কারণ তাঁরা চাইছিল জাতিতে জাতিতে বিভেদও বিসংবাদ এবং সামরিক তৎপরতা শত্রুতা।

সোভিয়েত নেতাদের আমাদের দেশে ঐতিহাসিক এই প্রথম পদার্পণ আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের গৌরব এনে দিয়েছে এবং পৃথিবীর নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করতে আমরা উভয়ে আজ হতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম। আমরা বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই যে আমাদের এই ভ্রাতৃত্ব অপর কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠীর অশুভ বা অকল্যাণকর নয়। আমরা এও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর পৃথিবীর সকল মানুষ সকল জাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ করবে। আমরা এর জন্য আজ এই শুভ মুহূর্তকে প্রণাম জানাই।

পরিশেষে মহান এই বন্ধুদেরও সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে আমি আমার দেশ, জাতি ও নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (আকাশ ফাটানো করতালি।·· ···

ময়দানের মিটিং সুরু হয়েছিল বেলা দুটোর সময় এবং আকাশবাণীর রীলে করা ধারা বিবরণী দিয়ে তা শেষ হল বেলা পাঁচটায়।

এরপর রাজভবনের দক্ষিণে মহামান্য তিলকের ষ্ট্যাচুর সামনে ময়দানের দিকের গেট দিয়ে, বুলগেনিন, ক্রুশ্চেফ, জওহরলাল, ডাঃ বিধান রায় ইত্যাদি নেতারা তাঁদের দলবল সহ রাজভবনে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যের সময় রাজভবনের দক্ষিণ পূর্বের দোতালায় ব্রাউং ড্রইন রুমের পারমানেন্ট স্টেজের উপর উদয়শংকরের ব্যালে ট্রুপের নাচের আসর বসলো।

প্রথম নাচ হলো রামলীলা ও পরে ফ্লাড অব আসাম—সেবার ১৯৫৫ সালে আসামে খুব বন্যা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নাচের কল্পনা।

চেয়ারের প্রথম সারিতে বসেছিলেন যথাক্রমে ক্রুশ্চেভ, বুলগেনিন, জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও সস্ত্রীক রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি।

তবে ক্রুশ্চেভ ও রাশিয়ান প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন-এর মাঝখানে সেদিন আসন নিয়েছিলেন ভারত সরকারের তখনকার চীফ্ অব প্রটোকল নিত্যানন্দ কানুনগো।

মিঃ কানুনগো ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিনকে নাচের বিষয় বস্তু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর পাশে বসা দোভাষী মিস্ সোফিয়া মিশানভ-এর সাহায্যে।

ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাত্রি পৌনে আটটা পর্যন্ত চললো। তারপর রাজভবনের ঐতিহাসিক ব্যানকোয়েট রুমে রাশিয়ার অতিথিদের সম্মানে রাত্রের ডিনার সুরু হলো।

এতে রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদ ভি-আই-পি গেষ্ট, রাজ্যের চীফ জাষ্টিসরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলার ইত্যাদি অতিথিদের নিয়ে এই ভোজসভায় প্রায় একশো কুড়িজনকে ডাকা হয়েছিল। এবং যেহেতু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মোগলাই খানা বিশেষ পছন্দ করেন তাই সে দিনের রাত্রের ভোজ সভায় নূতন ও পুরানো মোগলাই খানার বিভিন্নতা মিলিয়ে অনেক রকম আইটেম সার্ভ করা হয়েছিল।

যদিও সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা রাজভবনের স্পেশাল আইটেমও দু' একটা যুক্ত ছিল—যথা পান পাকৌড়া, স্মোক্‌ড্ হিল্সা ইত্যাদি।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী নিরামিষ খাবারেরও অনেক রকমের ভ্যারাইটি ছিল—যার যেটা পছন্দ। চেয়ারের পেছনেই লেখা আছে—ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান।

ভোজসভা যখন চলছিল তখন যথারীতি রাজভবনের ব্যানকোয়েট হলের পূর্বদিকের বারান্দার মিলিটারী ব্যাণ্ডে বাজছিল মৃদুসুরে পর্যায়ক্রমে—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা; বাংলার মাটি, বাংলার জল; হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, দুর্গমগিরি কান্তার মরু, ইত্যাদি, ইত্যাদি গানের সুর। খাবারের সেদিনের মেনু ছিল:—

আমিষ	নিরামিষ
প্রণ কক্‌টেল	গ্রেপ ফ্রুট্ ককটেল
ক্রীম অব আমণ্ড স্যুপ	ক্রীম অব আমণ্ড স্যুপ
স্পাইড টোমাটো ভেটকী	ম্যাকরানী গ্রেটীন
স্মোক্‌ড্ হিলসা	পোলাউ ন্যান
কাশ্মিরী বিরিয়ানী—ন্যান	আলুর দম—মটরপনীর
মোগলাই পরোটা, লুচি	পানপকৌড়ি

আমিষ	নিরামিষ
শাহী টুকরো	সালাড্ আচার চাটনী
মুগর মাখানি	রসমালাই
কাবাব	সন্দেশ
রোগান জুস রায়তা	ফ্রুট সালাড এ্যাণ্ড ক্রীম
মটর পনীর সালাড	ফ্রেস ফ্রুট
আচার চাটনী	দই
রসমালাই	কফি
সন্দেশ	পান
ফ্রুট সালাড এ্যাণ্ড ক্রীম	
ফ্রেস ফ্রুট	
কফি	
পান	

বলা দরকার এখানে রাজভবনে চিরদিন দেখা গেছে পৃথিবী বিখ্যাত কোনো ভি-আই-পি রাজভবনে এলেই অযাচিতভাবে কলকাতার অনেক চতুর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বা অন্যান্যরা নানারকম দই মিষ্টি, পান সন্দেশ নানা রকমের ফুল ইত্যাদি বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দেন রাজভবনে যদি তার দৌলতে রাজভবন থেকে সেই রাষ্ট্রপ্রধান বা ভি-আই-পির একটা পছন্দমাফিক সার্টিফিকেট জোগাড় করা যায় তার দোকানের পপুলার এ্যাডভারটাইজের জন্য। সেটা দোকানের সামনে ঝোলানো থাকলে খরিদ্দার টানা যাবে।

কলকাতার এক বিশিষ্ট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর দোকানে এখনও দেখা যায় জলজল করে উজ্জ্বল হয়ে ঝুলছে উনিশশো পঞ্চান্ন সালের ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিনের দেওয়া এক সার্টিফিকেট ভবানীপুরের তাদের দোকানের মেন কাউনটারে তাদের দই এর ভূয়সী প্রশংসায়।

এখানে যদিও বলা দরকার যে সেখানে সত্যিই কলকাতার রাজভবন থেকে দই ও মিষ্টির অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিনের ভিজিটের সময় ৫টা আমি রাজভবনের কাগজ পত্রে দেখেছি।

এ ছাড়াও বিদেশী ভি-আই-পি অতিথিদের সেলাই-এর কল, ফ্যান, সাইকেল, ঘড়ি, সিল্কের থান কাপড়, হাতীর দাঁতের জিনিস, কাঁসার বাসন, টেবিল ল্যাম্প, সাটের ক্যাফলিং ও বোতামে I love Calcutta—ইত্যাদি ইত্যাদি লেখা বহু রকমের জিনিষ ব্যবসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত হয়ে নিজে রাজভবনে বিদেশী নেতাদের উপহার দিয়ে যান।

হয়তো তাঁরা আশা করে থাকেন যে এর দৌলতে সেই দেশ যদি কিছু এদের এই সব তৈরী করা জিনিষ নিজের নিজের দেশে আমদানী করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে এখানে একটা ঘটনা আমার ভীষণ বিসদৃশ লেগেছিল এই যে, আমি আমার

রাজভবনের ত্রিশ বছরের বিজড়িত জীবনে সর্বদা লক্ষ্য করে এসেছি যে বিদেশের যে সব রাষ্ট্রপ্রধান বা ভি-আই-পি এই কলকাতার রাজভবনে বেড়াতে এসেছেন, তাঁরা রাজভবনের কর্মচারীদের তাঁদের বিদায়ের সময় যা কিছু প্রেজেনটেশন বা উপহার দিয়েছেন তা তাঁরা নিজেদের সঙ্গে দেশ থেকে এনেছেন নিজেদের দেশের টুকিটাকি জিনিষপত্র যথা, হাতঘড়ি, মেডেল্স ফটোস্টাণ্ডে নিজের সই করা. ফটো, ক্যামেরা ইত্যাদি।

কিন্তু এই প্রথমবার আমার দীর্ঘ কলকাতার রাজভবনের চাকরী জীবনে দেখলাম ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিন যাকে বলে আমাদের দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করা তাই করলেন। অর্থাৎ কলকাতাবাসী ব্যবসাদারেরা যা কিছু উপহার ক্রুশ্চেভ, বুলগেনিনকে দিয়েছিলেন সেগুলিই রকমফের করে রাজভবনের স্টাফদের মধ্যে বিলি করে গেলেন। কেউ পেল ফুলের ভাস, কেউ পেন, কেউ টেবল-ল্যাম্প ইত্যাদি।

কেবলমাত্র তখনকার রাজ্যপালের সেক্রেটারি মিঃ এইচ. সি. সেন পেয়েছিলেন নাকি একটা দামী তাঁদের দেশের রাশিয়ান ক্যামেরা ও পরে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজাকে উপহার দিয়েছিলেন দুটি উধরী বাঘের বাচ্চা—

—পদ্মজা যাদের নামকরণ করেছিলেন রাজা ও শশী—

এবার বলি মিঃ ক্রুশ্চেভ ও প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিনের সঙ্গে আগত তাঁদের ইংরেজী জানা ইনটারপ্রেটার মিস সোফিয়া মিশানভ সম্বন্ধে কিছু কৌতুহলদ্দীপক ঘটনা—

রাজভবনে যখনি কোনো নামজাদা ভি-আই-পি বা রাষ্ট্রপ্রধান আসেন তখন রাজভবনের কিছু অফিসার ও ষ্টাফকে বিভিন্ন রাজভবনের স্যুইটে ও একতলার সেকেণ্ড ক্লাস গেষ্ট রুমে ডিউটি দেওয়া হয়,—আগত অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য। এটা বরাবরের নিয়ম কলকাতার রাজভবনে।

ইংলিশ ইনটারপ্রেটার পরমা সুন্দরী শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভ বোধহয় রাশিয়ান দলবলের সঙ্গে তারপর দিন কলকাতা ত্যাগ করবেন সুতরাং তিনি সেদিন উদয়শংকরের ডান্স ড্রামা না দেখেই সন্ধ্যার মুখে রাজভবনের একটা অশোক চক্র দেওয়া গাড়ী নিয়ে কলকাতার নিউ মার্কেটে-এ কিছু টুকিটাকি বাজার করতে একা বেড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি যখন বাজার করে ও কলকাতা ঘুরে ফিরে রাজভবনে ফিরলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

রাজভবনের মারবেল হলে গাড়ি থেকে নেমে তিনি সামনের কর্তব্যরত বাঙ্গালী অফিসারটিকে মৃদুস্বরে বললেন—দয়া করে আমাকে সেকেণ্ডক্লাস গেষ্টরুমটা কোন-দিকে একটু দেখিয়ে দেবেন? এতোবড় আপনাদের রাজভবনে আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আরও বললেন, আর আশ্চর্য্য এই নভেম্বর মাসেই আপনাদের কলকাতা শহরেও দেখছি আমাদের দেশের মতো বেশ শীত পড়ে। কলকাতার রাস্তায়ও দেখলাম

শীতে লোকজন খুব কম চলাফেরা করছে। হ্যাঁ, আসুন না একবার আমাদের দেশে বেড়িয়ে যান। আমাদের দেশটা একবার দেখুন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমারই সহকর্মী বিশিষ্ট বন্ধু রাজভবনের সেই সেকশন্ অফিসার মিঃ মুখার্জি সোফিয়া মিশানভের মুখে এ রকম সুললিত কণ্ঠে বাংলা ভাষার স্পষ্ট উচ্চারণ শুনে তো একেবারে 'থ' মেরে গেছেন—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী স্বপ্ন দেখছি? কৈ না তো, ঠিকই তো সোফিয়া মিশানভের পাশেই হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছে—মিঃ মুখার্জি সম্বিত ফিরে পেয়েছেন।

মিঃ মুখার্জি হেসে মিস মিশানভকে বললেন—চলুন আপনাকে আপনার ঘরে পেঁছে দি। বয়স আমার অনেক—মিঃ মুখার্জি হাসতে হাসতে শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভকে বলে চলেছেন—আপনাদের দেশে এ জীবনে যেতে হয়তো পারবো না কারণ আমি সামান্য চাকুরীজীবী। আপনাদের দেশে যাবার মতো আমার পয়সা নেই। কিন্তু তাজ্জব ম্যাডাম, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে কোথা থেকে শিখলেন। এ যে আমাদের বাঙ্গালীকেও হার মানিয়ে দেয়।

হাসতে হাসতে সোফিয়া মিশানভ রাজভবনের একতলার সেকেণ্ড ক্লাস গেষ্টরুমের দিকে চলেছেন মিঃ মুখার্জির সঙ্গে। কথাগুলি শুনে তিনি যেন একটু থমকিয়ে দাঁড়ালেন, পরে বললেন—আগে চলুন আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিন এবং একাপ "আইস্‌ড" কফি খাওয়ান—গরম কিন্তু একেবারেই নয় ওটা আমাদের দেশে প্রায় অচল—তারপর তো আপনাকে আমার বাংলা শেখা সম্বন্ধে সব কিছু বলবো।

তক্ষুনি আইস্‌ড কফি এলো সোফিয়ার ঘরে।

সোফিয়া কফি খেতে খেতে আরম্ভ করলো—আমার মা রাশিয়ান আর বাবা ইণ্ডিয়ান। এ খবরটা তো দেখলাম আজ আপনাদের এখানকার সকালের অনেক ইংরেজী দৈনিকেও বেরিয়েছে।

বাবা আমার সেই ছোট্ট বেলায় মারা গেছেন। তিনি আপনাদের দেশের পুণার লোক ছিলেন। পেশায় ছিলেন জিওলজিস্ট—পাথর লোহা, তামা নিয়ে কারবার। এই তো এই ট্যুরে পঁচিশে নভেম্বর আমি আমার দলের সঙ্গে পুণায় পেঁছে নিজে আমার পরলোকগত বাবার বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

আমি এই প্রথম ইণ্ডিয়াতে আসবার সময় আমার মা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমার পরলোকগত বাবার সবেধন নীলমণি তাঁর স্বহস্তে লিখিত ইণ্ডিয়ার, একটি শুধু এ্যাড্রেস ও তাঁর ছবি। এ ছাড়া মার কাছে বাবার আর কোন ঠিকানা ছিল না।

অবশ্য বাবার আর একটা বড় ফটো ও তাঁর ব্যবহৃত নানা টুকিটাকি জিনিষ সব সময়ে আমরা আমাদের বাড়ির ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের পঁচিশে নভেম্বর পুণার জনসমাবেশের পরই তাড়াতাড়ি খুঁজে পেতে বাবার বাড়ির ঠিকানায় ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। প্রথমে এই ট্যুরে আঠারোই নভেম্বর দিল্লী এসেই আমি পরলোকগত বাবার ঐ

ঠিকানায় একটা জরুরী তার করে দিয়েছিলাম। তবে বোধহয় বাবার জন্মস্থান না গেলেই আমার ভাল হতো। এ স্মৃতি আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না।

গিয়ে দেখলাম বাড়িতে বাবার আত্মীয় বলতে কেউই আর বেঁচে নেই। একজন কেবলমাত্র অতিবৃদ্ধা বাবার সম্পর্কের বোন একটি জীর্ণ ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবার একটি ফটো, আমাদের মস্কোর বাড়ির হুবহু ডুপলিকেট, দেখালেন ঐ ঘরের দেয়ালে টাঙানো অতি অযত্ন ভাবে।

কী আর করি তখন ঐ বৃদ্ধার হাতে আমার মা'র দেওয়া বাবার বাড়ীর লোকজনের জন্য কিছু টুকিটাকি উপহার কোনক্রমে তুলে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। তারপর আর এক মুহূর্তও আমি ওখানে দাঁড়াই নি। ফিরে এসেছিলাম সোজা গাড়ি করে নিজেদের হোটেলে দলবলের কাছে।

আর আমার বাংলা ভাষা জানা?—মিস সোফিয়া মিশানভ যেন স্মৃতির মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন—তারও একটা করুণ ইতিহাস আছে, মিঃ মুখার্জি।

আমি যখন ইংলিশ ইনটারপ্রেটারের চাকরী নি তখন মস্কোর অনেক ফরেন এমব্যাসীর অফিসে আমাকে ঘুরতে হতো নানা কাজে। এ ছাড়া মস্কো ইউনিভার-সিটিতেও বাংলা ল্যাংগুয়েজের ক্লাস করেছিলাম। সেই সময় আপনাদের ইণ্ডিয়ান এমব্যাসী অফিসে মনের মতো একজন বাঙালী বন্ধু খুঁজে পেয়েছিলাম। শুধু তাকে বন্ধু বললে আজ ভুল হবে। সে ছিল আমার প্রাণের ঐশ্বর্য্য। স্বপ্নের পুরুষ।

তার কাছে দীর্ঘদিন বাংলা ভাষা শিখেছি, দুজনে এক সঙ্গে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়েছি—রবীন্দ্রনাথের তার শেখানো গান সুর করে গেয়েছি দুজনে গলা মিলিয়ে কতোদিন।

আমাদের মস্কোর তিনতলার এ্যাপার্টমেণ্টে বিজন প্রায়ই আসতো সময়ে অসময়ে। আমাদের বাড়ীতে তার আসার জন্য সময় অসময় ছিল না। মা'ও তাকে হয়তো অন্য চোখে দেখতেন, তাই তাকে খুব স্নেহ যত্ন করতেন।

হয়তো বা মা'র মনেও কিছু একটা গোপন ইচ্ছে ছিল আমার বন্ধুটি বিজন ভারতবর্ষীয় বলে। কারণ আগেই বলেছি আমার বাবারও তো জন্মভূমি এই দেশেই ছিল।

কিন্তু কেন জানিনা সেই বন্ধুটিও আমার জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

আমার শত চেষ্টাতেও বিজনকে আর ফিরে পেলাম না। এর কিছু দিন পরেই আমার মা, কেন জানি, হঠাৎ এই ব্যাপারে মনে দারুণ আঘাত পেয়ে মারা যান।

আমি এখন পৃথিবীতে একা, থাকি যদিও ঐ মস্কোর সেই তিনতলার পুরানো এ্যাপার্টমেণ্টে, মা, বাবা ও ঐ আমার হারানো বন্ধুটির স্মৃতির সৌরভই এখন আমার দিন কাটাবার পাথেয়।

আমার অফিসের সহকর্মী মিঃ মুখার্জি সোফিয়া মিশানভের কথাগুলি তন্ময় হয়ে একমনে শুনছেন দেখে মিস সোফিয়া মিশানভ হঠাৎ যেন নিজের সম্বিত ফিরে

পেয়ে ম্লান ভাবে হেসে উঠলেন—মিঃ মুখার্জি রাতের ডিনারটি দয়া করে আজ আমার ঘরে পাঠাবেন না। আমার আজ কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছে নাই। সোফিয়া মিশানভ আরো বললেন—প্রটোকল বহির্ভূত অনেক কথা আপনাকে কেন জানি বলে ফেললাম। ক্ষমা করবেন। কিন্তু এই কথার একটি অক্ষরও মিথ্যে বা অসত্য নয় এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবেন। আর আপনি এটা বিশ্বাস করলে আমি হয়তো মনে একটু শান্তি পাবো এই ভেবে যে আমার স্বর্গীয়া মার স্মৃতি ও আমার মনের বেদনা আমি ভারতবর্ষের একজন সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে অকপটে আজ এখানে বলতে পেরেছি।......

আমার সেই রাজভবনে সহকর্মী মিঃ মুখার্জির কাছে এ ঘটনা জানবার পর আমি অনেকবার কলকাতার গোর্কি সদন, রাশিয়ান এমব্যাসী ইত্যাদিতে শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর বা তাঁর মস্কোর ঠিকানা জানতে উৎসুক হয়েছি।

কিন্তু কেন জানিনা মহান লেনিনের দেশের লৌহ যবনিকার আড়ালে ঐ ১৯৫৫ সালের বুলগেনিন, ক্রুশ্চেভ-এর সঙ্গে আগত ইংলিশ ইনটারপ্রেটার শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভের মস্কোর ঠিকানাটি আজ পর্যন্ত জোগাড় করা সম্ভব হয় নি।

এখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে এই রাশিয়ান ভিজিটের ব্যাপারে দু'একটা ঘটনা বলি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আর শোনা যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ডাঃ রায়কে দিল্লী থেকে ফোনে অনুরোধ করেছিলেন যে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের সম্মানে কলকাতা ময়দানে জনসভায় যেন ভারতের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ জন সমাগম হয়। এ কথা আমি আগেই লিপিবদ্ধ করেছি। এবং এও বলেছি যে ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিন-এর কলকাতা আগমনের দিন অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৫ সাল বেলা দু'টো রাস্তায় রাস্তায় ও বাড়ীর অলিন্দে ও আনাচে কানাচে ও দমদম এরোড্রাম থেকে রাজভবনের সিংহ দরজা পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পথের পথিপার্শ্বে গাছের ডালে ডালে এতো জনসমাগম হয়েছিল যে খোদ রাজভবনের ৯নং গভর্মেন্ট প্লেস নর্থ-এর তৎকালীন তিনতলা লাল বিল্ডিং-এর নীচে (এই কিছুদিন আগে জীর্ণ হওয়ার অছিলায় ওটা ভেঙে ফেলা হয়েছে) উৎসুক দর্শনাপ্রার্থীনী আসন্ন প্রসবা এক মহিলার এই অস্বাভাবিক ভীড়ের চাপে পথিমধ্যে ফুটপাথেই পুত্র প্রসব হয়ে যায়।

এবং আশ্চর্য্য ঐ রকম হুড়োহুড়ির মধ্যেও রাজভবনের তৎকালীন রাজ্যপালের নিজস্ব ডাক্তার ডঃ মুখার্জি কোনক্রমে এই রাজভবনের পাশেই পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশ অফিস থেকে তড়িঘড়ি একটা এ্যামবুলেনসের গাড়ী এনে সেই সদ্য প্রসূতি মা ও বাচ্চা সমেত ঝটিতি পাশের ওয়াটারলু স্ট্রীটের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি কলকাতা মেডিকেল কলেজে চলে গিয়েছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে, আমার তো মনে হয়, এমন ঘটনা অতি বিরল—আদৌ হয়েছে

কিনা তাই সন্দেহ। এখনও যে দু'চারজন পুরোনো দিনের বাসিন্দা, রাজভবনে রয়েছেন তারা সকলেই চাক্ষুস সেদিনের এ ঘটনার সাক্ষী।

এবার আসি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্বকীয় উদ্ভাবনি মেধার সৃষ্ট দু' একটি রসাল ঘটনার বর্ণনায় ঐতিহাসিক এই ভিজিট্ সম্বন্ধে। এই বই এ "কলকাতার রাজভবন ও বিধানচন্দ্র রায়" ইতিবৃত্তে ডাঃ রায়ের তখনকার অনেক তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও পারসোনালিটির সম্বন্ধে লিখেছি।

এখন এই রাশিয়ান ভিজিট সম্বন্ধেও দু' একটা মজার ঘটনা বলি যা সত্যি উপভোগ্য।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বুলগেনিন ও রাশিয়ার তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ ক্রুশ্চভকে নিয়ে তো ডাঃ রায় ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৫ দুপুর বেলায় কলকাতার রাজভবনে এনে উঠালেন। তারপর কী হলো শুনুন।

পরের দিন জওহরলাল কলকাতায় আসছেন, সে দিনই দুপুরে ঐ দুই রাশিয়ান অতিথিকে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষ থেকে ব্রিগেড প্যারাড গ্রাউন্ডে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও সেই জনসভায় বক্তৃতা দেবেন।

সুতরাং পরিশ্রান্ত বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছেন কলকাতা রাজভবনের সব চেয়ে দামী স্যুইট প্রিন্স অব ওয়েলসএ।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর মধ্যে কখন রাজভবনের দক্ষিণের গেট দিয়ে বেড়িয়ে গাড়ি করে সটান রাইটার্স চলে গেছেন—সেখানে নাকি তাঁর কতগুলি জরুরী ফাইল পড়ে আছে তাঁর স্বহস্তে লিখিত নির্দেশনামা পাবার জন্য।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আগে থেকেই ঠিকঠাক আছে ডাঃ রায় আজ রাত্রের স্যুইট ডিনার রাজভবনে সারবেন সদ্য আগত বুলগেনিন, ক্রুশ্চেভ ও সস্ত্রীক রাজ্যপালের সঙ্গে রাত আটটায়। সবই ঠিকঠাক।

এর মধ্যে হঠাৎ রাজভবনের প্যানট্রীর লোকেরা অবাক হয়ে দেখলো ঐ দিন রাত সাতটার সময় জনা তিনেক লোক হাতে বড় বড় তিনটি এ্যালুমিনিয়ামের গামলা করে কিছু মিষ্টি ও দই এনে নামালো প্যানট্রীর প্রায় মাঝ বরাবর।

সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ রায়ের তখনকার প্রাইভেট সেক্রেটারী ধ্রুব সেন না কে ও আরও জনা দুই ভদ্রলোক। তার মধ্যে একজনের হাতে ডাঃ রায়ের হাতে লেখা একটা চিরকুট।

অনিল (অনিল ভূষণ মুখার্জি তখন রাজভবনের প্যান্ট্রীর কম্ট্রোলার ছিলেন) আমি ডিনারে ঠিক সময়ে পেঁছাবো। আজকের রাত্রের খাবার মেনুতে সম্ভব হলে, বেশির ভাগ আমাদের বাঙালীর খাদ্যদ্রব্য রাখবেন অর্থাৎ লুচি, পোলাও, রাধাবল্লভী ভেটকী মাছের ফ্রাই, ইলিশের দই মাছ, চিংড়ির মালাই কারি ইত্যাদি

আর আমি আমার তরফ থেকে পাঠালাম বাঙালীর ঐতিহ্যপূর্ণ স্পেশাল সাইজের কয়েকটি অতি বৃহৎ রসগোল্লা ও দু' হাড়ি দই।

আগামী কাল রাত্রে যে আপনাদের বিশাল ভোজসভা বসবে—তাতে আপনাদের

রাজ্যপালের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছে গেস্টদের খাওয়াবেন—ইংলিশ, চায়নিজ, রাশিয়ান, জাপানিজ, ভারতীয় যা ইচ্ছে হয় তাই কিন্তু আজকে আমার অনুরোধটা দয়া করে রাখবেন—বাঙালী খানা যেন হয়।

আর একটি অনুরোধ।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি রাশিয়ানরা ইংরেজদের মতো বারে বারে অল্প অল্প খায় না। এরা যখনই খায় তখন আহারের পরিমাণটা বেশ প্রচুর থাকে।

সুতরাং রাজভবনের সবকটি গেস্ট স্যুটেই নূতন ফ্রিজিডিয়ার একটা করে দিয়ে দেবেন এবং প্রত্যেকটিতে যেন রোস্ট করা পাঁঠার ঠ্যাং খান চারেক করে ভরা থাকে। তা ছাড়া কিছু আধ সেদ্ধ ডিম, কিছুটা ভাজা কাজুবাদাম, কিছু আপেল ও কিছুটা আখরোটও যেন অবশ্যই রেখে দেবেন। এবং মাঝে মাঝেই ফ্রিজগুলি খুলে দেখে নেবেন। খাবার তাতে ফুরিয়ে গেলে আবার খাবার ঠেশে ভরে দেবেন তাতে কারণ রাশিয়ান অতিথিরা আমাদের দেশে এই প্রথম বেড়াতে এসেছে। ওঁদের যেন কিছুতেই কিছু অসুবিধেয় পড়তে না হয়।

হ্যাঁ, এও জানতে পারলাম রাশিয়ানরা আমাদের ওয়েস্টার্ন দেশের মতো হট কফি বা চা পছন্দ করে না, ওদেরকে আইস্ড কফি বা চা বেশী করে বারে বারে দিতে হবে। চিঠিটার নীচে ডাঃ রায়ের হাতের সই।

সেইদিন রাত্রে অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৫ কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময়ে রাজভবনের ব্যানকোয়েট হলে এই ছোট্ট ডিনার বসলো—

—সস্ত্রীক রাজ্যপাল হরেন মুখার্জি, পাশে বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ ও সব শেষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আর বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের ঠিক পেছনে রাশিয়ান ইংরেজি ইনটারপ্রেটার সুন্দরী মিস সোফিয়া মিশানভ।

রাজভবনের ধড়া চূড়া পরা বাবুর্চি ও খিদমৎগারেরা খাবার প্লেটে প্লেটে ডিনার টেবিলে দিয়ে যাচ্ছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আদেশ অনুযায়ী বাঙালীর খানাই বেশী হয়েছে আজ—পোলাও, রাধাবল্লভী, লুচি, পটল ভাজা, ভেটকী মাছের ফ্রাই, ইলিশের দই মাছ ইত্যাদি।

হাসি হাসি মুখে বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভ খাচ্ছেন ও মাঝে মাঝে রাজ্যপাল, ডাঃ রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন রাশিয়ান ইনটারপ্রেটার শ্রীমতী সোফিয়া মিশানভ-এর সাহায্যে।

এই ভাবে খাওয়া শেষ হতে হতে প্রায় রাত্রি দশটা বাজে বাজে।

হঠাৎ ডাঃ রায় কমট্রোলার অনিল মুখার্জিকে বললেন—সবতো খাওয়ালে অনিল এবার আমার পাঠানো স্পেশাল রসগোল্লা ও দইটা আনো।

এরপর রাজভবনের বাবুর্চিরা লাল মিষ্টি দই তো প্লেটে প্লেটে দিয়ে গেল কিন্তু এ রকম ছোট প্লেটে প্রায় ফুটবলের ছোট্ট সংস্করণ অতো বড় বিশাল রসগোল্লা আটবে কেন? তাই অনিলবাবু বুদ্ধি করে রাজভবনের বড় বড় দুটি রুপোর থালায় বিধান

রায়ের স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনা রসগোল্লা দুটি বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের সামনে খেতে দিলেন।

ঐ দুটি ফুটবলের সাইজের রসগোল্লা দেখে এবং ও দুটি কী বস্তু তা না বুঝতে পেরে ক্রুশ্চেভ ও বুলগেনিন ইন্‌টারপ্রেটার সোফিয়া মিশানভের কাছে জানতে চাইলেন জিনিষ দুটি কী।

রাশিয়ান ইনটারপ্রেটারকে ইংরেজীতে ডাঃ রায় বুঝিয়ে দিলেন—দইটা হচ্ছে কলকাতার মিষ্টি দই—পয়োধি—যা কলকাতায় আমরা বাঙালীরা ভীষণ পছন্দ করি আর ঐ দুটো ফুটবলের সাইজের মিষ্টি হচ্ছে আমাদের বাঙালীদের একান্ত প্রিয় খাদ্য কলকাতার বিশ্ব বিখ্যাত রসগোল্লা—সুইটমিটস।

ডাঃ রায়ের কথাগুলি শুনে ডিনার টেবিলে রাজ্যপাল হরেন মুখার্জি ও স্ত্রী বঙ্গবালা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন আর ঐ দিকে কমট্রোলার অনিল বাবু তাঁর অধস্তন বাবুর্চিদের নিয়ে ছুরি ও চামচ দিয়ে রসগোল্লা দুটি খণ্ড খণ্ড করে কেটে অতিথিদের পাতে দিতে লাগলেন। পরে অবশ্য ছোট সাইজের কে সি দাসের স্পঞ্জ রসগোল্লাও দু' একটা করে সকলের পাতে দেওয়া হল।

রাশিয়ান নেতৃদ্বয়ের মধ্যে সদা সপ্রতিভও প্রগলভ ক্রুশ্চেভ তো ডাঃ রায়কে সেখানে বলেই বসলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে এই রকম বোমা মার্কা কলকাতার রসগোল্লা দু' চারটে তাঁর দেশে নিয়ে যাবেন। তাঁদের দেশের জনগণকে দেখাবার জন্য।

এই কথা শুনে খাবার টেবিলে সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো। বাবুর্চিরাও মুখ আড়াল করে প্যান্ট্রীর মধ্যে ঢুকে হো হো করে হাসতে লাগলো।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের মতো অতো বড় প্রতিভাশালী কিন্তু আপাতঃ গম্ভীর প্রকৃতির ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবনের কয়েকটি কোমল সংবেদনশীল খুঁটিনাটি ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে যাচ্ছে।

রাজভবনের জীবনের সঙ্গে যদিও এগুলির কোনো যোগাযোগ নেই তবু মানুষ বিধানচন্দ্র কেমন ছিলেন আপামর জনসাধারণের কাছে যাঁকে কিছুটা দাম্ভিক বলেই মনে হত, কিন্তু তাঁর হৃদয়েরও যে একটা দিকে কতো করুণা ও মমতা মাখানো ছিল বা তিনি নিজের বাংলাদেশকে ও বাঙালীকে কতোটা ভালবাসেন তার প্রমাণ এতে মেলে।

ঘটনাগুলি এখানে আরও সন্নিবেশিত করছি এই জন্যে যে ডাঃ রায়ের তৎক্ষণিক প্রতিভা কতোটা উঁচুদরের ছিল তাই জানাবার জন্য।

একবার যতদূর মনে পড়ে উনিশশো আটান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে বিধানচন্দ্র তাঁদের একবার পাটনার পৈত্রিক বাড়ীতে কী একটা তখনকার বিহার গভর্মেণ্টের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন সারা ভারতবর্ষের একডাকে চেনা স্বনামধন্য ডাক্তার তা ছাড়াও একসঙ্গে পশ্চিম বাংলার প্রতাপান্বিত মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি সেদিন সেই তাঁদের পাটনার পুরানো বাড়ীর কোন একটা ছোট্ট কুঠুরিতে

তাঁর বহুদিনের পরোলোকগতা মা অঘোরকামিনী দেবীর একটি পুরাতন শাড়ী সুন্দর ভাবে পাটকরা অবস্থায় একটি পুরাতন তোরঙ্গের মধ্যে দেখতে পান।

সেই শাড়ীটি হাতে নিয়ে তখনকার সত্তোরধর্ব বিধানচন্দ্র মা'র স্মৃতিতে সেখানে ঝরঝর ধারে সকলের সামনেই কেঁদে ফেলেন, এটা তখনকার কাগজে কাগজে বেরিয়েছিল।

আর একবার উনিশশো চুয়ান্ন সালের বাইশে জুন এর ঘটনা তখনকার রাজ্যপাল ছিলেন শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখার্জি। ডাঃ রায় তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উপমন্ত্রী সরোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন থাকেন রাজভবনের উত্তর-পূর্ব দিকের মন্ত্রীনিবাসের দোতালায়।

একদিন সন্ধ্যায় সরোজিৎ বাবু দোতালায় তাঁর ড্রইংরুমে বসে কৃষ্ণনগরের তাঁর কনস্টিটিউসন্সির জন কয়েক কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে গল্প করছেন, হঠাৎ সোফার উপরে ঘরের ইলেকট্রিক লাইটের একটা শেড তাঁর মাথার ওপর খুলে পড়লো। তিনি মাথায় খুব আঘাত পেলেন।

খোদ রাজভবনের তখনকার ডাঃ মুখার্জি তাড়াঘড়ি এসে তাঁর মাথার কাটা জায়গায় দুটো স্টিচ্ করে দিলেন। এবং ডাঃ রায়কে তখনই ফোনে এই খবর পাঠানো হলো।

ডাঃ রায় তো সরোজিৎ বাবুকে দেখতে এসেই সংশ্লিষ্ট রাজভবনের ইলেকট্রিক ইন্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠালেন।

কিন্তু ইলেকট্রিক ইনজিনিয়ার মিঃ ঘোষ ডাঃ রায়ের নামে ভয় পেয়ে তাঁর সাবর্ডিনেট মিঃ জওহরলাল ব্যানার্জিকে সিচিউয়েশন সামাল দিতে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীজওহরলাল ব্যানার্জিও ভয়ে ভয়ে মন্ত্রীনিবাসে এসে ডাঃ রায়ের সামনে হাজির হতেই ডাঃ রায় ক্ষেপে উঠলেন—কী হে তোমরা করো কী? মানুষজন তোমাদের হাতে খুন হবে নাকি? লাইট, ফ্যান, শেড, এগুলি ঠিক ঠিক মতো চেক্ করো না? রাজভবনের কোয়ার্টারে থেকে কাজ করছো, রাজ্যপালের খাশ লোক তোমরা দায়িত্ব তো একটু বেশী পড়বেই তোমাদের। তা কাজে এ রকম গাফিলতি কেন হয়? ইত্যাদি।

জওহরলাল ব্যানার্জি তখন হাত কচলিয়ে আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ স্যার আমরা সব কিছু চেক করি রেগুলার। তবে বোধহয় তখন কোনো পাখী টাখী শেড্-এর উপর এসে বসেছিল তাই ওটা খুলে পড়ে গেছে।

আপাত গম্ভীর ডাঃ রায় তার কথাগুলি শুনে হেসেই ফেললেন—ঘরের মধ্যে পাখী ঢুকেছে, তাও আবার সন্ধ্যের সময় লোকজন যখন আমার মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলছে। কী যে বল? ভেবে দেখো না একবার। যাও-যাও। নেহাৎ আমার মিনিষ্টার অল্পে বেঁচে গেছে। না হলে তোমাদের খোদ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার কাছেই আমি আমার মিনিষ্টারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করতাম।

আর একবারের ঘটনা। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কী যেন

কোন কাজে—সি-এম-পি-ও না সি-এম-ডি-এ ? —এর কলকাতা নগরীতে পত্তনের ব্যাপারে আমেরিকা গেছেন কিছু এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ-এর সংগে কথাবার্তা বলতে···

ডাঃ রায়ের কিন্তু বরাবরের অভ্যেস রাত্রি বেলায় সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়া। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার ব্যাপার আলাদা। তারা রাত ৮-৩০ আগে তো ডিনারের টেবিলে বসবেই না কেউ এবং ডিনার শেষ হতে হতে সেই অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত গড়াবে।

সেই ট্যুরে আমেরিকার বহু গণ্যমান্য লোক ডাঃ রায়কে রাত্রের ডিনারে নেমন্তন্ন করতে আসতেন। তিনি নানা রকম অজুহাতে সবাইকেই প্রায় নিরাশ করতেন কিন্তু কেবলমাত্র একজন খুব নামজাদা নিউইয়র্কের প্রধান পরিকল্পনাবিদ কর্ণেল বিংগহাম কে কিছুতেই কব্জা করতে পারছেন না।

রোজই ডাঃ রায়ের হোটেলে এসে কর্ণেল বিংগহামের আবদার আমি ডিনারে ডাঃ রায়কে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবোই। ডাঃ রায়ও নাছোড়বান্দা। এটা ওটা অজুহাত দিয়ে ডিনারে যাচ্ছেন না।

শেষে কর্ণেল বিংগহাম একটা চাল চাললেন।

তিনি ডাঃ রায়কে বললেন বেশ আপনাকে আমার বাড়ীতে রাত্রের ডিনারে যেতে হবে না, তবে আপনাকে আমার বাড়ীতে একবার নিয়ে যাবোই এবং সেটা আজই এক্ষুণি সন্ধ্যের সময়।

সেখানে কেবলমাত্র ড্রিংকসের পার্টীতে আপনাকে আমি আমার স্পেশাল উদ্ভাবিত রেসীপি দিয়ে সামান্য কিছু সফট্ ড্রিংকস অফার করবো। এবং তাড়াতাড়ি আপনাকে ছেড়ে দেবো কারণ আমি গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি আপনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েন। এতে তো রাজি আছেন আপনি ?

আর আপনাকে এও জানিয়ে রাখি যে সফট্ ড্রিংকসের বিভিন্ন রেসীপিতে ও পানচিং-এ আমি ওয়ার্লডএ তিন তিন বার শ্রেষ্ঠ বিশ্ব বিজয়ীর সম্মান পেয়েছি। এটা যদিও আপনার অবগতির জন্য জানালাম।

ডাঃ রায়তো মহা অসুবিধেয় পড়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেণ্টের যে দু' চারজন বাঙালী অফিসার এসেছেন তারাও এর কিছু সুরাহা বাতলাতে পারছেন না। কি করা যায়।

তখন ডাঃ রায় নিজেই কর্ণেল বিংগহামকে বললেন—সত্যি বিশ্বে আপনি তিন তিনবার সফট্ ড্রিংকস-এর রেসীপির ভ্যারাইটি পানচিং-এ ফার্ষ্ট হয়েছেন। তাহলে আমাকে আপনার ওখানে একবার যেতেই হচ্ছে। যে তার আগে জানতে হবে আমাকে আমার এই প্রিয় সফট্ ড্রিংকসটা আপনার পার্টীতে আপনি খাওয়াতে পারবেন কি না। যদি পারেন তবেই আমি ওখানে যাবো, নচেৎ নয়।

কর্ণেল বিংগহাম তো হাতে স্বর্গ পেলেন—কী এমন সফট্ ড্রিংকসের রেসীপি ডাঃ রায় জিজ্ঞেস করবেন যা আমি জানিনা। কর্ণেল বিংগহাম হাসতে হাসতে বললেন,

জিজ্ঞাসা করুন। ডাঃ রায় সঙ্গী সাথীদের সামনেই মুখ অতি গম্ভীর করে বলে বসলেন Aqua gangetica.

কর্ণেল বিংগহামের চক্ষু তো স্থির এই নাম শুনে।

তিনি কিছুক্ষণ কিছু বলতেই পারলেন না—চুপ করে থাকলেন। পরে অনেক আকাশ পাতাল চিন্তা করে এ কিংভূতকিমাকার রেসীপির সঠিক সন্ধান না ঠিক করতে পেরে উত্তরে বললেন—দুঃখিত ডাঃ রায়, আর আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলাম না। এই সফট্ ড্রিংকসের রেসীপি আমি কোথাও শুনিনি বা পাইনি। আমি আপনার কাছে হার মানলাম।

এদিকে ডাঃ রায়ের সঙ্গের দলবল একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধিতে একেবারে নিঃশ্চুপ হয়ে গেছে—মা গঙ্গার জলের এতো দাপট।

আর একবারের ঘটনা। সালটা হবে বোধহয় ১৯৬১ সাল। তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তখন প্রত্যহ নিজের ১নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়িতে সকালে রাইটার্স-বিল্ডিং-এ যাবার আগে প্রত্যহ দশটি করে রুগী বিনা পয়সায় দেখেন ও তার ওষুধ পত্রের প্রেসক্রিপসন নিজে হাতে লিখে দেন।

সেদিনও সেই রকম হয়েছে। তিনি রুগীটুগী দেখে নিজের গাড়িতে বাড়ির দক্ষিণের রাস্তার গেট দিয়ে যেমনি বার হবেন দেখেন তাঁর বাড়ির গেটের সামনে একজন অতি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা গাড়ির ঠিক সামনে এসে হাত জোড় করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ডাঃ রায়ের বডি গার্ড তো গাড়ি থেকে তড়িঘড়ি নেমেই বৃদ্ধার হাত ধরে ফেলেছেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধা কিছুতেই গাড়ির সামনে থেকে সরতে চান না, তিনি মুখে বলেই চলেছেন—রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমাকে কেউ ঢুকতে দেয় না ; আমি বৃদ্ধা দুঃখী মানুষ। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে আমাদের মতো দুঃখীদের কথা শুনতেই হবে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরও কানে হয়তো বৃদ্ধার দু' একটা কথা গিয়েছিল। তিনি সটান গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন—বৃদ্ধাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসতে বলো। আমি নিজে কানে শুনবো তাঁর দুঃখের কী কথা আছে।

বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে ডাঃ রায়ের বডি গার্ড তাঁকে ডাঃ রায়ের বাড়ির নিচের তলায় বসবার ঘরে নিয়ে এলো।

অশীতিপর বৃদ্ধা তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করলেন আমি গরীব মানুষ। থাকি বেলেঘাটার খাল ধারে একটা ছোট্ট নিজের বাড়ীতে। পিতৃমাতৃহারা আমার নাতনীটি সুন্দরী ও পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল বলে ঐ পাড়ারই একজন ডাক্তার ছেলে সেধে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু এখন আর আমার নাতনীটি স্বামীর ঘর কিছুতেই করতে পারছে না। ডাঃ ঐ স্বামীটি বেহেড মাতাল হয়ে রাত্রে রোজ বাড়ী ফিরে আমার নাতনীটিকে বেদম প্রহার করে। পাড়ার লোকজন শাসিয়ে ও ভয় দেখিয়েও ডাক্তারকে কিছু করতে পারছে না।…

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ হাঁফ নিয়ে ফের আরম্ভ করলেন—আপনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তা ছাড়া ঐ ডাক্তার নাতজামাইটি আপনারই হেলথ্‌ ডিপার্টমেণ্টে তারকেশ্বরে পোসটেড্‌। এর কিছু সুরাহার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।

ডাঃ রায় কথাগুলি শুনে বৃদ্ধার ও তাঁর নাতজামাইটির নাম ও ঠিকানা একটা কাগজে লিখে নিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন—যান আপনি বাড়ি। আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সবাই না জানলেও ডাঃ রায়ের যাঁরা পয়লা নম্বরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন শ্রীপ্রতাপ মিত্র বলে একজন বেলেঘাটার প্রতাপশালী ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অতি কাছের লোক ছিলেন। তিনি সমস্ত বেলেঘাটা চত্বরে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াবার ক্ষমতা নিজেই রাখতেন।

প্রতাপ মিত্রকে ডেকে সেই দিনই ডাঃ রায় সব ঘটনা তাঁকে বলে, তাঁর কাছে ডাক্তারটির ঠিকানা দিয়ে ডাক্তারকে পরের দিন ডাকিয়ে পাঠালেন।

একে বেলেঘাটা এলাকার দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতাশালী প্রতাপ মিত্র পরের দিন সাত সকালে ডাক্তারের বাড়িতে হাজির তার ওপর আবার ঐ ডাক্তার শুনছেন প্রতাপ মিত্রের মুখে যে ডাঃ বিধান রায় তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শুনে তো সেই ডাক্তারের প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। প্রতাপ মিত্র ডাক্তারকে মৃদু ভাবে বললেন—না, আপনার চাকরী সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নয়। তবে যতদূরে আঁচ করতে পেরেছি, যদিও ডাঃ রায় আমাকে কিছু খোলসা করে বলেন নি, তবে বোধহয় ঘটনাটি আপনার পক্ষে অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। চলুন এক্ষুণি আমার সঙ্গে ডাঃ রায়ই আপনাকেই সব বলবেন।

১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ডাঃ রায়ের ঘরে ঐ ডাক্তারটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতাপ মিত্র যেই ঘরের বার হতে যাবেন ঐ ডাক্তারটি আঁকুপাকুভাবে প্রতাপ মিত্রের হাত চেপে ধরলেন। এদিকে চতুর ডাঃ রায় কিন্তু অলক্ষে তা লক্ষ্য করেছেন। তিনি খুব গম্ভীর মেজাজে ছোকরা ডাক্তারটিকে বললেন—ওহে তুমি কী কলকাতায় ভাল পোষ্টিং চাও তবে কিন্তু তোমার একটি বদদোষ ছাড়তে হবে। বলেই ডাঃ রায় কী যেন একটা কী পড়তে লাগলেন সাদা কাগজের দরখাস্তের মতো। পরে মুখ তুলে বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি রোজ রাত্রে প্রচুর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে বউকে মার ধোর কর। এখন থেকে আর কোনোদিন নিজের বউ-এর গায়ে হাত তুলবে না। যাও, আমি তোমার কলকাতায় ভাল পোষ্টিং এর ব্যবস্থা করে দেবো। তবে যদি কখনও আর তোমার নামে কিছু কমপ্লেন পাই তবে তোমার চাকরী আর এ রাজ্যে তুমি রাখতে পারবে না। অবিশ্যি আমি যদি তখনও তোমাদের এই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকি। যাও নিজের কাজ মন দিয়ে করো। ডাক্তার হয়ে নিজের বউ এর গায়ে হাত তোল বাঙালী হয়ে তোমার লজ্জা করে না।·····

আর একবারের ঘটনা। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কড়া সিকিউরিটির চোখ ফাঁকি দিয়ে গলায় একটা নূতন কাপড়ের কাছা দেওয়া, যেন সদ্য তার পিতা মাতার মধ্যে কেউ

গত হয়েছে, এমনি পরিচ্ছদ পরে বারো তেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলে সটান ডাঃ রায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছে—বাবা মারা গেছে কিছু সাহায্য দিন।

ডাঃ রায় নিজের মুখ্যমন্ত্রীর ফাণ্ড থেকে এরকম কিছু কিছু সাহায্য করতেন—যেমন কোন গরীব ছেলে অন্য প্রদেশে চাকরীর কোন ইণ্টারভিউ পেয়েছে কিন্তু ওখানে যাবার সংস্থান নেই। তাকে রেলের টিকিট কেটে দেওয়া বা কোনো ছেলে কোনো অনার্সের বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের দামী বই কিনতে পারছে না, তাকে বই কেনার টাকা, কেউ বধির তার hear aid যন্ত্র কেনার টাকা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাঃ রায় তৎকালীন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে এই ছেলেটির সদ্যপ্রয়াত বাবার শ্রাদ্ধের জন্য কিছু টাকা দিতে বললেন। পরে ছেলেটিকে বসিয়ে খবর নিয়ে ফোন করে ঐ থানায় জানা গেল যা, তার বাবা মা বহাল তবিয়তেই মানিকতলার বাগমারিতে বাস করছেন, এদিকে কোন ফাঁকে ছেলেটি রাইটার্স থেকে পগারপার। প্রাইভেট সেক্রেটারীর মুখে এ খবর শুনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ডাঃ রায়কে তাঁর অতি আপনজন বা সেক্রেটারিরা এসব ঘটনা বললে, তিনি প্রায়ই হেসে উত্তর দিতেন—ওহে, আমরা হচ্ছি দেশবন্ধুর চেলা। আমাকে তো এখনও এইসব ব্যাপারে তোমরা কেউ বোকা, ইডিয়ট বলো নি, দেশবন্ধুকে তো তাও জীবনে শুনতে হয়েছে—প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত যে খুনী আসামী—মথুর—তাকে তিনি জেলের গেট থেকে লোক দিয়ে নিজের বাড়ীতে চাকরী দিয়ে মমতা ভরে এনে রেখে-ছিলেন। এ ঘটনা দেশবন্ধুর বাড়ীর যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। কিন্তু সেই ডাকাত মথুরই একদিন হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বেলতলার বাড়ির অনেক রুপোর বাসন কোসন নিয়ে বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল।

দেশবন্ধু জীবিত থাকলে তখনও হয়তো তাকেও ক্ষমা করে দিতেন—যদি ডাকাতটাকে সুস্থ মানুষ করা যায়।

আমি আর দেশবাসীর দুঃখের কী আর লাঘব করলাম।

* * *

যাইহোক ওসব কথা থাক। আবার নিজের প্রসংঙ্গে ফিরে আসি—কলকাতার রাজভবনে রাশিয়ান ভি-আই-পি।

তার পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৫ যেদিন রাশিয়ান ভি-আই-পি-রা কলকাতা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন সেদিন সকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভকে নিয়ে তখনকার সদ্য নির্মিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং দেখাতে নিয়ে যান।

এটা তো কলকাতা রাজভবনের পশ্চিমে কয়েক শ গজ দূরেই। কিন্তু এটা পরিদর্শন করতে করতে বাক্যবাগীশ ক্রুশ্চেভ ফস্ করে বলে বসলেন—ডাঃ রায় আপনারা এটা তৈরী করে এতোটা খাঁটী ষ্টীল বাজে খরচ করে ফেলেছেন। যদিও আমাদের কাছে খবর আছে—India is floating on coal and iron—তবু এই এটোমিক যুগে এতো উঁচু বাড়ী তৈরী করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাছাড়া

আপনাদের নূতন দেশ গড়তে হবে ভাল ষ্টীলেরও তো অনেক প্রয়োজন পড়বে। ইত্যাদি।

ক্রুশ্চেভের এই কাটাকাটা কথাগুলি শুনে ডাঃ রায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। উত্তরে তাৎক্ষণিক কিছু আর বলতে পারলেন না—এঁরা যে আমাদের সম্মানীয় অতিথি।

রাশিয়ান দলের মধ্যে ক্রুশ্চেভই অত্যন্ত চাঁচাছোলা কথা বলতে ও সর্বদা ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখাতে সদা উদগ্রীব ছিলেন।

হলো কী সেই সময়ে ঐ নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ কলকাতার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক হঠাৎ পকেটের পেন সুদ্ধ তার অটোগ্রাফের খাতাটি ক্রুশ্চেভের দিকে এগিয়ে দিলেন।

হাঁ হতোস্মি। পেনটি নিয়ে অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে ক্রুশ্চেভ দেখেন পেন দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। আর যায় কোথায়। ক্রুশ্চেভ তৎক্ষণাৎ সাংবাদিকটিকে ঠাট্টা করে হেসে বললেন—এটা বোধহয় এ্যামেরিকান মেড। না হলে সময় মতো কালি বেরুচ্ছে না কেন?

ক্রুশ্চেভের কথাগুলি শুনে সবাই হেসে উঠলেন।

ঐ দিনই ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৫ রাশিয়ান গেষ্টরা সকালের কিছুটা পরে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন।

আমি আমার লেখার মধ্যে অনেক জায়গায় একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে এই রাজভবনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সরগরম করে সেই সব রাজ্যপালের নাম যাঁর সময়ে এই লাটবাড়িতে যত বেশী ও যত্তো প্রধানতম ব্যক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর high dignitaries গণ এখানে আসেন।

কথাটা হয়তো ঠিক করে বলা হলো না। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে এই রাজভবনে যত্তো খাস কর্মচারী আছে স্বয়ং রাজ্যপালের ষ্টেটে তাদের মধ্যে আলোচনা চলে সদ্য প্রত্যাগত কোনো High V-I-P এর আগমন ও রাজভবনের অবস্থানের টুকিটাকি বা ঘটনা নিয়ে। লাটের প্রসংগও সেই সময়ে ওঠে। অমুক লাটের সময় অমুক অমুক V-I-P এসেছেন ইত্যাদি।

আর এই রাজভবনের ছোট থেকে তাবৎ বড় বড় সব কর্মচারীরাও নিজেদেরকে অত্যন্ত গর্বিত বা ভাগ্যবান মনে করেন যখন পৃথিবীর কোনো বড় রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান প্রকাশ্যে এই রাজভবনের আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। রাজভবনের কর্মচারীদের অন্তত যারা এই ডালহৌসী স্কোয়ারের চত্বরে রাজ্যপাল ষ্টেটের কোয়ার্টারে থাকেন তাদের মধ্যে কিন্তু এই ভাব অত্যন্ত প্রকট।

অন্য অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক দলাদলি মত পার্থক্য, বা প্রভেদ আছে, কিন্তু কোনো গেস্ট বা অতিথি এলে রাজভবনে তারা সবাই মিলে অন্ততঃ চেষ্টা করেন সেই মাননীয় অতিথির সমাদর করতে এবং বিদেশীদের কাছে ভারতের তথা বাংলার আতিথেয়তার সুনাম রক্ষা করতে।

রাজ্যপাল ডায়াসের আমলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও ধূমকেতুর মতো হঠাৎ কলকাতা রাজভবনে তৎকালীন রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদগরনীর আসবার কথাই বেশী করে মনে পড়ে।

সেদিন ছিল জুন মাসের বোধহয় দশ বা বারো তারিখ উনিশশো বাহাত্তর সাল।

খবরের কাগজে সংবাদ বেরিয়েছিল যে রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদগরনী ভারত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয় সফরে যাবেন। সংবাদে আরও বলা হয়েছিল এই সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদগরনি দিল্লীতে নামবেন না, কেবলমাত্র একঘণ্টা বিশ্রাম ও লাঞ্চয়ের জন্য কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে থাকবেন ও পরে ওখান থেকেই হ্যানয় রওনা হবেন।

কথা ছিল দিল্লী থেকে তৎকালীন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিং, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতিনির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধর ও কলকাতা থেকে রাজ্যপাল ডায়াস, শ্রীমতী ডায়াস ও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় দমদমে পদগরনীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। কথামত কাজও হয়েছিল।

স্বর্ণ সিং ও ডি পি ধর দিল্লী থেকে ঘণ্টা খানেক আগে অর্থাৎ বারোটা নাগাদ দমদমে এসে পেঁৗছিয়েছিলেন। রাজ্যপাল ডায়াস শ্রীমতী ডায়াস ও সিদ্ধার্থ শংকর রায় ফুলের তোড়া মালা ইত্যাদি নিয়ে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় দমদম বিমান বন্দরে হাজির হলেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদগরনীর প্লেনও ঠিক বেলা একটা নাগাঁদ দলবল নিয়ে দমদমে থামলো। সব যথারীতি ঠিকঠাক। লাঞ্চয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

হঠাৎ মিনিট দশেকের মধ্যে অর্ডার হলো, না রাশিয়ান প্রেসিডেণ্ট পদগরনী আজ এক্ষুনি ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয় রওনা হচ্ছেন না। তিনি আজ রাত্রের মতো অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টার মতো পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডায়াসের অতিথি হচ্ছেন কলকাতা রাজভবনে।……

হৈ হৈ ব্যাপার। কলকাতার রাজভবনের পি-বি-একস-এ তক্ষুনি টেলিফোনে খবর চলে গেল। কলকাতার রাজভবনে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাজভবনের বিখ্যাত বিখ্যাত সুইটে সাজানো হতে লাগলো। বিছানা পত্তর চাদর বালিশ সব নয়া নয়া দেওয়া হল।

প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইট, এ্যানডারসন স্যুইট, ডাফরিন স্যুইট, কার্জন স্যুইটের ভারী ভারী এয়ারকনডিশন মেশিন জোরে চালু করে দেওয়া হলো— যাতে এই ভি-আই-পি গেষ্টরা ঘরে ঢুকেই জুন মাসের এই দারুণ খরায় কলকাতার শীতের আমেজ উপভোগ করতে পারেন।

বাবুর্চি, বেয়ারা, খানসামা, লিনেন বয়, চাপীওয়াল, প্যাণ্ট্রী ম্যান, মায় সেক্রেটারী ডেপুটীরাও রাজভবনের এদিক ওদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলেন,—প্যাণ্ট্রীতে

গেলেন, ব্যানকোয়েট রুমে গেলেন, বলরুমে গেলেন, সব ঠিকঠাক করে রাখবার জন্য কখন কোনটার প্রয়োজন হয়।

প্যান্ট্রীতে গরম জল ফুটতে লাগলো, ফোনে অর্ডার হয়ে গেল কোকোকোলার গাড়ি আনবার জন্য, রান্নাও হলো সঙ্গে সঙ্গে।

এদিকে দেখ দেখ করতে করতে জনা চল্লিশ গেস্ট নিয়ে প্রায় পনেরো ষোলোখানা মোটর গাড়ী রাজভবনের নর্থ মেন গেট দিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করলো। তাজ্জব ব্যাপার এর মধ্যেই রাস্তার দুধারে রাজভবনের সামনে কিছু অফিস ফেরৎ লোক দাঁড়িয়ে গেছে—হাওয়ায় বোধহয় শুনেছে রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদগরনি নাকি হঠাৎ তাঁর ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয় যাবার পথে সাময়িক যাত্রা স্থগিত করে কলকাতার রাজভবনে আসছেন।

কী করে যে কোথা থেকে এই রাজভবনের সামনের অফিস ফেরৎ পথচারীরা এই সব অতি গোপনীয় খবর পূর্ব থেকেই পেয়ে যান তা স্বয়ং লাটসাহেবও অনেক অনুসন্ধান করে কোনো হদিশ করতে পারেন নি।

সব সময়েই দেখা যায় যখনই কলকাতা রাজভবনের ভেতর কোনো নামজাদা ভি-আই-পি আসেন তখনই রাজভবনের নর্থ মেন গেটের সামনে কিছু কিছু লোক দক্ষিণ মুখো হয়ে রাজভবনের মেন বিল্ডিং-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তখন যে খোদ রাজভবনে কোন ভি-আই-পি রয়েছে বা এসেছে তা খবরের কাগজের অফিস থেকে ফোন করে রাজভবন P B X থেকে জানানো হয় না।

এই রকম দৃশ্যের অবতারণা অনেকবার দেখেছি এবং রাজভবনের বড় থেকে ছোট সব কর্মচারীরাই অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে—এ কেমন ভাবে হয়? তাদের মধ্যে অনেক আবার এ ওর নামে দোষারোপ করেছে রাজভবনের গুপ্ত খবর বাইরে পাচার করবার অপরাধে।

পাকিস্তানের সঙ্গে উনিশশো পয়ষট্টি সালের ভারতের যুদ্ধের সময় অনেকবার দেখা গেছে হয়তো গোপনে জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার সঙ্গে কোন জরুরী বিষয়ে শলাপরামর্শ করতে এসেছেন তখনও কিন্তু রাজভবনের মেন নর্থ গেটে লোকের পর লোকের ভীড় জমে গেছে।

১৯৬৭ সালে ও ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জি অতি গোপনে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের বিষয়ে সলা পরামর্শের জন্য অধিক রাত্রে রাজ্যপাল ধর্মভীরা বা রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এলেও বেশ কিছু সংখ্যক অজানা লোক ঠিক দক্ষিণ মুখো হয়ে রাজভবনের মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এও বেশ কয়েকবার দেখেছি নিজের চক্ষে।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখেছি একুশে নভেম্বর উনিশশো সাতষট্টী সালে অধিক রাত্রিতে চুপিচুপি রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম দিকের মন্ত্রিনিবাস থেকে অতি গোপনে শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মশায়কে ডেকে রাজ্যপাল ধর্মভীরা রাজভবনের থ্রোনরুমে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন, রাজ্যের সাধারণ লোকজন তখনও বিন্দুবিসর্গ জানে না

পশ্চিমবাংলার জীবনে কী ঘটে যাচ্ছে, তবু আশ্চর্য্য তখনও বেশ কিছু লোক কেন, জানিনা কোথা থেকে গোপনে আগে আগে খবর পেয়ে ঐ রাত্রিতেই মেন গেটের সামনে জড়ো হয়েছে।

বাংলার লাটবাড়ির ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়, এ সব ঘটনাও তেমনি বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা যায় না।

হ্যাঁ, আগে যা বলছিলাম। জনা চল্লিশ গেষ্ট নিয়ে রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদগরণি রাজভবনে মেন নর্থ গেট দিয়ে প্রবেশ করলেন।

রাজ্যপাল ডায়াস তাঁকে ও অন্যান্যদের নিয়ে রাজভবনের নর্থ ওয়েষ্ট ভি-আই-পি লিফট-এর দিকে এগিয়ে গেলেন।

লিফটে উঠলেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট মিঃ পদগরণি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্ণ সিং, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতিনির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধর, রাজ্যপাল ডায়াস, শ্রীমতী ডায়াস, ও বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়।

রাজভবনের উর্দ্দিপরা লিফট ম্যানকে লিফটের বাহিরে থাকতে বলা হল। অটোমেটিক লিফট। সুইচ টিপতেই লিফট চলতে লাগলো। একটু উঠল। আবার থামল। আবার উঠল। আবার থামল। ব্যাস্। তারপর লিফট তরতর্ করে নেমে এলো ভারের বোঝায়।

যেখানে লিফট-এর উপর স্পষ্ট করে লেখা আছে To carry 1200 pounds, সেখানে রাশিয়ার দৈহিক বলশালী ভারী প্রেসিডেন্ট পদগরণি, স্বর্ণ সিং, ডি-পি ধর এদেরকে নিয়ে বারো শ পাউণ্ডের অনেক বেশী নিশ্চয়ই লিফট-এ ভার হয়ে গিয়েছিল। লিফটের আর দোষ কী।

আটোমেটিক লিফট সুতরাং দরজা বন্ধ। দরজা খুলে লিফটের বাইরে আসতে রাজ্যপাল ডায়াস ইত্যাদির বেশ কিছুটা সময় লাগলো।

আর যায় কোথায় লিফট থেকে বেড়িয়েই রাজ্যপাল ডায়াস তো রেগে আগুন ফ্লোরে দণ্ডায়মান লিফটম্যানকে অনর্গল বকাবকি আরম্ভ করেছেন—এই তো সেদিন ইন্দিরাজীর সময় তোমাদের লিফট একবার এই রকম হল, আজও তাই অবস্থা। ডাকো তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ার মিঃ সরকারকে। উনি কি বলেন।

কিন্তু দু' জন দাঁড়িয়ে তখন অবাক হয়ে শুনলাম ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্ণ সিং-এর হাস্য উজ্জ্বল মুখের ভাষা—This is nothing but mechanical defects. কথাগুলি বলতে বলতেই তিনি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পদগরণি রাজ্যপাল ডায়াস এদেরকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হাসতে হাসতে দোতালায় নির্দিষ্ট প্রিন্স অব ওয়েলস স্যুইটে নিয়ে গেলেন।

এদিকে অফিসের মধ্যে ভীষণ ভাবে টেবিল চাপড়ানো হতে লাগলো—কেন উজবুক লিফট ম্যান অলোক রাউথ রাজ্যপাল এদেরকে একসঙ্গে লিফটে না উঠবার জন্য বারণ করে নি।

হ্যাঁ কপাল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কার কথা কে শোনে। সামান্য অফিসের ফাইলের কাজেই একে অন্যকে তোয়াক্কা করে না। আর এখানে একজন সামান্য লিফটম্যান স্বয়ং রাজ্যপাল বা তাঁর সমকক্ষ কাউকে পূর্বাহ্নে সাহস করে কী কখনও লিফটে উঠতে বারণ করতে পারে, না সে রকম সাহস থাকা চাকরী জীবনে এ যুগে সম্ভব।

সে যাই হোক লিফটম্যান অশোক রাউথকে এ ব্যাপারে অনেকেই অযথা দোষারোপ করতে লাগলো।

একটি জিনিস আমি কলকাতা রাজভবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বিজরিত জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে যখনই কোনো রকম বড় রকমের গণ্ডগোল রাজভবনের কোথায় হয় তখন সব দোষটা গিয়ে কিন্তু পড়ে রাজভবনের বেয়ারা, চাপরাশী, লিফটম্যান, প্যাম্পম্যান, খিদমৎগার বা ঝাড়ুদারদের উপর।

কখনও লাটসাহেবের কাছে ভুলেও হাজার দু'হাজারী মাইনের সেক্রেটারী বা ডেপুটীরা তাঁদের অধস্তন চাকর বেয়ারাদের দোষগুণ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেন না। উল্টো পান থেকে চুন খসলেই বড় বড় শোকজ নোটিশ, সাসপেনসান, ডিসচার্জ ইত্যাদির জারী করা হয় এই সব অধস্তন কর্মচারীদের ওপর।

কিন্তু বৃটিশ জমানায় ছোটরা কিছু দোষ বা গল্তি করলে বৃটীশ লাটসাহেবের তখনকার লালমুখো ডেপুটী সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী ইত্যাদিরা হয়ত বেয়ারা বাবুর্চি, লিফ্টম্যানদের বকতেন, বা হয়তো কখন সখনও ফাইনও করতেন কিন্তু পরক্ষণেই সেই ফাইনও মাপ করে দিতেন কিন্তু কখনও এখনকার অফিসারদের মতো নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতেন না। বরং তাঁরা খোদ লাট সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলতেন আমার দোষেই ঐ জিনিষটা হয়ে গেছে। আমিই দোষী। ও আমার সাবর্ডিনেট। আমারই ঐ জিনিষটা ভাল ভাবে আগে দেখা উচিৎ ছিল। ইত্যাদি।

এখন আমাদের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিং এর সম্বন্ধে দু' চারটি কথায় আসি। স্বর্ণ সিং বোধহয় কলকাতার রাজভবনে বেশীবার আসেন নি, এলেও আমি তাঁকে এই রাজভবনে বেশীবার দেখিনি, হয়তো এমনও হতে পারে অফিসের কাজের চাপে তিনি হয়তো আমার চোখের থেকে এসকেপ করে গেছেন। সে যাই হোক যে দু' একবার আমি তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি তখন সব সময়ই দেখেছি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুপ্রসন্ন মুখ আন্তরিকতায় ভরা। হয়তো এই জন্যই দীর্ঘদিন তিনি আমাদের দেশের কেন্দ্রের মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করতে পেরেছিলেন।

পদগরণির লিফটের ক্ষেত্রে তিনি যে উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে অন্যান্যদের মতো হৈ চৈ না করে, সহাস্যে লিফট থেকে বেড়িয়ে এসে কেবলমাত্র—This is nothing but mechanical defects—এই বলে রাশিয়ান প্রেসিডেণ্টকে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে রাজভবনের দোতালায় প্রিন্স অব ওয়েলস সুইটে বিশ্রামের জন্য নিয়ে গেলেন—এটা তাঁর পক্ষে কম ধৈর্য বা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।···

তবে এর পর যতক্ষণ পদগরণি বা তাঁর রাশিয়ান দলবল এই কলকাতার রাজভবনে ছিলেন অর্থাৎ তার পরের দিন ভোর চারটে পর্যন্ত তাঁরা আর কোনো সময়ে রাজভবনের কোনো লিফট ব্যবহার করেন নি—তাঁরা দরকার মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠেছেন, নেমেছেন। আবার ভোরে, সিঁড়ি দিয়েই রওনা হয়ে গেছেন।

এটা রাজভবনের জীবনে বিদেশীর কাছ থেকে পাওয়া কম লজ্জাকর অপমান নয়।

এখন এই সম্মানীয় রাশিয়ান গেস্টদের সম্বন্ধে দু' একটি কৌতুহলোদ্দীপক মজার ঘটনা বলি।

আগেই বলেছি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পদগরণির পার্টীতে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, কুক, বেয়ারা, ডাক্তার, খাস কর্মচারী, ইত্যাদি নিয়ে প্রায় গোটা চল্লিশ জনের মতো অতিথি ছিলেন। একসঙ্গে এতোজন অতিথিকে স্পষ্টভাবে রাজভবনে চটজলদি হঠাৎ স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কিছু অতিথিকে রাজভবনের পাশে গ্রেট ইর্স্টান হোটেলে চালান করে দেওয়া হয়েছিল।

বাকী যারা রাজভবনে ছিলেন তাদেরকে এক এক ঘরে চারজন করে মেঝেতে স্প্রিং ম্যাট্রেস্ বিছিয়ে ও খাটে বিছানা করে শুতে দেওয়া হল।

অবশ্য প্রেসিডেন্ট পদগরনির কথা স্বতন্ত্র। তাঁকে একাই রাজভবনের সবচেয়ে সম্মানীয় সুন্দর স্যুইট প্রিন্স অব ওয়েলসে বন্দোবস্ত করা হল।

অন্যেরা কেউ কেউ রইলেন রাজভবনের তিন তলার উত্তর পশ্চিম কোণে ডাফরিন স্যুইটে বা কেউ কেউ রাজভবনের তিনতলায় উত্তর পূর্বের ওয়েলেসলী স্যুইটে। কতজন আবার সেকেন্ড ক্লাস গেস্ট রুম অর্থাৎ কিনা রাজভবনের একতলার দক্ষিণ পশ্চিমদিকের ঘরগুলিতে।

আগেই বলেছি যে তখন কলকাতা তথা ভারতের উপর দিয়ে অভূতপূর্ব ভীষণ খরা বা একটা 'হট স্পেল' বয়ে চলেছিল। জুন মাসের দশ, বারো তারিখ। ভীষণ কাট ফাটা গরম কলকাতায়। রাশিয়ান গেস্টরা রাজভবনের ঘরে ঘরে ছোট ছোট সাদা ছোট্ট প্যান্ট বা শর্টস পরে খাটসুদ্ধ তাদের মাথাগুলি এয়ার কন্ডিসনারের একদম কাছে তা প্রায় মধ্যে ঢুকিয়ে ঐ গরমে হাসফাঁস করছে।

ইতিমধ্যে আবার হলো কী একটা তিন টনের এয়ার কন্ডিসনার মেসিন হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। আর যায় কি। রাশিয়ান পার্টীর লোকজন দৌড়ে গিয়ে হাত পা নেড়ে রাজভবনের যাকে পায় তাকেই বোঝাতে চেষ্টা করে ঠাণ্ডা মেসিন খারাপ হয়ে গেছে—এক্ষুণি ঠিক করে দাও—গরমে মরে গেলাম ইত্যাদি।

এরা প্রায়ই ইংরেজি একদম জানে না। হাত, পা, মুখের সে কী ভঙ্গি। একজন রাজভবনের কর্মচারী অনেক কষ্টে ব্যাপারটা স্বয়ং বুঝে চটপট করে সেই দিনের স্ট্যান্ড বাই একজন ইলেকট্রিসিয়ানকে ডেকে তক্ষুণি আবার এয়ারকন্ডিসনার চালু করে দিলেন ফুল ফোর্সে।

গেস্টরা-ত খুব খুশী। এর চেয়ে আরও একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার ঘটলো এর কিছুক্ষণ পর।

এই পার্টীর একজন রাশিয়ান মেয়ে, সম্ভবত রাশিয়ান টাইপিস্ট—সে একাই এলো দোতলায় রাজভবনের প্যানট্রীখানায় কিছু চট জলদি খাবারের বন্দোবস্তের জন্য। সঙ্গে দোভাষী নেই। রাজভবনের পানট্রীতে এদিকে ঝানু ঝানু বাবুর্চিরাই এই ভদ্রমহিলার কথা বা ভাষা কিছুই বুঝতে পারছে না।

কেউ তাকে আস্ত কতকগুলি পেঁয়াজ এনে দেখায়, কেউ দেখায় আস্ত বড় বড় গোল আলু, কেউ আবার সব বুঝে ফেলেছির ভান করে ঝুড়ি ভর্তি আস্ত লাল টমেটো এনে দেখায়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আসল কি জিনিষ চাইছে তা কেউ ধরতে পারছে না।

প্রায় ছ' ফুট লম্বা সেই সুন্দরী তন্বী রাশিয়ান মহিলাও প্রায় গলদ ঘর্ম এ ব্যাপারে। কিন্তু মুখে কোনো রকম বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে তিনি কেবলমাত্র তার ডান হাতটির মুঠোটাকে গোল রসগোল্লার আকারের মতো করে দেখিয়েই চলেছেন।

অবস্থা যখন এই তখন রাজভবনের হেড বাবুর্চি হিমাংশু বড়ুয়া, যার নাকি এই রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মাঝে মাঝেই পড়তে হয় এখানে, তিনি বিজ্ঞের মতো একগাল হেসে অধস্তন তার সব ষ্টাফকে একধারে সরিয়ে দিয়ে তিনি স্বয়ং প্যাণ্ট্রী থেকে রসগোল্লার বিরাট প্যানটা ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে দিলেন।

রাশিয়ান ভদ্রমহিলা বোধহয় তখন তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁছিছিলেন। তিনি আর থাকতে না পেরে হঠাৎ তাঁর ডান হাত নামিয়ে মুখ দিয়ে কক্কর কোঁ—কক্কর কোঁ—কক্কর কোঁ—করে বার কয়েক মুরগীর ডাক ডেকে উঠলেন।

তখন সব বাবুর্চিরা পড়ি কী মরি করে প্যানট্রী থেকে মুরগীর ডিমের বড় বাসকেটটা তার সামনে ধরলেন আর ঐ রাশিয়ান ভদ্রমহিলা ডিম দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে বেশ কয়েকটা বড় সাইজের ডিম নিয়ে নিজের স্যুইটের দিকে তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন।

এই ঘটনা দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় ভাষাবিদ শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কথা। মনে মনেই ঠিক করে রেখেছিলুম যে তাঁকে একদিন তাঁর বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ীতে গিয়ে জানিয়ে আসব আধুনিক ভাষাতত্ত্বের হিসাব নিকেশ ছেড়ে উনি যেন একটু কষ্ট করে জীব জগতের কণ্ঠের আওয়াজের সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রাগৈতিহাসিক গাটছড়াটা একবার বিশ্লেষণ করে দেখেন।

কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। আমি রাজভবনের চাকরী থেকে রিটায়ার করবার বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি এ জগৎ থেকে রিটায়ার করে পরপারের পথে পাড়ি দিয়ে দিলেন।

বৃটিশ ও দেশী লাটের দাপট ও কলকাতার রাজভবন

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আজ প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল। এখন লাট বা রাজ্যপালের কথা প্রায় কেউ-ই কানে তুলেও তোলে না।

রাজভবনের চাকর, চাপরাশী, বেয়ারা বাবুর্চি, খিদমৎগার, চাঁদিওয়ালা, ড্রাইভার, পিওন—এরা সবাই প্রায় জেনে গেছে—গোপনে গোপনে—যে নয়া ভারতীয় জমানায় লাটসাহেবদের সেই পরাধীন ভারতের বৃটীশ আমলের মতো প্রতাপ প্রতিপত্তি এখন আর নেই।

হুকুম করলেই সেই বৃটিশ জমানার লালমুখো লাটদের মতো আজ আর তার কথায় অকথায় রাজভবনের কর্মচারীর ভাই-ভাতিজাদের গভর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে চটজলদি চাকরী জোগাড় হয় না। হয় না পুলিশের খাতায় কোনো নিজের আত্মীয়ের মারাত্মক দোষ ত্রুটি থাকলে খোদ লাটসাহেবের লালমুখো সেক্রেটারীর রাজভবনের এক চিঠিতে সব অপবাদের ধোয়া-মোছা খালাস।

এখন বৃটীশ জমানার সাহেবী লাটদের অপরিসীম ক্ষমতার কয়েকটি ঘটনা বলছি—

সেটা হবে স্বাধীনতা পূর্ব চল্লিশ দশকের প্রথম দিকের কথা। তখনও ভারতের প্রদেশে প্রদেশে বৃটীশ দোর্দণ্ডপ্রতাপ লালমুখো সাহেব গভর্ণর বর্তমান ছিলেন। বাংলার লাট তখন জন হারবার্ট। উনিশশো তেতাল্লিশ সাল।

তখন নিয়ম ছিল যে, যা এখনও স্বাধীনোত্তর যুগে কিছুটা চালু আছে, কলকাতার এই রাজভবনে যেহেতু রাজভবনের প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় কর্মচারীকেই এখানে থাকবার কোয়ার্টার ফ্রী দেওয়া হয়, সুতরাং রবিবার নেই, শনিবার নেই, কোনো নির্দিষ্ট ছুটিছাটার দিন নেই প্রায় সারা বছরের প্রত্যেক দিনই তাদের রাজভবনের অন্দরে কাজে বেরুতে হয় তা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। 'লাটসাহেবের কুঠীর কাজ'—এটা তাদের আদরের সম্ভাষণ।

এখন কথা হলো মানুষ তো আর মেসিন নয়। সুতরাং মাসে দুমাসে কোনো কোনো কর্মচারীর নিজের আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাওয়া, বা রেস কোর্সের মাঠে ধর্না দেওয়া, বা সিনেমা বায়স্কোপ দেখতে যাওয়া বা নিদেনপক্ষে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে চিড়িয়াখানা বা মিউজিয়ামে যাওয়া—এটা তো করতেই হয়।

কিন্তু রাজভবনের উপরওয়ালা ডেপুটী সেক্রেটারী বা সেক্রেটারীর অলিখিত কড়া নির্দেশ আছে যে, যেহেতু কর্মচারীদের এখানে ফ্রী এ্যাকোমোডেশন দেওয়া হয়েছে, সুতরাং খুব জরুরী প্রয়োজন না পড়লে সব সময়েই উপরওয়ালাকে মৌখিক জানিয়ে যেতে হবে তাদের কোয়ার্টার ছেড়ে গতিবিধির সম্ভাব্য অবস্থানের বিষয়।

একদিন হয়েছে কী দুপুর বেলায় রবিবার ছুটির দিনে একজন রেকর্ড কীপার

—ফাইল-পত্তর যিনি রাখেন—তিনি না জানিয়ে দুপুরবেলায় মেট্রো সিনেমায় কী যেন একটা ইংরেজি বই দেখতে গেছেন।

হঠাৎ গভর্ণর জন হারবার্টের যুদ্ধ সংক্রান্ত কী যেন একটা জরুরী ফাইল দেখবার দরকার পড়লো। খোঁজ খোঁজ শৈলেন বাবুকে। ডাকো ৯নং গভর্মেণ্ট প্রেসের তার কোয়ার্টার থেকে। ফাইল দিয়ে যাক। ফাইল অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না। শৈলেন বাবুর নিরীহ স্ত্রী কথাটা চেপে যেতে যেতেও ভয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন সেক্রেটারীর অর্ডারলি পিওন রঘুনন্দন সিং-এর কাছে—বাবু এইমাত্র মেট্রোতে নুন-শো সিনেমা দেখতে গেছেন।

লালমুখো গভর্ণারের সেক্রেটারী এই সংবাদটা পেয়ে তো রেগে লাল।

তিনি তক্ষুনি মেট্রো সিনেমার ম্যানেজারকে ফোন করে হুকুম দিলেন রাজভবনের কর্মচারী শৈলেন ঘোষকে এক্ষুনি তাঁর সিনেমা হল থেকে খুঁজে বের করে রাজভবনে পাঠিয়ে দিতে। লাটসাহেবের অত্যন্ত দরকার।

সিনেমার ছবি চলাকালীনই হঠাৎ সিনেমার সাদা পর্দায় ভেসে উঠলো—রাজভবনের কর্মচারী শৈলেন ঘোষকে এক্ষুনি গভর্ণরের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হুকুম করা হয়েছে। তিনি যেন এক্ষুণি সেখানে চলে যান। খবরটি অত্যন্ত জরুরী।

বুঝুন ব্যাপার। সারা সিনেমা হলের দর্শকরা হতবাক। আর শৈলেনবাবুর অবস্থা যেন তার ধড়ে আর প্রাণ নেই। পা যেন চলতেই চাচ্ছে না।

অতি দুর্ভাবনায় রাজভবনে ফিরে এসে তিনি মাফ চাইলেন নির্দিষ্ট ফাইলটি বের করে দেবার পর সেক্রেটারীর কাছে।............

আমি আমার দীর্ঘ রাজভবনের বিজড়িত জীবনে তা প্রায় ত্রিশ বছর হবে তাতে দেখছি বহু গঙ্গা স্নানার্থী বুড়ো-বুড়ি যারা রাজভবনের উত্তর দিকের মেন গেটের সম্মুখ দিয়ে অতি প্রত্যুষে গঙ্গা স্নান করতে যান বা পূর্বে যেতেন ওদের অনেককে এই লাটবাড়ীর রেলিং-এর থাম্বায় ভক্তিভরে মস্তকস্পর্শ করতে।

কৌতূহল ভরে একবার একজন অতি বৃদ্ধা মাড়োয়ারী মহিলাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি একগাল হেসে আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন—'লাটসাহেব ঔর ঈশ্বর মে কোই ফারাক নেহি হ্যায়'।

হায়! এই হচ্ছে আমাদের অজানা ভারত আর তার আধা-নিরক্ষর ছেশোট্টী কোটি ভারতবাসী। যা এখন শোনা যাচ্ছে সত্তর কোটিতে গিয়ে ঠেকলো।............

একবার হয়েছে কি তখন ইংরেজ আমল। ঊনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। বাংলার গভর্ণর হচ্ছেন লর্ড কেসী। দীর্ঘ রাশভারী পুরুষ। জাতিতে ইংরেজ হলেও অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। শোনা যায় অস্ট্রেলিয়ায় তার শেষ জীবনে একবার বৈদেশিক মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

যখনকার কথা হচ্ছে তখন ১৯৪৪ সালের শেষের দিক। মিঃ কেসী তখন অবিভক্ত বাংলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজ্যপাল। এঁর মিসেস লেডী কেসী অত্যন্ত সুন্দর অয়েল পেণ্টিং করতেন। মিসেস তার ছোট্ট ছেলেকেও আর্টিস্ট করতে চান। তার জন্য

রাজভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণের বিশাল বট গাছের একটা নাতিদীর্ঘ মোটা ডালের উপর অস্থায়ী একটি খাঁচা বেধে দিয়েছেন।

সেখানে বসে বসে তাঁর ছোট্ট ছেলে জন না উইলিয়ম কী যেন বেশ নাম তার, একমনে রাজভবনের শান্ত প্রকৃতির পরিবেশে ছবি এঁকে চলে। পরনে তার মাঝে মাঝে দেখা যায় রিপু করা হাফ প্যান্ট—ইংরেজ জাত প্রথম থেকে ছেলেদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার তালিম দিচ্ছে।

এর মধ্যে একদিন হলো কী লাটবাড়ীর এক নক্সা বাবু (ড্রাফটস্ম্যান) যাকে লাট ও লেডী তার ফাইবার আর্টের জন্য স্নেহ করতেন এবং মাঝে মাঝে ডেকে পাঠিয়ে নিজের ছেলের আঁকা-ঝোকা দেখাতেন, সেই নরেনবাবু ওরফে নরেন্দ্রকুমার দাশ দুর্গাপুজোর ছুটিতে রাজভবনের তাঁর কোয়ার্টার ছেড়ে তাঁর দেশের বাড়ি আমতায় ফ্যামিলী নিয়ে পুজোর ছুটি কাটাতে গেছেন। হঠাৎ সেই গণ্ডগ্রাম আমতায় পুলিশের রেডিও গ্রাম গেল রাজভবন থেকে এক্ষুণি জরুরী কাজে লাটসাহেব নরেন বাবুকে তলব দিয়েছেন।

নরেনবাবু তখন অষ্টমী পুজোর দিন গ্রামের বাড়োয়ারী তলায় অঞ্জলি দেবার জন্য কেবলমাত্র কয়েকটি পুষ্প হাতে নিয়েছেন। তিনি ভয়ে তার মধ্যেই তাড়াতাড়ি পুষ্পাঞ্জলি কোনো রকমে সেরে বাড়ীতে ছুটে এসে প্যান্টুলন ও সার্ট গলিয়ে তখনকার মার্টিন কোম্পানির ছোট্ট রেলে চড়ে একেবারে হাওড়া ময়দান এবং সেখান থেকে রাজভবনের অপেক্ষামান জীপে একদম লাট কেসীর সামনে হাজির। লাটের তক্ষুণি অর্ডার হলো আজকের মধ্যে লাটবাড়ীর একটা নক্সা এঁকে দিতে হবে।

নক্সাবাবু শ্রীনরেন দাস লাটসাহেবকে গুডমর্নিং বলে নিজের অফিসের টেবিলে এসে লাটবাড়ীর নক্সা আঁকতে তড়িঘড়ি বসে গেলেন।······

বৃটিশ জমানায় যখন বাংলার লাটেরা শিয়ালদা ষ্টেশন দিয়ে দার্জিলিং বা অন্য কোথাও যেতেন তখন ষ্টেশনের বিশাল চত্বরে লাল কার্পেট পাতা হতো।

লাট বা লেডী সেই লাল কার্পেটের উপর দিয়ে জুতো পায়ে হেঁটে গিয়ে অপেক্ষামান দার্জিলিং মেলে উঠতেন।

একবার হয়েছে কী তখনকার সাহেব ষ্টেশন সুপারিনটেনডেনট অসুস্থ থাকায় তার কাজ একজন দেশীয় এ্যাসিসটেনট সুপারিনটেনডেনট দেখা শোনা করছিলেন। তিনি গোটানো লাল কার্পেটের এক জায়গায় যে ইতিমধ্যে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে তা লক্ষ্য করেন নি। লাট সেই কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওটা দেখতে পেয়ে রেগে আগুন। ফিরে এসেই লাটভবন থেকে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব। সেই ভদ্রলোকটির চাকরী যায় আর কী।··*···

ইংরেজদের আমলে লাটবাড়ীতে কাজ করা মানেই নিজের পাড়ায় বা আত্মীয় স্বজনের কাছে লাটের মতন আলিখিত কিছুটা সম্মান পাওয়া।

পাড়ার সবাই তাঁকে বেশ কিছুটা খাতির যত্ন করে। আর যে ব্যক্তি লাটের বাড়ীর কর্মচারী তিনি তো মনে মনে এর প্রভাবে অহংকারে ভেতরে ভেতরে ফুলে ঢোল।

এখন হয়েছে কী লাটবাড়ীর একজন পুরোনো কর্মচারীর ভাই এর বিয়ে। তাঁরা উত্তর কলকাতার খুব বনেদী বংশ। বাড়িতে গাড়ি, ফোন, ফ্রিজ, পাথর বসানো প্যারিবারিক খাবার টেবিল সেগুনেও তাদের আছে। কিন্তু যাকে বলে হাড়-কেপ্পন। অফিসের লোকজন কাউকেই ভাই-এর বিয়েতে নেমন্তন্ন করলো না। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের কাছে বাহবা দেখাবার জন্য এক ফন্দি আঁটলো।

দাশরথী সিং বলে লাটবাড়ীর গভর্ণরের এক খাশ চাপরাশীকে আগে ভাগে দশ টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি বললেন যে সে যেন লাটবাড়ীর চাপরাশীর অশোক চক্র মার্কার চূড়া সমেত ঠিক বিকেল ছটার সময় কলকাতার লাট বাগানের মালী গুণধর বিয়ের জন্য যে দুটি সুন্দর ফুলের তোড়া দেবে তা নিয়ে যেন তার উত্তর কলকাতার খুদিরাম বোস রোডের বিয়ে বাড়ির সামনে হাজির হয় ও লাটবাড়ি থেকে ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছি বলে যেন হাঁক ডাক করে বিয়ে বাড়িতে সোরগোল তোলে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এদিকে সেই অসীমবাবু যিনি এই প্ল্যান করেছেন এবং আগেই বলেছি যিনি কলকাতা লাটবাড়ীর অনেকদিনের পুরাতন কর্মচারী তিনি কিন্তু বিয়ে বাড়িতে লোক দেখানো আপ্যায়নে মহাব্যস্ত সেই সন্ধ্যার সময়।

হঠাৎ চার পাঁচজন বিয়ে বাড়ির কর্মকর্তা হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠে অসীম বাবুকে যেই এই খবরটা দিলে অসীম বাবু যেন এমন কিছু হয়নি এমনিভাবে গলা ফাটিয়ে মেয়েদের জটলার মধ্যে গিয়ে স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—শুনছো, লাটবাড়ী থেকে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি ওগুলো ঘরে নিয়ে এসো। আর ওকে একটু মিষ্টি খাইয়ে দিও।

কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বাড়ীর মেয়েদের জটলার সব কথা মুহূর্তের জন্য যেন থমকিয়ে দাঁড়ালো—বাব্বাঃ লাটসাহেব ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন।……

চিরদিনই কলকাতার লাটবাড়ীতে নিয়ম ছিল লাট তাঁর খাওয়া দাওয়ার জন্য তাঁর মাইনের কিছুটা টাকা এই বাবদে নিজের অফিসে জমা দেবেন প্রত্যেক মাসে এবং সেই টাকা থেকে লাট বা তাঁর পরিবারের থাকা খাওয়ার খরচ চলে যাবে।

যদিও এই অলিখিত নিয়মের মধ্যে অনেক ফাঁক বা ফোকড় আছে। তা যাই হোক এই ব্যবস্থা সেই বৃটীশ জমানা থেকে রাজ্যপাল ধর্মভীরার আমল পর্যন্ত বেশ সুশৃংখল ভাবেই চলে আসছিল।

কিন্তু রাজ্যপাল ধাওয়ান এসে কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁর নিজের স্যুইটের সংলগ্ন নিজের প্যানট্রীখানা বানালেন।

বেশ হাজার কয়েক টাকা রাজ্যপালের সরকারি তহবিল থেকে এর বাবদ খরচ হয়ে গেল। ধাওয়ান সাহেব নিজের মাসিক মাইনে ও এ্যালাউনস্ শুদ্ধ ভাষায় যাই বলুন না কেন, তিনি তার থেকে এক কপর্দকও তাঁর বা তাঁর পরিবারের রাজভবনে থাকা খাওয়ার জন্য ডেপুটী সেক্রেটারীর হাতে তুলে দিতেন না! তাঁর রান্নাবান্না রাজভবনের বাবুর্চি খিদমৎগার দিয়েই তাঁর নবনির্মিত নিজস্ব প্যানট্রীতে করা হতো। যদিও

রাজ্যপালের খাশ বাগান ব্যারাকপুর থেকে নিত্যই রোজকাররোজ বিনা পয়সায় তাঁর রান্নাঘরে শাকসব্জী, আনাজপাতি, কলা, লেবু আম, পেয়ারা, সফেদা, কাঁঠাল ইত্যাদি দেওয়া হতো।

এই প্রসংগে মনে পড়ে ইংরেজ জমানার লাটেদের কথায়। তাঁরা যা মাইনে পেতেন তাছাড়াও মাঝে মাঝেই সুদূর বৃটেন থেকে তাঁদের অভিভাবকেরা কিছু কিছু হাত খরচ পাঠাতো—গভর্ণরের ষ্ট্যাটাস মেনটেন করবার জন্য।

এখনকার মতন নয় যে দশগুণ বেশী মাইনে পাওয়া সেক্রেটারীরও যা পরিচ্ছদ সর্ব-নিম্ন খালাসি পিওন-এর সেই একই ড্রেস—হাওয়াই সার্ট আর টেরিলিনের প্যান্ট। খরচ খুব কম। তাও আবার সব সময় সেক্রেটারী বা ঐ জাতীয় উচ্চ পদমর্য্যাদার অফিসারের সঙ্গে বৃটীশ আমলের অবশ্য পালিতব্য অর্ডারলি পিওন নেবার রেওয়াজ নেই।

এই তো সেদিন রাজ্যপাল সুরজিৎ লাহিড়ীর সময়ে নূতন আসা গভর্ণরের এক সেক্রেটারীকে একজন হেড ইলেকট্রিক বৃদ্ধ মিস্ত্রী সেলাম করেনি বলে তিনি গোঁসা করে তার কৈফিয়ৎ তলব করলেন তাঁর উপরওয়ালা ইলেকট্রিক ইনজিনিয়ারের কাছে।

কেসটা অনেক দূর গড়ালো। ইউনিয়ানের যুগ। রাজ্যপালের কাছে এই বৃদ্ধ হেড ইলেকট্রিক মিস্ত্রী—মহম্মদ আলীকে দাঁড় করানো হল।

বৃদ্ধ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রাজ্যপালকে হাত জোড় করে জানালো—স্যার, আপনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আমি একজন গরীব মিস্ত্রী। তবে সেই বৃটিশ জমানা থেকে বহু ইংরেজ লাটের কাছে কাজ করে আজ আমি বৃদ্ধ হয়েছি। বলুন স্যার, ওদেরকে দেখেছি সুটেড বুটেড হয়ে সব সময়ে অর্ডারলি পিওন পেছনে ছাড়া ওরা অফিস চত্বরে কখনও ঘোরাফেরা করতেন না।

ইনি নূতন এসেছেন। সঙ্গে ওর অর্ডারলি পিওনও দেখতে পাই নি। আর আমি ওকে নূতন চিনতেও পারিনি। গায়ে তো আমাদের মতন হাওয়াই সার্ট ও প্যান্ট। হয়তো কিছুটা আমার চেয়ে দামী। ভেবেছি কোন দর্শনার্থী আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। তাই ভুল হয়ে গেছে স্যার—সবারই কানে কলম, কাকে করি সেলাম। আপনি এখন বিচার করুন।

রাজ্যপাল শুধু হেসে বললেন—তুমি এখন যেতে পার। এখানেই ঐ অধ্যায়ের শেষ।……

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকালে প্রদেশের গভর্ণরদের অখণ্ড প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল। এক কথায় বলতে গেলে এক একটা লাট নিজ নিজ প্রদেশের সব কিছুর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তার উপর ছিল নিজ নিজ প্রদেশের জমিদার, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ইংলণ্ডের রাজার দেওয়া বাড়তি 'উপাধি পাওয়ার' একমাত্র সংযোগকারী ব্যক্তি সেই প্রদেশের মহামান্য গভর্ণরেরা যিনি দিল্লীতে তাঁদের নাম ভাইসরয়ের কাছে রেকমেণ্ড করে পাঠাবেন।

সেই সব জমানায় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে

দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা বা জমিদাররা ব্রিটিশ রাজার হাত থেকে একটা তকমা বা উপাধি পাওয়ার জন্য ভীষণ লালায়িত ছিল—যা প্রায় কাঙালপনার পর্যায়ে পড়ে।

নাইট, স্যার, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, কে সি ভি ও, কে সি সি আই ইত্যাদি টাইটেল তো দূরের কথা একটা প্রশংসাসূচক মেডেল বা নিদেন পক্ষে গভর্ণরের একটা এহেন সার্টিফিকেটের জন্য সেই সব জমিদার বা রাজারা গভর্ণরদের নানা প্রকার ভেট বা অর্থদান করতে কার্পণ্য করতেন না।

মুর্শিদাবাদ নবাবের পক্ষ থেকে ঝুড়ি ভর্তি লাল শালুতে ঢাকা আমের ভেট—কহিতুর, রাণীপসন্দ, বোম্বাই, বীরা, গোপালভোগ, পেঁপেশাহী, খীরশেপাতি ইত্যাদি ইত্যাদি আম এই সেদিনও আমি আসতে দেখেছি এই রাজভবনে।

এখন বিগত জমানার উনিশশো সাইত্রিশ সালের একটা কৌতূহলদ্দীপক ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

তখন অভিবক্ত বংলার লাটছিলেন লর্ড ব্রাবোর্ণ। বাংলার গভর্ণররা তখন মাঝে মাঝেই বছরে তিন চারবার নিজের রাজকীয় ষ্টীমার—Mary express—এ কলকাতার গঙ্গা দিয়ে পূর্ববঙ্গে ট্যুরে যেতেন। যেমন পাবনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ইত্যাদি জায়গায়।

মেরী এক্সপ্রেস এই বড় ষ্টীমারের সঙ্গে বাঁধা থাকতো বাড়তি একটা বার্জ বা গাদাবোট। বড় ষ্টীমারটিতে থাকতেন গভর্ণর তাঁর পত্নী, দু' একজন তাঁর আত্মীয় আত্মীয়া, এ-ডি-সি, ডাক্তার, সেক্রেটারী ইত্যাদিরা।

আর অপরটায় থাকতো ব্যাণ্ডমাষ্টার সহ ব্রিটিশ ব্যাণ্ডপার্টী, চাকর, লস্কর, বাবুর্চি, খিদমৎগার, কুক ইত্যাদি।

লাটের এই ষ্টীমার বাঁধা থাকতো রাজভবনের দক্ষিণ পশ্চিমে চাঁদপাল ঘাটে। এখান থেকে ষ্টীমার ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যে খবরের কাগজে কাগজে ছড়িয়ে যেতো এই ভ্রমণের কথা।

যদিও বাংলার গভর্ণর এই ষ্টীমার করে পূর্ববঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন তবু এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন শহরে শুভেচ্ছা জন সংযোগ। যেমন আজকের দিনে বাংলার রাজ্যপাল রুটিন মাফিক প্রতি বৎসর এপ্রিল ও অক্টোবরে বছরে দু'বার দার্জিলিং ভ্রমণে পাহাড়ী এলাকায় জন সাধারণের সঙ্গে জন সংযোগ রক্ষা করেন।

এই সব সময়ে কতো নূতন নূতন মজার ঘটনা ঘটতো।

যেমন একবার হলো কী, পাবনার একজন প্রতাপশালী মুসলমান জমিদার আগেভাগে গভর্ণরের এই নদী পরিক্রমার কথা জানতে পেরে কলকাতার রাজভবনে সবিনয়ে অনুরোধ করে চিঠিতে প্রার্থনা জানালেন যে তাঁর পাবনার জমিদারীর পদ্মা-নদী সংলগ্ন বিশাল প্রাসাদে গভর্ণর ব্রাবোর্ণকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ তিনি জানাচ্ছেন।

গভর্ণর তা ঐ অনুরোধ গ্রহণ করে চিঠিতে সম্মতি জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারের সেই পদ্মানদী সংলগ্ন পল্লীগ্রামের প্রাসাদে ঝাড়পোঁচ

আরম্ভ হয়ে গেল। নিত্যনতুন সাহেবি খানার মেনু পরীক্ষা-নিরিক্ষা হতে লাগলো। কলকাতা থেকে মুসলমান বাবুর্চি আমদানি করা হলো।

জমিদার থেকে নায়েব গোমস্তা পর্যন্ত কে কী পোষাক পরে ইংরেজ গভর্ণরকে অভ্যর্থনা জানাবেন তার রোজ রোজ নকল মহড়া চলতে লাগলো। ডালহাউসী স্কোয়ারের তখনকার বিখ্যাৎ কাটা পোষাকের দোকান—রানকিন কোম্পানি—সেখান থেকে সেই জমিদারের অর্ডার মাফিক নুতন নুতন সব পোষাক আসতে লাগলো।

বৃটিশ লাট লর্ড ব্রাবোর্ণ ও লেডী ব্রাবোর্ণ স্ব-পরিষদ সেই জমিদারের বাড়ীতে নদী পরিক্রমার সময় এক রাত্রে ডিনার খেয়ে জমিদার বাবুকে কৃতার্থ করলেন।

লাটের বাবুর্চি, বেয়ারা, ব্র্যাণ্ডমাষ্টার, তার দলবল পিওন ইত্যাদিরা সেই রাতের ডিনার খাওয়া ছাড়াও উপরি প্রত্যেকে দশ দশ টাকা বকশিস পেলো।

নদীর পারের গ্রামের সমস্ত লোকেরা লাট চলে যাওয়ার পরদিন বিশাল ভূঁড়িভোজনে আপ্যায়িত হল।

আর পরের সালের নতুন বছরের প্রথম দিনে দেশবাসী খবরের কাগজে বড় বড় করে দেখতে পেলো সেই জমিদার 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

৫ই মার্চ ১৯৮১ দিনটি কলকাতা রাজভবনের জীবনে একটি দুঃখের দিন।

তখন বাংলার রাজ্যপাল ছিলেন বৃদ্ধ ত্রিভুবন নারায়ণ সিং। রাজ্যপাল সিং ও তাঁর বৃদ্ধা পত্নী শ্রীমতীসুশীলা সিং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের সরল সিধা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দুই ছেলে যারা এই রাজভবনে মা বাপের সঙ্গে থাকতেন তাদের উভয়ের মেজাজ সব সময়েই অত্যন্ত চড়া সুরে বাঁধা থাকতো।

এর পূর্বে ছেলে দুটির অনেক আপাত অশালীন ব্যবহার কলকাতার রাজভবন হজম করেছে কিন্তু ঐ দিন তা আর হলো না।

লাটের ছোট ছেলে মিঃ এস্ সিং রাজভবনের বৃটিশ আমলের বৃদ্ধ চাপরাশী সমরুকে ঘুষি মেরেছে। আর যায় কোথায়।

কারণ কী? না গতকাল হঠাৎ রাত সাড়ে দশটা এগারোটার সময় ছোট ছেলে ও তার বউ বাইরে থেকে এসে তেতলার লাটের বেড রুমের চাবি চায়। কিন্তু চাপরাশী সমরু বলে লাটসাহেব এখন তাঁর নব নির্মিত ময়দানের কটেজে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর বালিশের নীচে তাঁর ওপরের স্যুটের চাবি থাকে। সুতরাং লাটের ঘুম ভাঙ্গিয়ে এই দুপুর রাতে আমি চাবি আনতে পারবো না। কিছুতেই না।

এক কথা দু' কথা হঁতে হতে ঘুষির পর ঘুষি পড়তে লাগলো বৃদ্ধ চাপরাশির গায়ে মুখে পিঠে। পরের দিন সমস্ত রাজভবনের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী—ঝাড়ুদার, পিওন, চাপরাশী, মালী, মেসন, মজদুর—ইত্যাদিরা এক জোট হয়ে, কলকাতা রাজ-ভবনের পুরাতন প্রচলিত কায়দায় তাদের পরিধানের রাজভবনের খাকী উর্দি খুলে ফেললো। তাদের সকলের দাবি যতক্ষণ না লাটের ছোট ছেলে নিজে ক্ষমা চাইছে

ততক্ষণ তারা কাজে কেউ যোগদান করবে না—তারা লাটের চাকর, লাটের ছেলের চাকর নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হৈ হৈ ব্যাপার সমস্ত রাজভবন জুড়ে। আবার সেদিনই নাকি দুপুরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা রাজভবনে আসছেন। সবারই ছুঁচোগেলা অবস্থা। সেক্রেটারী, ডেপুটী, এ-ডি-সি সবাই কিছুতেই কিছু করতে পারছেনা।

তখন ঘটনাটা খোদ লাট ত্রিভুবন নারায়ণ সিং-এর কাছে গেলো। বৃদ্ধ সুচতুর রাজনীতিবিদ রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ তখন মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বার করলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের তিনি ডেকে হাত জোড় করে বললেন—দেখ ভাই তোমরা পূর্বে কতো ভারী ভারী দাপটওয়ালা লাট দেখছ। আমি তো বৃদ্ধ দুর্বল সামান্য মানুষ। ভাগ্যের জোড়ে লাট হয়েছি। আমি আমার ছেলের কসুর মেনে নিচ্ছি। ওকে তোমরা মাফ করে দাও। ও মহা দোষ করেছে ক্ষমা করো ওকে তোমরা।

বৃদ্ধ রাজ্যপালের এই কথাগুলি শুনে সেই কর্মচারীরা মুখ চাওয়াচায়ি করে নিজেদের গায়ে আবার রাজভবনের উর্দি চড়ালো।

রাজ্যপাল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এরোড্রামে আনতে হাসিমুখে বেড়িয়ে গেলেন।

উনিশশো ছাপান্ন সালের আটই আগষ্ট বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি সন্ধ্যের সময় রাজভবনের তদানীন্তন ষ্টোনোগ্রাফার প্রতুল ঘোষকে ডিকটেসন দিতে দিতে হঠাৎ মারা যাবার পর কলকাতার তদানীন্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী অস্থায়ী রাজ্যপালের ভার গ্রহণ করেন। কারণ ভারতীয় সংবিধানে আছে কোন প্রদেশের রাজ্যপাল বা ভারতের প্রেসিডেন্টের পদ এক মুহূর্তের জন্য শূন্য থাকতে পারে না।

যাইহোক কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হলেন।

তখন ব্যারাকপুর লাটবাগানের ফ্লাগষ্টাফ বাংলোর পাশে "আয়া বাংলোতে" থাকতেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি খাস ইংরেজ মিঃ হ্যারিস সাহেব।

অকৃতদার মিঃ হ্যারিস সাহেব নিজের দেশ খাস বৃটেনে রিটায়ার করবার পর ফিরে যেতে অনিচ্ছুক হওয়াতে তদানীন্তন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় হ্যারিস সাহেবকে ব্যারাকপুরের শান্ত সুশীতল সবুজ গাছপালা ঘেরা লাট বাগানে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন—উদ্দেশ্য তাঁর কাছে কিছু কিছু আইনের উপদেশ নেওয়া।

ব্যারাকপুর "আয়া বাংলোতে" তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি অকৃতদার ফণীভূষণ চক্রবর্তী প্রায় প্রতি রবিবারই ব্যারাকপুর গিয়ে আইন সম্বন্ধে নানা বিষয়ে শলা পরামর্শ ও বিচার বিষয়ক নানা আলোচনা করতেন।

কিন্তু যেদিন থেকে এই ফণীভূষণ চক্রবর্তী বাংলার নব নিযুক্ত অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন সেদিন থেকে মিঃ হ্যারিস স্বয়ং নিজে গিয়ে ব্যারাকপুর ফ্লাগষ্টাফে নূতন রাজ্যপাল ফণীভূষণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করলেন।

লজ্জার খাতিরে ফণীভূষণ অনেকবার মিঃ হ্যারিসকে বলেছেন, ফ্ল্যাগষ্টাফ বাংলোর পাশেই তো আপনি থাকেন, পূর্বের মতো আমিই নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আপনি আসেন কেন?

সদা হাস্যময় চিরকুমার অশীতিপর বৃদ্ধ মিঃ হ্যারিস হাসতে হাসতে বললেন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ফণীভূষণকে—তা হয় না মিঃ চক্রবর্তী, আমি জাতিতে ইংরেজ। আমরা রক্ষণশীল কনসারভেটিব জাত। সব রকম প্রটোকল মেনে চলাই আমাদের রীতি। প্রাক্তন চীফ জাস্টিসকে সে দেশের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিজেই সশরীরে তাঁর কাছে যেতে হবে। গভর্নরকে তার কাছে আসতে অনুরোধ করা যায় না।

রাজভবনের শেষ দৃশ্য

আজ আমার কলকাতা রাজভবনের চাকরীর জীবনের শেষ দিন—ত্রিশে নভেম্বর উনিশশো চুরাশী সাল।

সেই কবে এই রাজভবনে চাকরী জীবনে ঢুকেছিলাম, আজও তার স্মৃতি মনের গভীরে আনন্দে দুঃখে ছলছল করছে। স্পষ্ট সেদিনকার কথা এখনও মনে পড়ে। কলকাতার ঘোড়ায় টানা ছ্যাকরা গাড়ীর ওপর নিজের মাল পত্তর গুছিয়ে নিয়ে সেই কবে ডিসেম্বরের শীতের এক ম্লান সন্ধ্যায় তখনকার নির্জন ডালহৌউসী স্কোয়ারের রাজভবনের একটা সুন্দর কোয়ার্টারে এসে উঠলাম তার স্মৃতি এখনও মনে আছে। আমি তখন নিঃসঙ্গ একা ছিলাম—এখনও একা।

চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে—কী হতে চেয়েছিলাম জীবনে আর কী হলাম। সমস্ত রাতটা আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজন-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে আসার ব্যথায় কেঁদে উঠলো মন। ঘোড়ার গাড়ির বৃদ্ধ মুসলমান গাড়োয়ানকে গাড়ি ভাড়ার সঙ্গে উপরি কিছু বকশীশ দেওয়াতে সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দরদ মাখানো কণ্ঠে বললো—বাবু তসলিমাৎ—বহুত বহুত আদাব। বাবু এতো বড় রাজভবনের কোঠীতে আপনি একা থাকবেন, বিবিকে নিয়ে আসেন নি? আপনার মাতাজী নেই?

আমি হঠাৎ তার এই শেষ প্রশ্নে চমকিয়ে উঠলাম। বললাম—না ভাই আমি শাদী করিনি, আর আমার মা অতি বৃদ্ধা দেশের বাড়িতে থাকেন। আমি একা। বেহরা। ইনসান্।

বৃদ্ধ অচেনা সেই গাড়োয়ানটি আমার কথাগুলো শুনে কেন জানি চোখের জল মুছলো। বললো—ইনসান বড়ই খুদপরস্ত—সংসার বড়ই স্বার্থপর। বাবু আমারও জীবন আপনার মতো। মা নেই, শাদী হয়নি। কবে সেই আমার চাচার হাত ধরে ২৬. পির. আজমগড় জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিলাম। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী চালাতে চালাতে আমারও জীবন ছ্যাকড়া হয়ে গেছে। তবু আপনি তো রাজপ্রাসাদে স্থান পেলেন থাকবার, তকদির আপনার ভালো। আমি তো বাবু 'কিরাইয়া' বেসিসে এই ঘোড়ার গাড়ি চালাই রোজকার রোজ। থাকি ফুটপাথে। পয়সা জুটলে পার্ক-সার্কাসের কোনো বস্তিতে দু' চার মাস ঠিকা ঘর ভাড়া করে একটু আধটু আরাম করি শুয়ে বসে। না হয় আবার সেই ফুটপাত।

কথাগুলি বলে বার দুয়েক অলহমদুলিল্লা, অলহমদুলিল্লা—খুদাতালার তারিফ, খুদাতালার তারিফ—এই কথাগুলি অতি নীচু স্বরে উচ্চারণ করে মাথা ঈষৎ হেলিয়ে সে চলে গেলো।

তারপর বেশ কয়েক যুগ তা প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বছর কলকাতায় এই রাজপ্রাসাদে সুখ দুঃখে কাটিয়ে দিলাম—কখনও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, কখনও বা একা।

এই কলকাতার রাজভবনে চাকরী পেয়ে প্রথম দিন থেকে আমি অত্যন্ত কৌতুহল নিয়ে এর সব কিছু জিনিস আচার ব্যবহার, কখন কে ভি. আই. পি. আসছে, তাঁদের খাওয়াই বা কী কী দেওয়া হচ্ছে এই সব খবর সন্তর্পণে ডাইরীতে লিখে রাখতাম।

এই অভ্যাস আমার হয়েছিল কারণ আমার কলেজ ও ইউনিভারসিটি জীবনে এমন জন কয়েক শিক্ষকের সস্নেহ সাহচর্যে এসেছিলাম যাঁদের প্রথম ও প্রধান উপদেশ ছিল, রোজকার রোজ ডাইরী লেখার অভ্যাসই হচ্ছে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদ হবার গোপন চাবিকাঠি।

এই সুবাদে কলকাতার রাজভবনে কতো বিদেশীয় ভি. আই. পি. কে দেখেছি।

দেখেছি কাছ থেকে ক্রুশ্চেভ-বুলগেনিনকে, দেখেছি রাণী এলিজাবেথকে, কর্ণেল নাসেরকে, হো চি মিনকে, দলাই লামা, পাঞ্চেন লামাকে, শাম্প্রমিৎ জো জোকে, চৌ-এন-

লাইকে, মিঃ এটেলীকে, প্রিন্স চার্লসকে, সীমান্ত গান্ধীকে, মিঃ ভুট্টকে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমনকে, ম্যাকনামারাকে, মার্শাল টিটোকে, আফ্রিকান রাষ্ট্রের কতো বড় বড় ডিগনেটারীসদের, হাইলে সেলিসীকে, উগান্ডার প্রেসিডেণ্টকে, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেণ্টকে, সংযুক্ত আরবের আমীর শাহীকে। প্রভৃতিদের।

এছাড়া আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে, ইন্দিরা গান্ধী, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রাধাকৃষ্ণণ, জাকির হোসেন, বরাহগিরি ভেংকট গিরি, সঞ্জীব রেড্ডী এবং ভারতের প্রায় বাইশটা প্রদেশের ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় সকল রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপালদের, দেখেছি রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের অনুরোধে রাজভবনে গান গাইতে লতা মুংগেশকরকে, বড়ে গোলাম আলীকে, আলাউদ্দীন খাঁকে, রবিশংকরকে, মুস্তাক আলীকে, চিন্ময় লাহিড়ীকে আরও কতো শত টপ ভারতের ভি. আই. পি. কে। তাদের সকলের কথা সব সময়ে মনেও আসে না। অতো শত ডাইরিতে লিখতেও পারিনি সব সময়ে।

তবু বলবো, এবং আমি প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলাম যেদিন আমি রাজভবনের দীর্ঘ চাকরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবো সেদিনই আমি আমার এই "কলকাতা রাজভবনের অন্দরমহল' বইটির শেষ অধ্যায় লেখায় হাত দেবো এবং সেটা হবে ভারতের প্রিয়দর্শিনী ও আমার রাজভবনে শত শত ভি. আই. পিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া শ্রেষ্ঠতমা ভি. আই. পি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে আমার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কিছু শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবো। যদিও তাঁর সম্বন্ধে এই পুস্তকে 'ইন্দিরা গান্ধী ও কলকাতার রাজভবন' এই অনুচ্ছেদে পুরো একটা লেখাই লিখেছি।

যাকে ভাল লাগে তাকে যেমন বারে বারে দেখতে ইচ্ছে করে, তেমনি প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীকে কলকাতার রাজভবনে ও দার্জিলিং রাজভবনে এতোবার দেখেছি জওহরলালের সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজার সঙ্গে, রাজ্যপাল ডায়াসের সঙ্গে যে কী জানি কোন দুর্লঙ্ঘ্য ভালবাসার বন্ধনে পড়ে গিয়েছিলাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি।

তাই মনে করেছিলাম আমার বই এর শেষ অধ্যায় হবে "দেবাত্মা হিমালয় প্রেমিকা শ্রীমতী গান্ধী ও দার্জিলিং রাজভবন"।

কিন্তু Man proposes. God disposes—ভাবে মানুষ এক, হয় একেবারে উল্টো। যদিও সকল ক্ষেত্রেই নয়। তবে এই ক্ষেত্রে।

সেদিন ছিল একত্রিশে অক্টোবর উনিশশো চুরাশী। সকাল তখন ৯-৪০ মিনিট। হঠাৎ রাজভবনের কোয়ার্টারে বসে খবর পেলাম, মেসেঞ্জার পিয়ন রঘুনাথ সিং ছুটতে ছুটতে এসে বলল—সাব, কারা ইন্দিরাজীকে গুলি করেছে। লাটসাহেব এক্ষুণিই দিল্লী রওনা হচ্ছেন। বোধ হয় ওঁকে কেউ দিল্লী থেকে ফোনে এ খবর দিয়েছে। রাজভবনে খুব হৈ চৈ। চলুন, চলুন।

এমনিতেই রাজভবনে যারা চাকরী করে তাদের খুব সকাল সকাল অফিসে যেতে হয় এবং অনেক রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝেই থাকতে হয়। কারণ এখানকার প্রায় সব স্টাফকেই রাজভবন এস্টেটে থাকবার কোয়ার্টার দেওয়া হয় চটজলদি লাটসাহেবের কাজের জন্য।

ছুটে গেলাম রাজভবনে। টেলিপ্রিণ্টারে তখনও খবর আসেনি। রাজ্যপাল উদ্বিগ্ন। হঠাৎ রাজভবনের টেলিপ্রিণ্টারে খবর ফ্লাশ হতে লাগলো—প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গুলিবিদ্ধ। তাঁর বাংলোর সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড তাঁকে গুলিবিদ্ধ করেছে। শ্রীমতী গান্ধীর অবস্থা সংকটজনক।

যাঁরা টেলিপ্রিণ্টার দেখেছেন তারা জানেন টেলিপ্রিণ্টারে সব সময়েই খট খট শব্দ হচ্ছে আর ফিতের মতো সাদা কাগজে পৃথিবীর কতো খবর আকছার আসছে।—

রাজভবনের কেউ এসব ভ্রুক্ষেপও করে না। টেলিফোন অপারেটার যারা এর চার্জে থাকেন তারা মাঝে মাঝে এই ফিতের মতো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সুন্দর প্যাড রেজিস্টারে সেগুলি ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি রাজ্যপালের কাছে পাঠান।

কিন্তু আজকে রাজভবনের সেক্রেটারী থেকে পিওন চাপরাসী পর্যন্ত রাজভবনের একতলায় টেলিপ্রিন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে।—ইন্দিরা বেঁচে আছেন তো? দিল্লী থেকে অন্য কিছু নির্দেশ আসছে কি না? এই সব আগ্রহ কৌতূহল নিয়ে জানতে।

মনটা স্বভাবতই সকলের ম্রিয়মান। ঝাঁকে ঝাঁকে ফোন আসছে রাজ্যপালের কাছে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে। প্রতিবার রাজভবন থেকে একই উত্তর দেওয়া হচ্ছে যা টেলিপ্রিন্টারে পাওয়া গেছে—ইন্দিরাজী গুলিবিদ্ধ। তাঁর অবস্থা সংকটজনক।

আমি খবরটা শুনে রাজভবনের দোতলায় উঠে একটু আনমনা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে থ্রোন রুমে দেখি জনা চারেক রাজভবনের পুরোনো বিশ্বস্ত হিন্দুস্থানী কর্মচারী গালে হাত দিয়ে বিষণ্নমনে কী যেন চাপা গলায় বলাবলি করছে। আমাকে দেখে একজন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—বেইমান সব আদমী। ইন্দিরাজী কো মার ডালা। ক্যিয়া কসুর উনকে থা, কহিয়ে সাব।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—দেখো ইন্দিরাজী তো মারা যান নি। ঠিক উনি ভাল হয়ে উঠে উঠবেন। তবে আর বোধ হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না—অতো গুলি এই বয়সে ওঁর দেহের ভেতর থেকে বার করলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে।

কিন্তু বেলা প্রায় ১-৩০ মিনিটে রাজভবনের টেলিপ্রিন্টারে খবর ভেসে এলো—ইন্দিরা আর নেই। সমস্ত ডাক্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

রাজ্যপাল উমাশংকর দীক্ষিত কিন্তু বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দমদম এরোড্রোমের উদ্দেশ্যে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

এদিকে ডালহৌসীর অফিস পাড়ার হাজার হাজার লোক অফিস-টফিস ফেলে রাজভবনের মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্নভাবে রাজভবনের সুউচ্চ গম্বুজের দিকে তাকিয়ে আছে—ইন্দিরা গান্ধী যদি মারা গিয়েই থাকেন, তবে কেন রাজভবন, হাইকোর্ট, রাইটার্সের ফ্লাগ অর্ধনমিত নয়। কেনই বা আকাশবাণী বার বার বলছে ইন্দিরার অবস্থা সংকটজনক।

ডালহৌসীর রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ। এরই মধ্যে দুএকটি অনামী দৈনিক পত্রিকা টেলিগ্রাম বার করে দিয়েছে—প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গুলিবিদ্ধ। অবস্থা সংকটজনক। কিন্তু কেউ বলছে না, প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন, এবং তা গুলিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু রাজভবনের পতাকা তবু পত্ পত্ করে উড়ছে। কারণ সে তো শক্তিহীন, মূক। কেউ তাকে না নামালে সে তো আপনি নামতে পারে না। না হলে সে নিজেই রাজভবনের গম্বুজের পতাকা দণ্ড থেকে কিছুটা অর্ধনমিত হয়ে ঝুলতো—সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর শোকে।

হঠাৎ দুটো আড়াইটা নাগাদ কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকা টেলিগ্রাম বার করলো—ইন্দিরা নিহত নিজ রক্ষীর গুলিতে। কাগজ কিনবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। একজন আধবুড়ো ভদ্রলোক টেলিগাম কিনে চোখ বুলিয়ে বললেন, দু-তিন জন সিকিউরিটি গার্ড প্রধানমন্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে গুলি চালালো আর আমাদের আই. বি. সি. আই. ডি. বা 'র' এর কর্তা ব্যক্তিরা আগে থেকে একটুও তার আঁচ করতে পারলো না, যতো সব অপদার্থ ওয়ার্থলেশ।

হাতে খবরের কাগজ—ইন্দিরা নিহত তবু ডালহৌসী অফিস পাড়ার হাজার হাজার

লোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাজভবনের পতাকার দিকে। সকলের কথা বি. বি. সি. বলছে প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন, তবে কেন রাজভবনের ফ্লাগ অর্ধ-নমিত করা হচ্ছে না তবে কী বি. বি. সি. বা খবরের কাগজ ভুল রিপোর্ট দিচ্ছে।

রাস্তার ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিকশা সব বন্ধ।

লোকে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটছে। এর আগে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলালের মৃত্যুর খবরেই লোকে এতো যেন বিচলিত বোধ করে নি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এ যে প্রিয়দর্শিনী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা। বাংলার লোকও তাঁকে হৃদয় ভরে ভালবাসে। কতো বার ইন্দিরাকে তারা দেখেছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে, বাংলার সুদূর গ্রাম গঞ্জে মাথায় ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি হিসেবে ভাষণ দিতে। কতো বার দেখেছে দমদম এরোড্রাম থেকে রাজভবন পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ ঠায় খোলা জীপে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে নমস্কার করে মৃদুহাস্যে পথ পরিক্রমা করতে।

এ যে অবিশ্বাস্য তাদের পক্ষে মেনে নিতে যে ইন্দিরা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কিছু জানতেনই না, ভারতের কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাই করতেন না, যে ইন্দিরা ভারতের যে কোনো পুরাতন মহান ঐতিহ্যকে পৃথিবীর লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। ভারতের মহান পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির কথা যিনি সারা বিশ্বে বলে বেড়াতেন, তাঁকে কিনা নিজের বাংলোর অঙ্গনের মধ্যেই আমাদের ভারতীয় কতিপয় রক্ষী নৃশংস ভাবে মেরে ফেললো।

এখন প্রাক-শীতের অপরাহ্ণ বেলা, আস্তে আস্তে পৃথিবীকে অন্ধকার গ্রাস করছে।

রাজভবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, ফুলের গাছে গাছে, ফোয়ারার জলের মধ্যে, রবার ফ্লেমিংট্রি ক্যাসুরিনা, দেওদার, অশোক, বিপুলবাঁশ, কর্ক ইত্যাদি গাছের আড়াল দিয়ে দিনের, সূর্য গঙ্গার পরপারে আলো আঁধারের চিত্র বিচিত্র অংকনে বিলীন হবার উপক্রম করেছে

হঠাৎ দেখা গেলো রাজভবনের ফ্লাগম্যান পান্না আচার্য্য তিনতলার গম্বুজের উপরকার লোহার সিঁড়ি বেয়ে রাজভবনের জাতীয় পত্যকা আস্তে আস্তে নামিয়ে নিল। আবার পরের দিন ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে যে এই পতাকা উড্ডীন করতে হবে। এটাই সেই বৃটিশ আমল থেকে আইন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হওয়ার অফিসিয়াল সংবাদ যতক্ষণ না রাজভবনের চত্বরে এসে পেঁছুচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো পান্না আচার্য্য নিজে থেকে পতাকা অর্ধ-নমিত করতে পারবে না।

গভীর বিষন্নমনে সেদিন রাজভবন থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফেরবার সময় ম্লান সন্ধ্যার সেই পড়ন্ত আলো আঁধারে আমার দোতালার কোয়ার্টারের প্রতিটি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমি যেন আনমনা হয়ে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম, যা সবেমাত্র গতকাল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলে গেলেন—

"আমি জীবিত থাকি বা না থাকি, তার জন্য চিন্তা করি না—যতক্ষণ শরীরে শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেবা করে যাব। যদি আমার মৃত্যু হয় আমার দেহের এক একটি রক্তবিন্দুও ভারতকে করে তুলবে আরো মজবুত। আর জীবিত রাখবে এক অখণ্ড ভারতকে।"

রাজভবনের পতাকা তখন অর্ধনমিত। সূর্য তখন বোধ হয় ডুবে গেছে।